স্বামী সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা



সংকলক ও সম্পাদক

স্বামী চেতনানন্দ

স্বামী সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা

সংকলক ও সম্পাদক
স্বামী চেতনানন্দ



উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক ঃ
স্বামী সত্যব্রতানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩

Ref: 22, 2

প্রথম প্রকাশ
শ্রীমায়ের উদ্বোধন বাড়িতে ৯৬তম শুভ পদার্পণ তিথি
২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১২
১১ জুন, ২০০৫
1M1C

ISBN 81-8040-499-4

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস ঃ
উদ্বোধন প্রকাশন বিভাগ

মুদ্রক ঃ
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলী যাঁদের আমরা তাঁর সন্তান বলে জানি, তাঁদের মধ্যে খোকা মহারাজ বা স্বামী সুবোধানন্দ এমন এক আত্মপ্রচার বিমুখ সাধু ছিলেন, যার সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ এপর্যন্ত যথেষ্ট অল্পই ছিল। আমেরিকা সেন্ট লুইসস্থিত রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ স্বামী চেতনানন্দজী মহারাজ প্রচুর নথিপত্রাদি মন্থন করে ঠাকুর-মা-স্বামীজী পরিমণ্ডলের এমন সব তত্ত্ব ও তথ্য আলোকশিখার আবর্তে নিয়ে এসে বেশ কয়টি গ্রন্থ রচনা বা সঙ্কলন করে আমাদের সামনে হাজির করেছেন, যার ফলে এসব বিষয়ে আমাদের মনের অন্ধকার অনেকটা দূর হয়ে যাচ্ছে। স্বামী চেতনানন্দজী সঙ্কলিত স্বামী সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা ঠিক এই রকমেরই একটি অনবদ্য গ্রন্থ। ওঁনার ভূমিকায় উনি সঠিক অর্থেই বলেছেন, 'অতীতের এই লুপ্ত স্মৃতিগুলিকে জ্বলন্ত করার উদ্দেশ্যে আমি পঞ্চপ্রদীপ জ্বেলে আরতি করেছি।' ওঁনার এই আরতিতে সেই সব অনালোকিত গুহাকন্দরে অবস্থিত সাধন-সমুজ্জ্বল দেব-মূর্তিগুলি আমাদের নয়ন সম্মুখে ভাস্বর হয়ে উঠছে। আমরা তাঁর প্রতি এজন্য সবিনয়ে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

আমাদের বিশ্বাস, স্বামী চেতনানন্দ সংকলিত ও সম্পাদিত 'স্বামী সুবোধানন্দের স্মৃতিকথা' গ্রন্থখানি শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবানুরাগিবৃন্দের কাছে এক অফুরন্ত ঐশ্বর্যের খনির সন্ধান দেবে। অলমিতি—

বাগবাজার মায়ের বাড়িতে — স্বামী সত্যব্রতানন্দ

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর ৯৬তম

শুভ পদার্পণ তিথি, ১৪১২ বঙ্গাব্দ

উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০০৩

সূচীপত্র

[এই পর্বের স্মৃতিকথাগুলি অবনীমোহন গুপ্তের সঙ্কলিত "স্বামী সুবোধানন্দ ঃ স্মৃতি সঞ্চয়ন" গ্রন্থ হতে প্রকাশকের অনুমতিক্রমে গৃহীত।]

প্রথম পর্ব

ভূমিকা

অধুনা আমরা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য ও গৃহী ভক্তদের দেখিনি। তাঁদের সম্বন্ধে যত বই আছে পড়ি এবং যাঁরা তাঁদের সঙ্গ করেছেন তাঁদের কাছ থেকেও অনেক কথা শুনি। অবতাররূপী শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কিভাবে লীলা করেছেন এবং কিভাবে শিষ্যদের অধ্যাত্মজীবন গঠন করেছিলেন—তা জানতে কার না ইচ্ছা জাগে। "আশ্চর্যো বক্তা কুশলস্য লব্ধা"—শাস্ত্র বলেন, "আত্মতত্ত্বের উপদেষ্টা বিরল এবং নিপুণ ব্যক্তিই আত্মজ্ঞান লাভ করেন।" একমাত্র প্রজ্বলিত দীপ অন্য দীপকে জ্বালাতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর শিষ্যদের হৃদয়ে আত্মদীপ জ্বেলে দিয়েছিলেন, তাই তাঁদের জীবনকাহিনী আমাদের আকর্ষণ করে।

শ্রীরামকৃষ্ণের লীলানাট্যে যাঁরা অভিনয় করেছেন, তাঁরা সকলেই অসাধারণ মানব ও মানবী। ঠাকুর নিজে বলেছেন, "বাউলের দল হঠাৎ এল—নাচলে, গান গাইলে; আবার হঠাৎ চলে গেল! এল—গেল, কেউ চিনলে না।" এই বাউলের দল যখন লোকচক্ষুর অন্তরালে যান, তখন তাঁদের লীলা চিন্তা বা তাঁদের গাথা শুনবার জন্য মানুষের আগ্রহ বাড়ে।

লোকোত্তর জীবনের সম্পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। তবে যেসব ভাগ্যবান পুরুষ ও নারী ঐ সব মহাজীবনের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাঁরা পরবর্তী কালে স্মৃতিচারণ (reminiscences) লিখে গেছেন। এই গ্রন্থে আমি শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য স্বামী সুবোধানন্দের সেই সব ছড়ানো স্মৃতি সঙ্কলিত করেছি। তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভক্তের কাছে কয়েকটি ঘটনা পুনরাবৃত্তি করেছেন, যেমন সাপের গর্তের ওপর শোয়া, দেবীকে পান দোক্তা দেওয়া, ভূতের ভয়, ঠাকুরকে বাতাস করা ইত্যাদি। ঐ পুনরুক্তিগুলি বাদ দেওয়া সম্ভবপর হলো না, কারণ তাতে ঐ সব লেখকদের স্মৃতিচারণের গতি বিঘ্নিত হতো। সোনার-

গাঁ রামকৃষ্ণ মঠের প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৪২) 'শ্রীশ্রী স্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র' পুস্তক থেকে তাঁর জীবনী অংশটুকু এই গ্রন্থের প্রারম্ভে সংযোজিত করেছি।

প্রথম পর্বের প্রতি অধ্যায়ের শেষে উৎস দেওয়া হলো এবং দ্বিতীয় পর্ব অবনীমোহন গুপ্তের সঙ্কলিত 'স্বামী সুবোধানন্দ ঃ স্মৃতি সঞ্চয়ন' গ্রন্থ থেকে গৃহীত হয়েছে। অবনীবাবুর কন্যা শ্রীমতী সুধা নিয়োগী ২।৬।২০০৪ তারিখে আমাকে লিখেছেন ঃ "আপনি প্রয়োজন মতো উক্ত বই-এর আংশিক ও সার্বিক ব্যবহার আপনার উদ্দিষ্ট গ্রন্থে ব্যবহার করতে পারেন। তাতে আমাদের আপত্তি করার প্রশ্নই নেই।" অবনীবাবুর এই সঙ্কলনটি তাঁর গুরুর প্রতি উপযুক্ত দক্ষিণা। ঠাকুর তাঁর ও তাঁর পরিবারবর্গের মঙ্গল করুন।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যেক সন্ন্যাসী শিষ্য স্ব-মহিমায় দেদীপ্যমান। স্বামী সুবোধানন্দ রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে 'খোকা মহারাজ' নামে খ্যাত। শিশুসুলভ সরলতা ও ঈশ্বরে নির্ভরতা, বৈরাগ্য ও পবিত্রতা তাঁর জীবনে বিশেষভাবে প্রকটিত হয়েছে। প্রথমদর্শনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন, "তুই এখানকার।" ঠাকুর পরে সুবোধের জিভে আঙুল দিয়ে মন্ত্র লিখে দেন এবং ধ্যান করতে বলেন। ফলে তাঁর বাহ্যজ্ঞান লোপ পায় এবং তিনি নানা দেবদেবীর দর্শন পান। আর একদিন ঠাকুর তাঁকে নিয়মিত ধ্যান করতে বলায় বালকস্বভাব সুবোধ বলেন, "ধ্যানট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলত—আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?" সুবোধের সরলতা ও বিশ্বাসপূর্ণ কথা শুনে ঠাকুর বললেন, "আচ্ছা, যা ওসব তোকে কিছুই করতে হবে না। তুই দুবেলা একটু স্মরণ-মনন করে নিস।" আমরা ভাবি ঠাকুর যদি আমাদের ঐ রূপ একটা সোজা উপায় বলে দিতেন, তাহলে সব গোল চুকে যেত।

খোকা মহারাজের চা প্রীতি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে সর্বজনবিদিত। কাশীপুরে তিনি ক্যানসারগ্রস্ত ঠাকুরকে বলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে স্যাঁতসেঁতে ঘরে থাকতেন, তাই আপনার গলা ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান। আমাদের গলা ব্যথা হলে

আমরা চা খাই, আমাদের গলা ব্যথা সেরে যায়।" সরল ঠাকুর চা খেতে রাজি হলেন। কিন্তু রাখাল মহারাজ যখন বললেন যে চা খুব গরম; আপনার ক্ষত গলায় সইবে না। তখন ঠাকুর সুবোধকে প্রবোধ দিয়ে বললেন, "না বাপু, তাহলে আমার উল্টে গরম হয়ে যাবে। ওরে সইল না।"

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর খোকা মহারাজ ভারতের বিভিন্ন তীর্থে ও হিমালয়ে কঠোর তপস্যা করেছেন। শেষে আলমবাজার মঠ ও বেলুড় মঠে থেকে ঠাকুরসেবা করেছেন এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঠাকুরের নাম ও ভাব প্রচার করেছেন। তাঁর মিষ্ট ব্যবহার, সরলতা, আন্তরিকতা, পবিত্রতা সাধু ও ভক্তদের মুগ্ধ করেছে।

এক রাতে বেলুড় মঠে স্বামীজী ধ্যান থেকে উঠে খোকা মহারাজকে তামাক সেজে খাওয়াতে বলেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর আদেশ পালন করেন। স্বামীজী খুশি হয়ে খোকা মহারাজকে বলেন, "খোকা, একটা বর চা। যা চাবি তাই দেব।" খোকা মহারাজ ঃ "ঠাকুর আমাদের সব দিয়েছেন। আর কি চাইব?" রাখাল মহারাজ পাশেই ছিলেন। তিনি বললেন, "খোকা, কিছু চেয়ে নে।" খোকা মহারাজ তখন স্বামীজীকে বললেন, "এই বর দাও যাতে আমি সারা জীবন প্রতিদিন এক কাপ চা থেকে বঞ্চিত না হই।" অবশ্যই সত্যদ্রষ্টা স্বামীজীর আশীর্বাদ কোন দিন ব্যর্থ হয়নি। এসব তুচ্ছ স্মৃতি আমাদের জানিয়ে দেয় শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের ত্যাগের মহিমা।

স্বামী শ্রদ্ধানন্দের কাছে খোকা মহারাজের একটা অপ্রকাশিত স্মৃতি শুনেছিলাম ঃ "একদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী নিবিষ্ট মনে একটা বই পড়ছিলেন। রাতে খাওয়ার ঘণ্টা পড়ল, কিন্তু তিনি শুনতে পাননি। সবাই স্বামীজীর জন্য খাওয়ার ঘরে অপেক্ষা করছে; কিন্তু কেউ তাঁর কাছে যেতে সাহস পাচ্ছে না। শেষে স্বামী ব্রহ্মানন্দ খোকা মহারাজকে স্বামীজীকে ডাকতে পাঠালেন। তিনি নিঃশব্দে স্বামীজীর ঘরে ঢুকে পিছন থেকে বই-এর পৃষ্ঠা নম্বর দেখে হঠাৎ বইটা বন্ধ করে দিলেন। স্বামীজী চমকে উঠে বললেন, 'শালা খোকা, আমার বই বন্ধ করলি কেন? আমি এখন কি করে ঠিক করব কোথায় পড়ছিলাম?'

খোকা মহারাজ স্বামীজীর হাত থেকে বই নিয়ে পৃষ্ঠা নম্বর দেখিয়ে দিলেন এবং বললেন, 'খাওয়ার ঘণ্টা পড়ে গেছে। খাবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। আমরা সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করছি।' স্বামীজী তখনই খোকা মহারাজের সঙ্গে গিয়ে খেতে বসলেন।" এসব কাহিনী আমাদের জানিয়ে দেয় ঠাকুর কী মধুর ভাবে তাঁর শিষ্যদের ভালবাসার বন্ধনে বেঁধেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের জীবনকথা, সাধনকথা, ভ্রমণকথা, স্মৃতিকথা ও উপদেশ অধ্যাত্ম জগতের পরম সম্পদ। অতীতের এই লুপ্ত স্মৃতিগুলিকে জ্বলন্ত করার উদ্দেশ্যে আমি পঞ্চ প্রাণের পঞ্চ প্রদীপ জ্বেলে আরতি করেছি। এই জ্যোতির্ময় মহাজাতকের প্রতি অর্ঘ্য নিবেদন যদি কারও এতটুকু মর্মস্পর্শী হয়, তবেই আমার এই স্মৃতি-সঙ্কলন পূজা সার্থক হবে।

স্বামী চেতনানন্দ
সেণ্ট লুইস, আমেরিকা
দুর্গাপূজা, ২০০৪ সাল

স্বামী সুবোধানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত

(১৮৬৭—১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ)

প্রায় শত বৎসর পূর্বের কথা। তখনও কলকাতা বর্তমান সময়ের ন্যায় এরূপ বহুজনাকীর্ণ হয় নাই। প্রাচীন কলকাতার বৃক্ষলতাগুল্মাদি-শোভিত এক বিজন পল্লিতে জনৈক ব্রহ্মচারী সাধক শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার মূর্তি স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। ক্রমে লোকবসতি বৃদ্ধি পাওয়াতে পল্লির সে স্বাভাবিক শ্যামল সৌন্দর্য অন্তর্হিত হইল, তৎস্থলে ইষ্টক নির্মিত গৃহ ও দোকানপাট বিস্তৃত হইতে লাগিল। তখন ব্রহ্মচারী কাতরকণ্ঠে মহামায়ার নিকট নিবেদন করিলেন, "মা, আমি তো এই গোলমালে এখানে থাকিতে পারিব না, কিন্তু তোমাকেই বা কোথায় লইয়া যাই?" কথিত আছে মা তাঁহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, "আমি এই স্থানেই থাকিব—আমার সেবাপূজার ভার শঙ্কর ঘোষ গ্রহণ করিবে।" শ্রীযুত শঙ্কর ঘোষও ঐ মর্মে প্রত্যাদেশ লাভ করেন। মা তাঁহাকে অভয় দিয়া বলেন, "শঙ্কর, আমি বহুদিন তোমাদের সেবা গ্রহণ করিব।" তদবধি কলকাতাস্থ ঠনঠনিয়া পল্লির শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতা, শ্রীযুত শঙ্কর ঘোষের ও পরে তাঁহার বংশধরগণের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। নিকটস্থ শঙ্কর ঘোষ লেনে এখনও তদ্বংশীয়গণের বাসস্থান বিদ্যমান।

স্বামী সুবোধানন্দের পিতা কৃষ্ণদাস ঘোষ প্রাগুক্ত শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ছিলেন। কৃষ্ণদাস আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতেন এবং পুত্রদিগকেও সময় সময় নিজের সহিত সমাজে লইয়া যাইতেন। তিনি আবার ভাল ভাল পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিতেন। ছেলেরা কখনও তাঁহার সহিত, কখনও বা একাকী ঐ সকল পুস্তক পড়িত। স্বামী সুবোধানন্দ বলিতেন, "ছেলেবেলায় সাধুদের জীবনচরিত বেশি পড়তুম, দেখতুম কেমন করে কার জীবনের গতি ফিরে গেল।" তাঁহার মাতা নয়নতারা দেবী দেবদ্বিজে

ভক্তিপরায়ণা ও অত্যন্ত স্নেহময়ী জননী ছিলেন। তিনি সংসারের সকল কাজ সারিয়া যখনই সময় পাইতেন, শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতেন। এই উন্নতমনা ধর্মশীলা নারী, পুত্রদিগকে সর্বদাই ধর্মপথে উৎসাহিত করিতেন। কত রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণের গল্প বলিতেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ভগবানে বিশ্বাস, সত্যপালন, দরিদ্রের প্রতি করুণা—এইসব বিষয় শিক্ষা দিতেন। মায়ের নিকটেই সুবোধানন্দের ধর্মজীবনের হাতেখড়ি হইয়াছিল। জীবনসায়াহ্নেও স্বামী সুবোধানন্দকে দেখা যাইত, হয় অধ্যাত্ম রামায়ণ, না হয় একখানা পুরাণ হস্তে লইয়া, বেলুড় মঠের উপরতলায় গঙ্গার ধারে বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া এক মনে পাঠ করিতেছেন। বলিতেন, "বেশ একটা সদ্ভাব লইয়া থাকা যায়।"

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম ছিল সুবোধচন্দ্র ঘোষ। জন্ম তারিখ ১২৭৪ সালের ২৩ কার্তিক, শুক্রবার, উত্থান একাদশীর দিন; ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দের ৮ নভেম্বর। জাতকের মীনরাশি, নরগণ, বিপ্রবর্ণ, শুক্রের দশা। তাঁহার জন্মের অব্যবহিত পূর্বে কলকাতায় প্রবল ঝড় হইয়াছিল। সেইজন্য বাড়িতে কখনো কখনো তাঁহাকে 'ঝড়ো' বলিয়া ডাকিত। তাঁহার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে দুর্যোগ কাটিয়া গিয়া প্রকৃতি নির্মল শোভা ধারণ করে—যেমন জ্ঞানসূর্যোদয়ে অজ্ঞানমেঘ কাটিয়া যায়। তাঁহার মাতাঠাকুরানীও মনে করিতেন, শিশুটিকে তিনি দেবতার আশীর্বাদরূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি তাঁহাকে 'দেবতা' বলিয়া ডাকিতেন।

মাতা, ঠাকুরমাতা, পিতা, গুরুমহাশয়, ভ্রাতৃবর্গ, প্রতিবেশী, খেলার সাথি—সকলেই সুবোধের শান্ত স্বভাবের জন্য, তাঁহার সরলতা, মাধুর্য ও তেজপূর্ণ বাক্যের জন্য তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। মায়ের নিকট সাগ্রহে দেবদেবীর বিষয় শুনিয়া শুনিয়া অতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার দেবদেবীর প্রতি ভক্তি বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। বাটিস্থ পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্তির পর পিতা তাঁহাকে Albert Collegiate School-এ ভর্তি করিয়া দেন। সেখানে তিনি খুব ভাল ছাত্র বলিয়া প্রশংসিত হইয়াছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন এবং পরীক্ষায় খুব ভাল নম্বর পাইতেন।

এই সময়ে সুবোধ তাঁহার পিতার আনীত পুস্তকাবলির মধ্যে সুরেশচন্দ্র দত্ত-প্রণীত "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি" নামক একখানা পুস্তক প্রাপ্ত হন। ইতঃপূর্বে তাঁহার পিতা (কৃষ্ণদাস) ছেলেদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে কথাবার্তা কহিয়াছিলেন। কিরূপে পরমহংসদেবের সহিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের মিলন হয়, সে সম্বন্ধে কথা হইয়াছিল। কেশবের পত্রিকাতেও সুবোধ পরমহংসদেব সম্বন্ধে পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে ঐ পুস্তকখানি পড়িয়াই সুবোধের মন দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হয়। পিতাকে ঐ কথা বলিলে তিনি উত্তর করেন, "তা বেশ তো, যখন অফিসের ছুটি থাকবে, তখন একদিন বাড়ির সকলে মিলে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংস মহাশয়কে দর্শন করে এলেই হবে।" সুবোধের কিন্তু বিলম্ব অসহ্য—

"তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্বং।
ভাবস্থিরাণি জননান্তর সৌহৃদানি।"—শকুন্তলা

সুবোধের মনের অবস্থা তখন এরূপ যে দক্ষিণেশ্বর না গেলেই নয়। তিনি জানিতেন না দক্ষিণেশ্বর কোন্ দিকে। শুনিয়াছিলেন উহা কলকাতা হইতে ছয় সাত মাইল উত্তরে গঙ্গার ধারে অবস্থিত। পাড়ায় একজন সহপাঠী বন্ধু ছিলেন, ক্ষীরোদচন্দ্র মিত্র। তাহার নিকট মনের কথা খুলিয়া বলিলেন এবং দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইবার দিন স্থির করিলেন।

তখন ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের জুন বা জুলাই মাস। রথযাত্রার দিন, সূর্যোদয়ের পূর্বে, ক্ষীরোদের সহিত কাহাকেও কিছু না বলিয়া দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবকে একটিবার দেখিবার জন্য যাত্রা করেন। ইহাকে উহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া পথ চলিতে লাগিলেন। দুই বন্ধু পথ ভুলিয়া আড়িয়াদহ পর্যন্ত গিয়া উপস্থিত। একজন পথিক শেষে দক্ষিণেশ্বরের ঠিক পথ দেখাইয়া দেয়। তাঁহারা ধানক্ষেতের ভিতর দিয়া গিয়াছিলেন। ইতঃপূর্বে সুবোধ কখনও ধানক্ষেত দেখেন নাই। যত বেলা বাড়িতে লাগিল, সুবোধ ততই চিন্তান্বিত হইতে লাগিলেন, "কি করলুম, মা, বাবা, ঠাকুর-মা—এরা সব কি মনে করবেন।" প্রকাশ্যে বলিলেন, "ক্ষীরোদ, চল ফিরে যাই, বেলা দুপুর হলো,

রাত হবার আগে বাড়ি ফিরে যেতে হবে।" ক্ষীরোদ ব্যস্ত হইতে বারণ করিলেন। অবশেষে উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছিলেন।

ক্ষীরোদকে আগে শ্রীশ্রীঠাকুরের ঘরে প্রবেশ করিতে বলিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ঘরেই ছিলেন, ক্ষীরোদ ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পাদপদ্মে প্রণাম করিতেই, ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসচ?"

ক্ষীরোদ—কলকাতা থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণ—ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? "ওগো বাবু, এগিয়ে কাছে এস না?"

সুবোধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিলেন।

সুবোধকে দেখিবামাত্র পরমহংসদেব তাহাকে নিজের জন বলিয়া বুঝিতে পারেন। ঠাকুর তাহার হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। সুবোধ বলিয়াছিলেন, "রাস্তায় কত লোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বসিব না।" ঠাকুর তাহাকে এক হাতে জড়াইয়া ধরিয়া রহিলেন ও বলিলেন, "তুই এখানকার, কাপড়ে কি আসে যায়?" পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনা আপনি হাসিতে লাগিলেন; আর কত কথা হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলনের দিন স্মরণ করিয়া তিনি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে জনৈক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন—

"ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন তুই এখানকার, তার মানে আমি তাঁর।"

"শ্রীশ্রীমা ও ঠাকুর যে সমস্ত মেয়ে ও পুরুষকে কৃপা করিয়াছেন, বলিতে হবে যে পূর্ব জন্মের বহু তপস্যা ব্যতীত তাঁদের কৃপাদয়া লাভ হয় না। আমি একজনার সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি অন্য লোক উপলক্ষ মাত্র। যাঁর জিনিস, যাঁর লোক তিনিই টানিয়া লন। আমাদের ভালমন্দ সমস্তই তাঁদের হাতে। তাঁরা যদি ধরা না দেন, কার সাধ্য তাঁদের ধরিতে পারে, কিংবা তাঁদের চিনিতে পারে।"

সেই দিন (প্রথম দর্শনের দিন) শ্রীশ্রীঠাকুর সুবোধকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,

"এ ছেলেটি শঙ্কর ঘোষের বাড়ির, কেমন?" (সুবোধের প্রতি) "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তোদের সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি, তুই তখন জন্মাসনি। তুই এখানে আসবি—জানতুম। যাদের হবে (ধর্মলাভ হইবে) মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন।"

সুবোধ বলিয়াছিলেন, "আমি যদি এখানকারই তবে আরও আগে (ছোট সময়ে) আনিলেন না কেন?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "দেখ, সময় না হলে হয় না।" এইরূপ পরিচয় ও কথাবার্তার পর শ্রীশ্রীঠাকুর তাহাকে পুনরায় শনি কি মঙ্গলবারে আসিতে বলেন।

বালক সুবোধ পরবর্তী শনিবারেই ক্ষীরোদকে সঙ্গে লইয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তখন এক ঘর লোক বসিয়া ছিল। তাঁহার ঘর হইতে সুবোধকে দেখিবামাত্র তিনি অভয়কর উত্তোলন পূর্বক ইঙ্গিতে তাহাকে বাহিরেই থাকিতে বলিলেন। পরে ভক্তদিগকে একটু বসিতে বলিয়া স্বয়ং বাহির হইয়া আসিলেন এবং সুবোধ ও তাহার সঙ্গীকে নিকটস্থ শিবমন্দিরের সিঁড়িতে বসাইয়া যাহা বলিবার বলিয়া (দীক্ষা) দেন এবং বুকে ও মাথায় হাত বুলাইয়া দেন। জিহ্বায় একটি মন্ত্র লিখিয়া দেন ও তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলেন। একটু পরেই সুবোধ অনুভব করেন, তাঁহার মাথায় যেন কি একটা উঠিয়া তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া অচৈতন্যের ন্যায় (সমাধিস্থ) করিয়া ফেলিল। দেখেন ঠাকুর নাই, কত সৌম্যদর্শন দেবদেবীর মূর্তি, আবার কখনও দেখেন শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি। ক্রমে সব অনন্তে বিলীন হইয়া এক অপূর্ব আনন্দসাগরে তাঁহাকে ডুবাইয়া ফেলিল। কিছুক্ষণ পরে শ্রীশ্রীঠাকুর পুনরায় সুবোধের মাথায় ও বুকে হাত বুলাইয়া দেওয়াতে তিনি প্রকৃতিস্থ হইতে পারিয়াছিলেন। প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "খুব কি ভয় হয়েছিল?" সুবোধ উত্তর করিলেন, "হাঁ।" শ্রীশ্রীঠাকুর অভয় দিয়া বলিলেন, "তুই কি বাড়িতে ধ্যান-ট্যান কত্তিস?" সুবোধ বলিলেন, "বাড়িতে মায়ের নিকট ঠাকুরদেবতার বিষয় যা শুনেছিলাম তাই একটু-আধটু ভাবতুম।" শ্রীশ্রীঠাকুর বলিলেন, "তাই তোর এত শিগ্‌গির হলো।"

ইহাই কি শাস্ত্রোক্ত কুণ্ডলিনীর জাগরণ?

‘‘ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে মহাপুরুষগণ অন্তরের আধ্যাত্মিক শক্তি অপরে সংক্রমণ পূর্বক তাহার মনের গতি উচ্চপথে পরিচালিত করিয়া দিতে সমর্থ, এই কথা শাস্ত্রগ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে। অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গের তো কথাই নাই—বেশ্যা লম্পটাদি দুষ্কৃতকারীদিগের জীবনও ঐরূপে মহাপুরুষদিগের শক্তি প্রভাবে পরিবর্তিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, ঈশা, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি যে সকল মহাপুরুষগণ ঈশ্বরাবতার বলিয়া সংসারে অদ্যাবধি পূজিত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জীবনেই ঐ শক্তির স্বল্পবিস্তর প্রকাশ দেখা যায়। কিন্তু শাস্ত্রে ঐরূপ থাকিলে কি হইবে, ঐ শ্রেণির পুরুষদিগের অলৌকিক কার্যকলাপের সাক্ষাৎ পরিচয় বহুকাল পর্যন্ত হারাইয়া সংসার এখন ঐ সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাসী হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বরাবতারে বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, ঈশ্বরবিশ্বাসও এখন অনেকস্থলে কুসংস্কারপ্রসূত মানসিক দুর্বলতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মানব সাধারণের চিত্ত হইতে ঐ অবিশ্বাস দূর করিয়া তাহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন করিতে ঠাকুরের ন্যায় অলৌকিক পুরুষের সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করা বর্তমান যুগে একান্ত আবশ্যক হইয়াছিল। পূর্বোক্ত শক্তির প্রকাশ তাঁহাতে অবলোকন করিয়া আমরা এখন পূর্ব পূর্ব যুগের মহাপুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐ বিষয়ে বিশ্বাসবান হইতেছি।’’ (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা -প্রসঙ্গ)

বালকভক্ত সুবোধের তখন শ্রীশ্রীঠাকুরকে শ্রীকৃষ্ণাদির ন্যায় দেবমানব বলিয়াই ধারণা হইয়া থাকিবে। কিন্তু প্রথমেই উহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় নাই। কারণ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, ‘‘আমাকে তোর কি মনে হয়?’’ তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘‘লোকে তো কত কি বলে। আমার এখনও ওসব মনে নেয় না। আমি নিজে না বুঝা পর্যন্ত ওসব কিছু বিশ্বাস কচ্ছি নি।’’ তিনি পরে শ্রীশ্রীঠাকুর সম্বন্ধে অনেক বুঝিয়াছিলেন। কি বুঝিয়াছিলেন, কে বলিবে?

সুবোধকে যে দিন হইতে দিব্যাবেশে স্পর্শ করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর আপনার

করিয়া লইয়াছিলেন, সেই দিন হইতে সুবোধ যেন বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্মজীবন গঠনের ভার ঠাকুর স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরও সুযোগ দেখিলেই একান্তে সুবোধকে ধ্যানাদি ধর্মের উচ্চাঙ্গসকল এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য পালনের উপদেশ করিতেন। উহা যে সকল সময় সাক্ষাৎভাবে উপদেশ হিসাবে করিতেন তাহা নহে, অহৈতুকী ভালবাসায় তাঁহাকে আপন করিয়া লইয়া কখনো খেলায়, কখনো গল্পচ্ছলে, কখনো বা অলৌকিক শক্তিবলে তাঁহার আধ্যাত্মিক জীবন সম্পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর কখনও সমীপাগত কোনও ভক্তের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিতেন না, বলিতেন কাহারও ভাব ভঙ্গ করিতে নাই। সুবোধ স্বেচ্ছায় আপন ভাবে কখনো ধ্যান, কখনো জপ, কখনো বা ঈশ্বর চিন্তা লইয়া থাকিতেন। তবে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন, সর্বদাই দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে বাসনা হয় এবং যাইতেনও। অনেক সময় দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আসিয়া পৌছিতেন এবং আসিয়াই ঠাকুরকে বাতাস করিতেন—আশ্চর্যের বিষয় ইহাতেই তাঁহার শ্রান্তি দূর হইত। একদিন দাঁড়াইয়া বাতাস করিতে অসুবিধা হইতেছে মনে করিয়া ঠাকুর তাঁহাকে নিজ বিছানায় বসিয়া বাতাস করিতে বলিলেন। তিনি দ্বিধা বোধ করাতে, ঠাকুর তাঁহাকে জোর করিয়া নিজের বিছানায় বসাইয়া দিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া পাখাখানা নিজের হাতে লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিলেন। মা যশোদা অথবা পিতা নন্দ বুঝি তাঁদের গোপালকে এইরূপেই ভালবাসিতেন।

আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা চরম উপলব্ধি তাহার আভাষ সুবোধ ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দ্বিতীয়বার দর্শনের সময়েই—অর্থাৎ দীক্ষার দিনই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এখন ঐ ভাবটিকে পুনঃপ্রাপ্ত হওয়া এবং উহাতেই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকা ইহাই তাঁহার একমাত্র কার্য হইয়াছিল। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর যেরূপ বলিতেন, "কেউ কেউ আগে ভগবান লাভ করার পর সাধন করে, যেমন লাউ কুমড়ো গাছে আগে ফল হয়, তারপর ফুল।" এই কথা সুবোধের সম্বন্ধে সর্বথা প্রযোজ্য বলিয়া মনে হয়। সেইজন্য, যদিও আমরা দেখিতে পাই

যে অনেক সময় তিনি অনেক কঠোর সাধন করিয়াছেন, কিন্তু উহা যে কিছু লাভ করিবার আশায় তাহা নহে। নিজ গতিমুক্তির ভার তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দিয়া চিরকালের তরে নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। দেখিতে পাই একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর যখন তাঁহাকে ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, "ধ্যান-ট্যান করতে পারবো না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলতো—আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?" শ্রীশ্রীঠাকুরও তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর সুবোধকে বলিয়াছিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাস্টার আছে, সে এখানে আসে, বেশ লোক, তার কাছে যাস আর এখানে মাঝে মাঝে আসিস।" সুবোধ তাহাতে একদিন উত্তর করিয়াছিলেন, "তার কাছে কি যাব? সে কি শিখাবে? সে শিখাবার লোক হলে নিজে আর এমনি এলোমেলো সংসার কচ্ছে কেন? সেই সংসার ছেড়ে দিত।"

এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ও রাখাল[১], শুনেছিস খোকাশালা কি বলছে? ওরে সে কি (মাস্টার কি) আর নিজের বানানো কিছু বলবে? এখানকার কথাই সব বলবে।" অতঃপর সুবোধ মাস্টার মহাশয়ের নিকট যাইয়া ঐ সকল কথা বিবৃত করেন। তাহাতে মাস্টার মহাশয় উত্তর করেন, "তাইতো, সমুদ্রে যায় লোকে, কেউ জালা নিয়ে, কেউ কলসি নিয়ে, কেউ ঘটি নিয়ে। যার যার পাত্র ভরে জল নিয়ে আসে, আর সবাইকে সেই জলেরই একটু একটু দেয়। অন্য জল কোথায় পাবে? আমরা সামান্য মানুষ, তাঁর কাছে যা একটু-আধটু শুনেছি তা ছাড়া আর অন্য কথা কোথায় পাব? এই যে এতটা পড়াশুনা করলুম, তাঁর কাছে গিয়ে সবই তো মিথ্যা হয়ে গেল। লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে ফেলেছি। ও মা, তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম, সব বিদ্যা অবিদ্যা, যে বিদ্যায় ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, অবিদ্যা অন্ধকার দূর হয়, সেই বিদ্যাই বিদ্যা। তাঁর একটি কথায় সব ভেসে গেল, মনে হলো কি আশ্চর্য এই বিদ্যা নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার হয়!"

১ স্বামী ব্রহ্মানন্দ

অনেকক্ষণ সদালাপের পর মাস্টার মহাশয় সুবোধকে মিষ্টিমুখ করাইয়া বিদায় দিলেন।

এই সময়ে একদিন শ্রীশ্রীঠাকুর সুবোধকে দেখাইয়া শরৎ[১] ও শশীকে[২] বলিলেন, "দেখ, তোরা নরেনের[৩] সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিবি। এর বাড়ি থেকে নরেনের বাড়ি কাছে।" তাহার পর সুবোধকে বলিলেন, "নরেন বড় ভাল ছেলে, যেমন পড়াশুনায়, তেমনি গাইতে বাজাতে, তেমনি বলতে কইতে। সে এখানে প্রায়ই আসে, আমাকে খুব ভালবাসে।"

এইরূপে শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যগণ একে একে পরস্পর অপূর্ব ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের গলার অসুখের সূত্রপাত হয়। ভক্তগণ তাঁহাকে কাশীপুরে এক ভাড়াটিয়া উদ্যানে লইয়া গিয়া রাখেন। তাঁহার অসুখের জন্য সকলেই বড় চিন্তিত। বালকভক্ত সুবোধ একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি দক্ষিণেশ্বরে যে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকতেন, তাই আপনার গলা ব্যথা হয়েছে। আপনি চা খান। আমাদের গলা ব্যথা হলে, আমরা চা খাই, গলা ব্যথা সেরে যায়।"

শ্রীশ্রীঠাকুর অমনি বালকবৎ স্বীকৃত হইলেন এবং বলিলেন, "তবে চা-ই খাই। ও রাখাল, এ বলচে চা খেলে না কি গলা ব্যথা সেরে যাবে।"

রাখাল উত্তর করিলেন, "সে কি আপনার সহ্য হবে? সে যে গরম জিনিস।"

তখনই শ্রীরামকৃষ্ণ বলিলেন, "না বাবু, তাহলে—আবার উল্টে গরম হয়ে যাবে। (সুবোধের প্রতি) ও রে, সইলোনি।" (অর্থাৎ চা সহ্য হইল না।)

১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ আগস্ট কাশীপুর উদ্যানবাটিতে শ্রীশ্রীঠাকুর মহাসমাধিতে দেহরক্ষা করেন। তখন সুবোধের বয়স উনিশ বৎসর। সুবোধের এবং তাঁহার ন্যায় কৌমার-বৈরাগ্যবান শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্যান্য শিষ্যগণের তখন

---

১ স্বামী সারদানন্দ ২ স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ৩ স্বামী বিবেকানন্দ

এক মহা পরীক্ষার সময়। ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত মিলনের কিছু পূর্বেই, সুবোধের বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। সে কথায় তিনি তাঁহার পিতাকে স্পষ্ট জবাব দিয়াছিলেন যে, তাঁহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা নাই—জোর করিয়া বিবাহ দিলে তিনি নিরুপায়, কিন্তু বাড়ি বসিয়া সংসার করা তাঁহার পোষাইবে না; তবে আর অনর্থক একটা ছেঁড়া ল্যাঠা জোটানো কেন? পিতা তাঁহার মনের ভাব সম্ভবত ভালরূপ বুঝিতে পারেন নাই, শুধু বলিয়াছিলেন, "কেন, বিয়ে করবে না কেন? ভাল করে লেখাপড়া কর, খুব বড় ঘরে বিয়ে হবে।" তদবধি তিনি লেখাপড়ায় স্বেচ্ছাকৃত অমনোযোগ করিয়া থাকেন, কারণ জানিতেন ভালরূপ পাশ করিলেই পিতা বিবাহ দিবেন। সে সময়ে তাহার বয়স ষোল সতের বৎসর মাত্র। তিনি তখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়িতেন এবং এই সময়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট তিনি প্রথম গমন করেন। এক্ষণে দুই বৎসর শ্রীশ্রীঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গলাভের পর তাঁহার মনে কোটি-কল্প দুর্লভ নির্মল বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর চলিয়া গেলেন, ভালবাসায় সকলকে এক করিয়া দিয়া গেলেন, তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যবর্গ একতার বিরোধী যত প্রকার মায়িক সম্বন্ধ—এ আমার মাতা, পিতা, ভ্রাতা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অভিমান—আর কি করিয়া রক্ষা করেন? বিশ্ব তাঁহাদের ব্রহ্মময়, ঠাকুরময় হইয়া গিয়াছে, ক্ষুদ্র সংসারে আর তাঁহারা কি করিয়া আবদ্ধ থাকেন? কাজেই গৃহ তাঁহাদের কারাগার তুল্য বোধ হয়।

সুবোধ একদিন বাড়ি হইতে একাকী বাহির হইয়া চলিয়া যান। ঠনঠনিয়া শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালীমাতাকে প্রণাম করিয়া যখন যাত্রা করিবেন, তখন দেখেন মা হাসিতেছেন। হাসিয়া হাসিয়া যেন তাঁহার মাথায় অভয়কর স্থাপন করিয়া বলিতেছেন, "ভয় কি, আমি তোর সঙ্গে সঙ্গে আছি। তোর কোন ভয় নাই।"

গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া সুবোধ হাঁটিতে আরম্ভ করেন। যেখানে রাত্রি হইত পরিশ্রান্ত হইয়া শুইয়া পড়িতেন। শয়নের পূর্বে একবার বলিতেন, "মা দেখো।" কেহ কিছু দিলে তাহাই অল্প পরিমাণ আহার করিতেন। যেখানে জল দেখিতেন পিপাসা পাইলে তাহাই অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া পান করিতেন। সে সময়ে মাঠে

খাটে কোথায় পড়িয়া থাকিতেন, তাহার হিসাব ছিল না। মশা কামড়াইবে, সাপে কাটিবে, এ কথা তখন মনে হইত না। মনে হইত ভগবানের যখন দয়া হইল না, এ শরীর গেলেই ভাল। ক্রমশ এইরূপে ব্যাকুলভাবে হাঁটিতে হাঁটিতে তিনি কাশীধামে উপনীত হন। সে সময়ে লোকসঙ্গ বিষবৎ জ্ঞান করিতেন। কেহ পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "মা, বাপ, ভাই, বোন তিন কুলে আমার কেহ নাই।"

কাশীতে আসিয়া গঙ্গাস্নান ও বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা দর্শন করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করিয়াছিলেন। সেবারে অল্পদিন মধ্যেই তাঁহার আত্মীয়-স্বজন সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে কলকাতায় লইয়া আসেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাসমাধির কিছুদিন পরেই কলকাতা ও দক্ষিণেশ্বরের মধ্যবর্তী বরাহনগর নামক স্থানে একটি জীর্ণ ভাড়াটিয়া বাড়িতে শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণ তাঁহার স্মরণ-চিহ্ন সকল একত্র করিয়া ধ্যান, জপ, পূজা, পাঠ ও তপস্যায় রত হন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের সেই সূত্রপাত। ক্রমে সুবোধও আসিয়া মঠে যোগদান করেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতির ন্যায় বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস নাম হয় স্বামী সুবোধানন্দ।

তদবধি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ইতিহাসের সহিত স্বামী সুবোধানন্দের জীবনেতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নরেন্দ্রনাথ (বিবেকানন্দ) বরাহনগরে যে তীব্র তপস্যার স্রোত বহাইয়াছিলেন, স্বামী সুবোধানন্দ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ সেই স্রোতাবেগ নিজ নিজ তপস্যার দ্বারা বর্ধিত করিয়াছিলেন। ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ বরাহনগরে স্থাপিত ছিল। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আলমবাজারে মঠ ছিল। তৎপর ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে বেলুড়ে নীলাম্বর মুখার্জির ভাড়াটিয়া বাড়িতে এবং অবশেষে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রধান কেন্দ্র (Head Quarters) স্থাপিত হয়। মঠের সন্ন্যাসিগণ কখনো মঠে থাকিয়া তপস্যা করিতেন, কখনো বা তীর্থ পর্যটনে এদিক ওদিক যাইতেন।

১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামী সুবোধানন্দ স্বামী ব্রহ্মানন্দের সহিত প্রব্রজ্যায় বাহির হইয়া দ্বিতীয়বার কাশীধামে আগমন করেন। কাশীতে তাঁহারা প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়ের বাগানে থাকিয়া কিছুকাল তপস্যা করেন। ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁহারা ওঁকার, গির্ণার, আবু, বম্বে ও দ্বারকা দেখিয়া বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছিলেন। বৃন্দাবনে তখন ভক্তবর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ছিলেন। গোঁসাইজির ওখানে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে যাইতেন, গোঁসাইজিও আসিতেন। অনুমান, বৃন্দাবন হইতে তিনি কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম গমন করেন এবং হিমালয়ের নানা স্থানে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কঠোর তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করেন। অতঃপর তিনি দক্ষিণদেশে (কুমারিকা পর্যন্ত) গমন করেন। দাক্ষিণাত্যে তিনি মাদ্রাজীদের ভাষা মৌখিক কিছু কিছু শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তাহাদের অনেক উপকথা জানিতেন। মীনাক্ষী দেবীর গল্প, কাবেরীর গল্প এবং রামেশ্বর সেতুবন্ধ ও কন্যাকুমারীর অনেক গল্প পরবর্তী কালে ভক্তগণ তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলেন। বেলুড় মঠের ডায়েরি হইতে দেখা যায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২ মার্চ তিনি মাদ্রাজ হইতে মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। একখানা পুরাতন পত্র হইতে দেখা যায় যে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট তিনি আলমোড়া হইতে লিখিতেছেন—"...পুনরায় কেদারনাথ ও বদরিকাশ্রম গিয়াছিলাম এবং পাহাড়ে আমাদের যে মঠ আছে সেখানেও গিয়াছিলাম।" ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ অক্টোবর কেদার বদরী হইতে মঠে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০০ খ্রিস্টাব্দে স্বামী অদ্বৈতানন্দের সহিত নবদ্বীপ গমন করেন। অনুমান অতঃপর তিনি দার্জিলিং হইতে স্থানে স্থানে হাঁটিয়া গৌহাটি কামরূপ কামাখ্যা দর্শনে গমন করেন। একখানি পুরাতন পত্র হইতে দেখা যায় যে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনরায় আলমোড়ায় অবস্থান করিয়াছিলেন। যতদূর মনে হয় সম্ভবত তিনি এইবার কালাজ্বরে আক্রান্ত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ-মানসে আলমোড়ায় গমন করেন। তিনি কতস্থানে যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তাহার তালিকা করা অসম্ভব। উপরে যে অল্প কয়েকটি স্থানের উল্লেখ করা হইল, তাহা হইতে কেহ ভ্রমে না পতিত হন, সেইজন্য এ কথা বলা হইল।

সে সময়কার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ইতিহাসের কিয়দংশ আমরা মধ্যে ছাড়িয়া আসিয়াছি। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য দেশ হইতে ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়া কলম্বোয় পদার্পণ করেন। তাঁহার প্রত্যাবর্তনের পূর্বে ও পরে স্বামী সুবোধানন্দ ও তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতাগণ ভারতের নানাস্থানে যে তীর্থপর্যটন এবং কঠোর তপশ্চর্যায় কালাতিপাত করিয়াছেন, তৎসমস্তই "বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায়" এবং ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের নিমিত্তই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামীজীর আহ্বানে যখন তাঁহারা "শিবজ্ঞানে জীবসেবা"-রূপ অভিনব মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া ভগবদ্‌বোধে লোককল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন, স্বামী সুবোধানন্দ তখন সানন্দে তাঁহাদিগের সহকর্মী হন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার পর ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার যে এগার জন গুরুভ্রাতাকে উহার ট্রাস্টি নিযুক্ত করিয়াছিলেন, স্বামী সুবোধানন্দ তাঁহাদের অন্যতম।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একজন বিশিষ্ট সেবক ও পরিচালকরূপে তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে লোককল্যাণ-সাধন কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। উড়িষ্যায় দুর্ভিক্ষের সময় তিনি সেবাকার্যে প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। কোঠার হইতে সতীশ নামক একটি দুঃস্থ বালককে কলকাতায় আনিয়া লেখাপড়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বস্তুত যেখানেই রোগ, শোক, দারিদ্র, দুঃখ দেখিতেন সেখানেই সহানুভূতিতে গলিয়া যাইয়া উহা দূরীকরণে মনোযোগী হইতেন। প্রায়ই বলিতেন, লোকের বিপদে-আপদে একটু দেখা ভাল। যেখানে যাইতে হইবে অবিলম্বেই যাইতেন; বলিতেন, "মন করো না কাজে হেলা—সঙ্গী জোটে বা না জোটে একাই কর মেলা।" দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

তাঁহার অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা দর্শনে কেহ কেহ বুঝিতে পারিত না যে তিনি ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত (apostle) এবং কত বড় আধ্যাত্মিক সম্পদের অধিকারী। কেহ দীক্ষা লইতে আসিলে বলিতেন, "আমি কি জানি, আমি যে 'খোকা'—তোমরা রাখাল মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে

কিংবা মহাপুরুষের কাছে নিও—তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উচ্চ।" কেহ যদি অতি ব্যাকুল হইয়া ধরিত—"বাবা আমি মূর্খ, জানি না, মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না, ভয় হবে দেখলে। আমার আপনাকে নিজের বাবা বলে মনে হয়েছে, কই ভয় তো হয় না। আমি শুনবো না, আপনাকে দিতেই হবে।" তখন হাস্যময় বাক্যে বলিতেন, "আচ্ছা, আর একদিন হবে, আজ ভাববো।" ১৯১৫। ১৬ খ্রিস্টাব্দ হইতে এইরূপ দুই এক ক্ষেত্রে শ্রীশ্রীঠাকুরের আদেশ পাইলে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী বলিয়াছিলেন, "কেন খোকা মন্ত্র সব দেয় না—যে কয়দিন তাঁর (ঠাকুরের) ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।" তিনি যেসব শিক্ষা-দীক্ষা দিতেন, তাহাতে সরলতা, মাধুর্য, অন্তর্মুখীনতা এবং একান্ত নির্ভরের ভাব ভিন্ন আর কিছু ছিল না। কোন মহিলা শিষ্যা হয়ত বলিয়াছিলেন, "মহারাজ, আমি গায়ত্রী জানি না, আহ্নিক জানি না, স্তব জানি না। লোকে ন্যাস করে, গায়ত্রী ত্রিসন্ধ্যা করে, আমায় সব বলুন।" আহা, সে কি বালকের ন্যায় সরল কথায় সরল প্রাণে তাঁহাকে বলিতেন, "মায়ী, আমি ওসব জানি না কিছুই, আমি যে খোকা। তবে আমি যা পেয়েছি জেনেছি আনন্দে আছি তাই তোমায় দিয়েছি। শুদ্ধ ধ্যান, জপ, মনঃসংযম করে যাও।"

পূর্বে তিনি মেয়ে ভক্তদের সহিত কথাবার্তা কওয়া দূরে থাকুক, তাঁহাদিগকে দেখিলে অন্যদিক দিয়া চলিয়া যাইতেন। স্বামী বিবেকানন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনিতে আসে, তুমি বলিবে। তোমরাও যদি এইরূপ এড়িয়ে চল, তবে তাহারা কাহার নিকট যাইবে? ইহারা জগদম্বার রূপ—ইহাদের সহিত মাতা এবং কন্যার ন্যায় মিশিবে।" ইহার পর হইতে তিনি মেয়েদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা বলিতেন।

বিভিন্ন সময়ে তিনি বাঙলা, বিহার, ছোটনাগপুর, যুক্তপ্রদেশ এবং শেষ জীবনে বিশেষ করিয়া পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে যাইয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী প্রচার এবং স্বীয় জীবন-প্রভাবে বহু ভক্তের প্রাণে ধর্মপিপাসার উদ্রেক করিয়া

তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদর্শন পূর্বক চিরশান্তি ও কল্যাণের অধিকারী করিয়াছিলেন। তাঁহার মেয়ে ও পুরুষ শিষ্য ও ভক্ত অসংখ্য—তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই।

পূর্ববঙ্গে তাঁহাকে ধর্মপ্রচারার্থ অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইত। সময় সময় এমন হইত যে একটু বেড়াইবার সময় পাইতেন না। স্নান, আহার ও অধিক রাত্রে নিদ্রা—সেই সময়ে বিশ্রাম। সকাল হইতে রাত্র দশটা এগারটা পর্যন্ত লোকের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে কথাবার্তা এবং কখনও শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়া শুনানো হইত। মেয়ে পুরুষ সমানভাবে দলে দলে অনেক আসিত।

এইরূপ অতিরিক্ত পরিশ্রমে পূর্ববঙ্গে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। তদবধি তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ নীরোগ হয় নাই। মহাসমাধির দুই বৎসর পূর্বে তিনি একবার রক্তামাশয় রোগে আক্রান্ত হন। তখন তিনি জামতাড়ায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ছিলেন। একদিন তাঁহার অবস্থা এরূপ হয় যে সকলেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছিল। তাঁহার নিজ মুখে শুনিয়াছি এই সময়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পান এবং তাঁহারই আশীর্বাদে আরোগ্য লাভ করেন।

শেষকালে ক্ষয়রোগে বৎসরাধিক কাল নীরবে প্রফুল্লচিত্তে রোগযন্ত্রণা সহ্য করিয়া হাসিতে হাসিতে সমাধিযোগে দেহরক্ষা করেন, ২ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, বাংলা ১৩৩৯ সালের ১৬ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, শুক্লাপঞ্চমী তিথি।

তিনি মানবদেহে ৬৫ বৎসর ২৫ দিন ছিলেন। তাঁহার পবিত্র জীবন নিরবচ্ছিন্ন সৎচর্চা ও সৎচিন্তায় অতিবাহিত হইয়াছিল। এক্ষণে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট আনন্দে অবস্থান করিতেছেন। শেষকালে অসুস্থাবস্থায় তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "মহাপুরুষ (স্বামী শিবানন্দ) বলছিলেন, 'আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি তুমি ভাল হয়ে উঠ, আর অনেক দিন থাক।' আমার কিন্তু আর থাকতে ইচ্ছা হয় না। "সে দিন ভোর রাত্রে স্বপন দেখেছিলুম, দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ এদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে (বিবেকানন্দকে) দেখলুম না। ওঁরা বললেন, বসো বসো। আমি বললুম—না, আগে বল, স্বামীজী কোথায়? ওঁরা বললেন, তিনি

এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন। 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁর কাছে।' এই বলে রওনা হলুম। এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। সেখানে দেখলুম কেবল আনন্দ। আনন্দ-নগরে তাঁরা বাস করছেন, মহা আনন্দে আছেন সব। সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছে হয় না। যত কষ্ট এখানে—এই পৃথিবীতে।" ওঁ অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। আবিরাবীর্মএধি। রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥

স্বামী সুবোধানন্দ

অবনীমোহন গুপ্ত

এক

আঠারশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দের পয়লা নভেম্বর কলকাতা অঞ্চলে এক বিপর্যয়কর ঝঞ্ঝাবাত প্রবাহিত হয়।[১] তাহারই সপ্তাহকাল পরে, আটই নভেম্বর, উত্থান একাদশীর দিন মহানগরীর ঠনঠনিয়া পল্লিতে এক দেবকল্প শিশু জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুর পিতা শ্রীকৃষ্ণদাস ঘোষ। মাতা শ্রীমতী নয়নতারা ঘোষ। পিতামহ শ্রীরামচন্দ্র ঘোষ। প্রপিতামহ শ্রীরামশঙ্কর ঘোষ। ইনিই ঠনঠনের শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী কালী-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য শঙ্কর ঘোষ। এখনও ৪০ নং শঙ্কর ঘোষ লেনে তদীয় বংশধরগণ বিদ্যমান আছেন। শিশুর মাতামহের নাম শ্রীদুর্গাচরণ গুহ।

তাঁহার পিতৃদত্ত নাম শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ। মাতা ডাকিতেন—দেবতা। শুনা যায়, বাড়িতে আর একটি ডাক নাম ছিল—ঝোড়ি। সম্ভবত সেই সাতষট্টি সালের প্রচণ্ড ঝড়ের পরেই জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই নাম বাটিতে প্রচলিত হইয়াছিল। এই শিশুই যথাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘভুক্ত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ সন্ন্যাসি-শিষ্যগণের অন্যতম—স্বামী সুবোধানন্দ বা খোকা মহারাজ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সুবোধচন্দ্র পাড়ার একটি বালকের সহিত কলকাতা হইতে দক্ষিণেশ্বর

---

১ "On the 1st of November, 1867, the centre of the storm traversed the country nearby due east from Calcutta to Basirhat on the Ichamati River. In this line villages were blown down wholesale and their destruction was accompanied by loss of human life."--District Gazetteer of 24 Parganas.

(আড়াই ক্রোশ) পায়ে হাঁটিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি তখন নিতান্ত বালক, স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণিতে (প্রবেশিকার পূর্বের শ্রেণিতে) পাঠ করিতেন। সমসাময়িক শ্রীঅক্ষয়কুমার সেন তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি" নামক গ্রন্থে লিখেন ঃ

"ক্ষীরোধ সুবোধ দুটি অতি শিশু ছেলে।
শুনিয়া প্রভুর নাম আসে হেন কালে ॥
ক্ষীরোদ সংসারী পরে বল নাই বেশি।
সুবোধের খোকা নাম কুমার সন্ন্যাসী ॥"

সুবোধচন্দ্র ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণকে সর্বপ্রথম দর্শন করেন আঠার শো চুরাশি খ্রিস্টাব্দের পঁচিশে জুন। এইটি তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিন এবং সেই হেতু সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। ইহার সহিত তুলনায় অপর সকল ঘটনাই অকিঞ্চিৎকর। ইতঃপূর্বের ঘটনাশ্রেণি এবং অতঃপর সমগ্র জীবনব্যাপী তাঁহার যে প্রয়াস—ঈশ্বরলাভার্থে পথে-ঘাটে, শ্মশানে, নদীতীরে, অরণ্যে, পর্বতগহ্বরে, জপ-ধ্যান-সমাধিতে, তীর্থাটনে, পরহিতব্রতে, তিলে তিলে প্রাণপাতী কঠোর তপস্যায় যতকিছু জ্ঞান ও পুণ্যের সঞ্চয়—সে সমস্তই কোথায় ভাসিয়া যায়, হৃদয় মধুময় হয়, চিত্ত-মন-বুদ্ধি অহংসহ তলাইয়া যায়, একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত এই তাঁহার মিলনকথার চিন্তনে। এই এক কেন্দ্র-বিন্দু হইতে যতকিছু ভাব ও ভাবনার প্রসার তাহাই তাঁহার প্রকৃত জীবনী।

পরমহংসদেবের সহিত মিলন সম্বন্ধে তাঁহার নিজের উক্তি ঃ "তুমি লিখেছ রথের দিন তোমার দীক্ষার দিন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে ঐ দিনে আমিও গিয়াছিলাম। ঠাকুর আমার হাত ধরিয়া নিজের বিছানার উপর বসাইলেন। আমি বলিয়াছিলাম, রাস্তায় কত লোককে ছুঁইয়াছি, এই কাপড়ে আর আপনার বিছানায় বসিব না। ঠাকুর আমাকে এক হাতে জড়িয়ে ধরিয়া রহিলেন, বলিলেন—তুই এখানকার, কাপড়ে কি আসে যায়। পরে ঠাকুর ভাবে অচৈতন্য হইলেন ও আপনাআপনি হাসিতে লাগিলেন; আরও কত কথা হইল। ঠাকুর যে বলিয়াছিলেন—তুই এখানকার, তার মানে আমি তাঁর। ...আমি একজনার

সহিত দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে গিয়াছিলাম কিন্তু এখন ঠিক জানিয়াছি, অন্য লোক উপলক্ষ মাত্র। যার জিনিস, যার লোক সেই টানিয়া লয়।"[২]

এই উক্তিতে 'রথের দিন'-কথাটি প্রণিধানযোগ্য। একত্রিশে আগস্ট (১৮৮৫ খ্রিঃ) দক্ষিণেশ্বরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'কথামৃত'-প্রণেতা শ্রীম-(শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়)কে বলিয়াছিলেন—"দুটি ছেলে এসেছিল। শঙ্কর ঘোষের নাতির ছেলে (সুবোধ) আর একটি তাদের পাড়ার ছেলে (ক্ষীরোদ)। বেশ ছেলে দুটি।"[৩] কবে 'এসেছিল' বা কতদিন হইতে যাতায়াত করিতেছে সে সম্বন্ধে ঐ স্থানে কোন উল্লেখ নাই। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের রথের দিনই আসিয়া থাকিবে। সে বৎসর রথযাত্রা হইয়াছিল চোদ্দই জুলাই। সে দিন কিন্তু ঠাকুর বলরাম বসুর বাড়িতে ছিলেন, দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন না।[৪] তাহার পূর্বের বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দের তেসরা জুলাই শ্রীম লিখেন ঃ "গত ২৫ জুন বুধবারে শ্রীশ্রীরথযাত্রার দিন ঠাকুর শ্রীযুক্ত ঈশান মুখোপাধ্যায়ের ঠনঠনিয়ার বাটিতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[৫] সে দিন পূর্বাহ্নে ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরেই ছিলেন এবং সিদ্ধান্ত এই যে উক্ত রথের দিনই পূর্বাহ্নে সুবোধ শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রথম ভাগের (ষষ্ঠ সংস্করণের উপক্রমণিকা পৃঃ ৫) নিম্নলিখিত উক্তির সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ, যথা—"১৮৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে...সুবোধ...আসিলেন।" পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ-লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ—দিব্যভাব ও নরেন্দ্রনাথ'-নামক গ্রন্থের নবম অধ্যায়ে যাহা লিখিত হইয়াছে ["তাহারা সকলেই ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ অতীত হইবার পূর্বে তাঁহার (ঠাকুরের) নিকট আগমন করিয়াছিলেন"] তাহাও এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে।

---

২ [illegible] রামকৃষ্ণ মঠ, ঢাকা হইতে ১৩৪২ সনে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীস্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ও পত্র"—৭৯ পৃঃ, ৫৩ সংখ্যক পত্র দ্রষ্টব্য।

৩ "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত"—৪র্থ ভাগ, ৩য় সংস্করণ ২৯১ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৪ তদেব ২৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

৫ তদেব—১১৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

দুই

দুই বন্ধু (ক্ষীরোদ ও সুবোধ) গোপনে পরামর্শ করিয়া দক্ষিণেশ্বর যাইবার দিন স্থির করিলেন এবং নির্ধারিত দিনে প্রত্যুষে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিলেন।

পথ ভুল হওয়ায় অনেক ঘুরিতে হইল। অবশেষে দুই বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রকোষ্ঠের দ্বারে আসিয়া পড়িয়াছেন—ক্ষীরোদ অগ্রে, সুবোধ পশ্চাতে।

তাঁহারা একটু দূর হইতে করজোড়ে প্রণাম করিবামাত্র পরমহংসদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসচো গা।"

ক্ষীরোদ উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, কলকাতা থেকে।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "ও বাবুটি অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো খোকাবাবু, এগিয়ে কাছে এসো না!"

"পায়ে বড্ড ধুলো, ধুয়ে আসি"—এই বলিয়া দুই বন্ধু গঙ্গার ঘাটে যাইয়া হাত-পা ধুইয়া, কিঞ্চিৎ গঙ্গাবারি পান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। এবার সুবোধ অগ্রে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সুবোধের প্রতি এক বিশেষ প্রকারের দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তুই শঙ্কর ঘোষের বাড়ির?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি কি করে জানলেন?"

"যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম, তখন তোদের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি। তুই তখন কোথায়—জন্মাসনি। তুই এখানে আসবি জানতুম। যাদের হবে মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তুই অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন—কাছে আয়।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাদর আহ্বানে সুবোধ নিকটে আসিলেন। পরমহংসদেব তাঁহার একখানি হাত নিজ দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিয়া, বাম হস্তে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া একটু ধ্যানস্থ হইলেন। পরে কনুই হইতে আঙুলের ডগা

পর্যন্ত তাঁহার হাতখানির যেন ওজন পরীক্ষা করিতে করিতে বলিলেন, "দ্যাখ, তোর হবে। মা বললেন তোর হবে। এই বিছানায় বোস।"

"না মশাই, বাসি কাপড়, ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠেই চলে এসেছি, কত লোককে ছুঁয়েছি, এ কাপড়ে আর আপনার কাছে ও বিছানায় বসবো না।"

"কাপড়ে কি এসে যায়, তুই এখানকার—বোস।"

"আমি যদি এখানকারই তবে আরও আগুতে এলুম না কেন?"

"ওরে, সময় না হলে হয় না—বোস।"

সুবোধ উপবেশন করিলে পর ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "তা, তোরা কি করে এলি?"

সুবোধ তাঁহার ভালবাসা পাইয়াছেন, এখন আর সঙ্কোচ ভাব নাই। কলকাতার ছেলেরা যেরূপ করে, সকল কথার চটপট জবাব দিতে লাগিলেন। বলিলেন—"হেঁটে এলুম। আবার পথ ভুলে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিলুম। একজন লোক পথ দেখিয়ে দিলে, তারপর মন্দিরের চুড়ো দেখে ঠিক এলুম।"

"বলিস কি রে? এতটা পথ হেঁটে এলি। তা, এখানকার খবর পেলি কি করে?"

"আপনার উক্তি পড়ে বড় ভাল লাগলো। আপনার কি চমৎকার কথা!"

শ্রীরামকৃষ্ণ কহিলেন, "আমি কিছুই নয়—মা-ই সব। যাদের হবে মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তা দ্যাখ, এখানে শনি-মঙ্গলবারে আসা ভাল। শনি কি মঙ্গলবার দেখে একদিন আসিস।"

"আর একদিন এলে হয়তো বাড়িতে জানাজানি হবে। আপনার যা বলবার আছে আজই বলে ফেলুন না। তা ছাড়া শনিবার বাবা সকাল-সকাল অফিস থেকে ফেরেন।"

"না রে, মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে, তা করতেই হবে। এই দ্যাখ না, যেখানে অমুক দিন যাব বলি, তা ঝড় হোক, বৃষ্টি হোক, বাদল হোক, যেতেই

হবে। ইচ্ছা না থাকলেও মা সেখানে নিয়ে যাবেনই যাবেন, কিছুতেই নিস্তার নেই। মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে—শনি কি মঙ্গলবার দেখে আসিস।"

সুবোধ কাজেই সম্মত হইলেন। ভাবিলেন, আজ আর বেশিক্ষণ থাকবো না, আজ আর বেশি কিছু কথাও হবে না।

এইরূপ মনে করিয়া দুই বন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট বিদায় লইবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন।

বালকদিগকে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিতে বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব সস্নেহে কহিলেন, "অনেকটা পথ। হেঁটে যেতে কষ্ট হবে। পয়সা দিতে বলে দিচ্ছি—গাড়ি কি নৌকোয় যা।"

সুবোধ বলিলেন, "না, মশায়, সাঁতার জানি নে, নৌকোয় যাব না।"

"তবে গাড়ি করে যা।"

"না, হেঁটেই যাব।"

"না রে, কষ্ট হবে। ছেলেমানুষ, অতটা হাঁটতে পারবি কেন?"

"সে কি, এই বয়সে হাঁটবো না তো হাঁটবো কবে?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব আর জেদ করিলেন না। বলিলেন, "আচ্ছা, তবে আয়। শনি কি মঙ্গলবার দেখে আর একদিন আসিস।"

তখন তাঁহার পদধূলি লইয়া দুই বন্ধু দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুবোধ যখন বাড়ি ফিরিলেন তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রান্ত হইয়াছে। আকাশে মেঘ, টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে। শুষ্ক মুখে, ধুলোকাদামাখা পায়ে সুবোধ পিতামহীর ঘরে প্রবেশ করিলেন। ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা পদশব্দ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?"

"আমি, ঠাকুমা।"

"কে, ঝোড়ি?"

"হ্যাঁ ঠাকুমা, একটু জল খাচ্ছি।"

এই বলিয়া তাকের উপর কুঁজো হইতে জল গড়াইয়া সুবোধ ঢক ঢক করিয়া জল পান করিলেন। পিতামহী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দাঁড়া দাঁড়া, আগে একটু মিষ্টি মুখে দে। ওগো, ঝোড়ি এসেছে, কোথায় তোমরা?"

* * *

সেদিন সকালবেলা হইতে সুবোধের জন্য বাড়িতে নানা দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ। ইতোপূর্বে ছেলেরা কেহই না বলিয়া বাটি হইতে অধিক দূরে যায় নাই। প্রাতে মাতা সুবোধকে না দেখিয়া ব্যাকুল হইয়া হোগলকুঁড়িয়াতে সুবোধের মাতুলালয়ে সন্ধান লইবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। খবর শুনিয়া সুবোধের মাতামহী এ বাড়িতে (ঠনঠনিয়ায়) আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবোধের পিতাও সেদিন বেশ চিন্তিত মনেই বাটির বাহির হইয়াছিলেন।

বাড়ির মহিলাগণ এখন, সুবোধ আসিয়াছে শুনিয়া সেই ঘরে উপস্থিত হইলেন। এক এক জন ব্যগ্রভাবে এক এক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

মাতা কেবল চোখের জল মুছিতে লাগিলেন। সুবোধ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি দক্ষিণেশ্বরে গিছিলুম।"

স্বামী সুবোধানন্দের জীবনের ঘটনাবলী

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

মহাপুরুষদিগের জীবনে বাহ্যিক ঘটনাবলীর বিস্ময়কর সমাবেশ প্রায়শ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহাদের সমগ্র জীবন, অতীন্দ্রিয় বস্তুর সন্ধানে অতিবাহিত। সেইজন্য তাঁহাদের জীবনের ঘটনাবলীও মনোরাজ্যে, লোকচক্ষুর অন্তরালে সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। কেবল যখন তাঁহারা অপর সাধারণের সহিত মিশিবার সময় নিজ অনুভূতি সকলের কিঞ্চিৎ আভাস প্রদান করেন, তখনই সে বিষয় অপরে জানিতে পারে। ঐরূপে নিজ অনুভূতি সম্বন্ধে তাঁহাদের অপরের নিকট কিছু বলিবার অবকাশও বিরল এবং উহার ধারাও এক ভিন্ন রকমের। ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদের সহিত কখনো কখনো এমন জিজ্ঞাসু ব্যক্তিরও বাক্যালাপ হয়, যখন তাঁহারা কি যেন একটি নিয়মের বশে ঐ প্রকার বাক্যালাপ করিয়া থাকেন। কখন কাহাকে কতটুকু কিভাবে বলেন, তাহাও তাঁহাদের (মহাপুরুষদের) পূর্ব-সঙ্কল্পিত রূপে হয় না।

যে লোকোত্তর মহাপুরুষের নাম প্রবন্ধ শীর্ষে উল্লিখিত হইয়াছে, তিনি নিজে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে কখনো কখনো কাহারো কাহারো নিকট যাহা বলিয়াছেন—তাহা কেহ কেহ সেই সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। নিম্নে দুই একটি ঐরূপ ঘটনা (যাহা সাক্ষাৎ মতো শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল) প্রদত্ত হইল।

তাঁহার নিজমুখের উক্তি ঃ

১। একবার ভাদ্রমাসে ফল্গুনদী পার হব—দেখছি নদীতে এক কোমর জল। একজন পার হয়ে এলো। আমিও পার হতে চললুম, পিছনে একজন ছিল সে সাঁতার জানতো। নদীর জল দেখ দেখ করে অনেকটা বেড়ে গেল। যাই কতকটা

গিয়েছি, দেখলুম আমার গলাজল হয়ে গেছে, পরে আমি ডুবে যাচ্ছি দেখেই—ভাবলুম এবার আর তো রক্ষা পাব না—সঙ্গে যে লোকটি ছিল, তাকে বললুম—"আমি সাঁতার জানি না—স্রোতে আমায় কোথায় নিয়ে ফেলে ঠিক নেই—বাঁচবার আশা কম—গুরুভাই সকলকে আমার প্রণাম জানিও।" পরে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে বললুম—"এই নাও ঠাকুর শেষ প্রণাম।" এ কথা বলে যাই ডুবে গেলুম, দেখলুম কে যেন আমার হাত ধরে স্রোতের অগাধ জলের মধ্য দিয়ে ওপরে নিয়ে তুলে দিল। (৮-১-২৫ খ্রিঃ)

২। আর একবার হরিদ্বারে তপস্যায় আছি, দুমাস ধরে জ্বরে ভুগছি—একদিন এমন হয়েছে—জল পিপাসা পেয়েছে, তবু কমণ্ডলুটি ধরে জল খাব সে শক্তি নেই। কি করি কোন রকমে উঠে যাই কমণ্ডলু ধরতে যাচ্ছি, পড়ে গেলুম—অবশ হয়ে পড়লুম। তখন খুব অভিমান হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর। বললুম, "তাই তো, এমন ভুগছি—এমন কেউ নেই যে একটু খোঁজ-খবর করে।" এমনি ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছি—দেখছি—শ্রীশ্রীঠাকুর এসে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন, আর বলছেন—"কি ভাবচিস, দেখচিস তো আমি কাছে কাছে রয়েছি। কি চাস—লোকজন চাস, না টাকা-পয়সা চাস, কি চাস বল।" তখন আমি বললুম—"কিছুই চাই না, শরীর থাকলে রোগ তো হবেই, চাই—যেন তোমায় না ভুলি, যেখানেই থাকি তোমায় যেন স্মরণ থাকে।" পরদিন ওখানকার এক জোয়ান সাধু এসে আমায় বললে—"বলো, কি পথ্য করবে, আমি ভিক্ষে করে এনে দেব।" আমি বললুম, "আমার কিছুই দরকার নেই।" তবু সে শুনবে না। আর একজন সাধুর সেদিন পঞ্চাশ টাকার মনিঅর্ডার এল। সে এসে বললে—"তোমার এখন টাকার দরকার—ভুগচো, এ টাকা তুমিই নাও, তোমার সেবায় লাগুক।" আমি কিছুতেই নিলুম না। (৮-১-২৫ খ্রিঃ)

৩। প্রশ্ন—মহারাজ! ধ্যান জমে কি রূপে?

উত্তর—তাঁর নাম নিয়ে পড়ে থাকলে যদি হয়।

প্রঃ—তবু তো ধ্যান অভ্যাস করতে হবে?

উঃ—প্রথমে বৈকি।

প্রঃ—শ্রীশ্রীঠাকুরকে যে ধ্যান করতে হবে—কেবল রূপটি—না গুণও আছে?

উঃ—একবারে শ্রীশ্রীঠাকুরকে ধ্যান করতে পারবে কেন? সঙ্গে আর কারুকে নিতে হয়—যেমন শ্রীশ্রীমা বা রাখাল মহারাজ যাঁকে দেখেছ—মনে আছে।

একজনকে সঙ্গে করে নিতে হয় কেন জানো না? শোন একটি গল্প বলছি। তোমায় বলিনি? এটি গল্প নয়, সত্য ঘটনা।

রাঁচিতে—এর স্ত্রী, আমার কাছ থেকে ঠাকুরের সম্বন্ধে জেনে (দীক্ষা) নিয়েছে, আমায় খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করতো, খুব ভালবাসতো।

সে রাত্রি দেড়টায় মারা যায়। তাদের পাড়াতেই বাসা—মুখুজ্যে ও তাঁর স্ত্রী সেই রাত্রে সেই সময়ে দেখতে পায় যে আমি কু...কে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। জ্যোৎস্না রাত্তির। মুখুজ্যে দেখে অবাক—তাঁর স্ত্রীকে পর্যন্ত ডেকে দেখালেন—সেও দেখলে আমি কু...এর হাত ধরে টেনে নিয়ে যাচ্ছি। উভয়ে অনেক চিন্তা করতে লাগলো—উনি এ পাড়ায় এলে আসতে যেতে আমাদের বাসায় বসে যান, কিন্তু আজ এত রাত্রিতে এমনভাবে চলে গেলেন, এর মানে কি? মুখুজ্যেরা ভেবে চিন্তে কিছু ঠিক পেলে না। পরে আমাকে এসব বৃত্তান্ত বলে জিজ্ঞাসা করায় আমি বললুম—"কি জানি, এখন কিছু বলতে পারি না, যদি হয় পরে বলবো।"

পরে কাশীতে যাই। সেখানে আমার বড্ড অসুখ হয়। আমাশয়, হাত পায় বেদনা। বেদনার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়ে আছি, তখন কু...এর কথা মনে পড়লো—সে তো আমার একটু অসুখ হলেই ছুটে আসতো, কত সেবা করতো। এই ভাবতে ভাবতে বলে ফেললুম, 'কু...। এখন তুমি কোথায়? এই যে এত ভুগছি, কে দেখে? এই বলে একটু তন্দ্রার মতো এসেছে, দেখছি একটি আট নয় বছরের মেয়ে এসে হাজির। "তুমি কে?" জিজ্ঞাসা করায় বললে—"আমি কু...।" "কেন এসেছ?" জিজ্ঞাসা করায় বললে, "আপনি ডেকেছেন তাই এসেছি।" "কোথায় ছিলে, কি করছিলে," জিজ্ঞাসা করায় বললে—"কেন,

শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা করতে বলেছেন, তাঁরই সেবা করছিলাম এবং তাঁর কাছেই ছিলাম।" আমায় হাওয়া করতে বললুম—কু... হাওয়া করতে লাগলো, (এমনি করে হাত নেড়েচেড়ে)। বেশ হাওয়া লাগতে লাগলো কিন্তু। তখন আমি জিজ্ঞেস করলুম, "তুমি যখন মারা যাও তখন কি হয়েছিল বল দিকিন? কে তোমায় হাত ধরে নিয়ে এসেছিলো?" এ কথার উত্তরে—কু... কোন্ জন্মের কথা জিজ্ঞেস করছি তাই প্রশ্ন করতে লাগলো, আর বলতে লাগলো—"এক যুগেতে একদিনের কথাই মনে থাকে না, এ তো কত জন্ম হয়ে গেছে—কোন্ জন্মের কথা জিজ্ঞেস করছেন?" তখন রাঁচির কথা বিশেষ করে বলাতে সে উত্তর করল—"আমার যে রাত্রিতে মৃত্যু হয়, সে রাত্রিতে যন্ত্রণা এত বেশি হয় যে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলুম না, তবুও আপনাকে ভুলিনি। আপনাকে মনে করছি এমন সময় যেন আপনি এসে হাত ধরে বললেন—"চলে এসো।" আমিও অমনি চলে এলুম। অনেক দূর এসে আপনি খোকা মহারাজ জ্ঞানে আপনার সঙ্গে কথা কইছি, তখন যিনি আমার হাত ধরে এনেছেন, তিনি বললেন—"আমি খোকা মহারাজ নই।" "তবে কে?" পুনরায় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন, "খোকা মহারাজ তোমায় যাঁকে পুজো করতে বলেছেন, আমি সেই।" "তবে আপনাকে খোকা মহারাজের মতো দেখায় কেন?" পুনঃ প্রশ্নের উত্তরে বললেন, "নইলে আমায় চিনতে পারবে কেন? তাই খোকার রূপ ধরে তোমায় টেনে এনেছি।" তখন পুনরায় জিজ্ঞেস করলুম—"যদি তাই হয়ে থাকে তবে কৃপা করে আপনার স্বরূপ একবার দেখান।" তখন শ্রীশ্রীঠাকুর খোকা মহারাজের চেহারা ছেড়ে নিজ মূর্তি ধারণ করলেন। সে রূপে কি জ্যোতি, কি স্নিগ্ধ শান্তিময় সে রূপ—তা কি আর কথায় বলা যায়? এখনও সেই ঠাকুরের কাছেই ছিলুম—আপনি বারবার ডাকছেন, তাই বলে এলুম যে তিনি ডাকছেন, একটু শুনে আসি। তখন কু...কে বললুম, "আচ্ছা বেশ—ফিরে যাও যেখানে ছিলে।" অমনি সে মেয়েটি চলে গেল। (৭-৫-২৫ খ্রিঃ)

■। একদিন দেখি আমি মরে গেছি, দেহ ছেড়ে অনেকটা দূরে বসে আছি। দেহটা পড়ে রয়েছে। তবে—বসে বসে অপেক্ষা করছি, আর কারা কারা

আসবে তাদের জন্য। এদিকে বেশ জানছি ওখানে (অনতিদূরে) শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা আছেন। আমি বেশ জানছি যে যাই ওঁদের কাছে যাব অমনি ওঁদের সঙ্গে মিশে যাব—এক হয়ে যাব। তাই যারা যারা আমার দিকে চেয়ে রয়েছে, তাদের জন্য বসে আছি। পরে দেখি, একে একে সব আসছে। আরও কত লোক যাচ্ছে। সবাইকে বলে দিচ্ছি—"ওখানে শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা রয়েছেন—যাও প্রণাম করগে।" সবাই যাচ্ছে। সর্বশেষে দেখলুম অ—আসছে। (চৌধুরীদের মেয়ে)। সবাই এসেছে কেবল অ—র জন্য অপেক্ষা করছিলুম। অ—কে জিজ্ঞাসা করলুম—"তোর জন্য বসে আছি, তুই এত দেরি করলি কেন? সঙ্গে একদল জুটিয়ে নিয়ে এসেছিস, এরা কে?" অ—বললে, "এই আমার শ্বশুর, শাশুড়ি...ইত্যাদি পরিবারস্থ অনেক লোক। আমিও অনেকক্ষণ বসে আছি এদের জন্য, এরা আসতে এত দেরি করছে।" বললাম, "তা এসেছ এসেছ, যা ঐ ঘরে শ্রীশ্রীমা আছেন, আর ঠাকুর আছেন—যা প্রণাম করগে।" অ—বললে, "আপনিও চলুন।" বললাম, "না, এখন যাব না, আমি গেলে আর আমায় দেখতে পাবিনে। তোরা যা।"

অ—"কেন? না, আপনিও চলুন।"

আমি—"আমি গেলে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে মিশে যাব।"

তবু অ—পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তখন আমি গেলুম। যাই শ্রীশ্রীঠাকুরের দুই পায়ে পড়ে প্রণাম করেছি—তখনই তাঁর সঙ্গে মিলে গেলুম। তখন অ—রা এসে প্রণাম করে আমাকে খোঁজ করছে। আমি তখনো শুনতে পেলুম শ্রীশ্রীঠাকুর বলছেন, "তাকে তো এখন আর দেখতে পাবে না।"

"কেন?"

"খোকা, আমাতে মিশে গেছে।" (ইং ৭-৫-২৫)

এসব শুনে ও চিন্তা করে সকলেই বুঝতে পারেন পূজনীয় খোকামহারাজ কে ছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত তাঁহার কি সম্বন্ধ ছিল।

(উদ্বোধন : ৩৫ বর্ষ ১ সংখ্যা)

স্বামী সুবোধানন্দ

স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ

মঠে যোগদানের পর প্রায় আড়াই বৎসরকাল আমাদের মঠ-বাসের সৌভাগ্য হইয়াছিল। সে সময়ে আমরা পূজনীয় খোকা মহারাজের নিকটেই থাকিতাম। তখন মঠের অফিস ও লাইব্রেরি স্বামীজীর ঘরের পশ্চিমে বড় ঘরে ছিল। আমাদের তখন ঐ অফিসের ও লাইব্রেরির কিছু কিছু কাজ করিতে হইত বলিয়া আমরা অধিকাংশ সময়ই উপরে পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরের নিকটেই থাকিতাম। রাত্রেও নিচে শুইবার স্থানাভাবে খোকা মহারাজের ঘর ও স্বামীজীর ঘরের মাঝের ছোট বারান্দাতেই আমাদের শুইতে হইত। কিন্তু তাঁহার এত নিকটে থাকিয়াও সে সময়ে আমরা তাঁহার কোন বিশেষত্ব বা মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই। তিনি বাস্তবিকই খোকার মতনই ছিলেন। তিনি আমাদের সঙ্গেই পঙ্গতে বসিয়া খাইতেন ও সকল বিষয়ে আমাদের মতনই ব্যবহার করিতেন। ছোট একটি জামা ও ছোট একটি কাপড় পরিতেন ও নিজেই উহা পরিষ্কার করিতেন। তখন তাঁহার কোনও সেবক ছিল না। আমাদের ডাকিয়া মাঝে মাঝে তাঁহার চিঠি লেখাইতেন। কিন্তু পাশের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন ও অনুচ্চ স্বরেই আমাদিগকে তাঁহার চিঠির মর্ম বলিয়া যাইতেন। এমন সময় যদি পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের একটু ডাকিতেন তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার চিঠি লেখা বন্ধ করিয়া তাঁহার নিকটে যাইতে বলিতেন। তিনি তামাক খাইতেন কিন্তু কখনও তাঁহাকে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সম্মুখে তামাক খাইতে দেখি নাই। পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের সহিত আচরণেও তাঁহাকে খোকার মতন ব্যবহার করিতে দেখিয়াছি। একদিন ঢাকা হইতে কয়েকটি ভক্ত

পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে সেখানে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে আসায় তিনি তাঁহার শরীর অসুস্থ বলিয়া সেখানে যাইতে অস্বীকার করেন ও পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরে আসিয়া বলেন যে, "খোকা, এই সকল ভক্তরা ঢাকা হতে সেখানে আমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। তা আমার তো শরীর খারাপ তুই একবার সেখানে যা না।" তাহাতে খোকা মহারাজ তাঁহার চোখ দুটি বড় বড় করিয়া বলিলেন, "না না, আমি সেখানে যেতে পারব না। সেদিকে যেতে যে বড় বড় নদী পড়ে তা দেখলে আমার ভয় করে।" পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজও খোকা মহারাজের খোকাত্ব বুঝিয়া আর এই বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য করিলেন না।

কিন্তু ইহার দু-তিন বৎসর পরে তাঁহাকে অবশ্য ঢাকায় যাইতে হইয়াছিল। ঢাকা বালিয়াটি গ্রামে তদানীন্তন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের পট প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে ও সেখানকার জমিদার যামিনী রায়ের বাড়িতেও একটু পদার্পণ করিতে হইবে বলিয়া তিনি সেখানে যাইতে অগত্যা রাজি হইয়াছিলেন ও চার-পাঁচটি সাধু লইয়া সেই সময় ঢাকা রামকৃষ্ণ আশ্রমে গিয়াছিলেন। তখন আমরা ঢাকা আশ্রমের কর্মী। সেই সময় আমরা তাঁহার যথার্থ মাহাত্ম্য কিছু কিছু বুঝিতে পারিয়া নিজেরা ধন্য হইয়া গিয়াছিলাম।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি আমাদের কয়েকজন সাধু ও ভক্তকে লইয়া বালিয়াটি গ্রামে ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করার জন্য রওনা হন। যামিনীবাবুই আমাদের সকলের যাওয়ার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ঠিক হইল মাণিকগঞ্জ পর্যন্ত স্টিমারে যাইব; মধ্য পথে তাঁহার আড়তে, যেখানে তাঁহার ব্যবসায়ের আদান-প্রদান হইত, সেইখানে আমাদের বিশ্রাম ও রাত্রিবাসের ব্যবস্থা হয়। আমরা সেই সময় দলে আট-দশজন ছিলাম। আড়ত বাড়িটি ছোট। সুতরাং আমাদের সকলের একত্রে রাত্রিবাসের জন্য বড় সতরঞ্জি বিছাইয়া দেওয়া হইল। উহাতে আমরা যে যাহার ছোট ছোট বিছানা লইয়া শুইয়া পড়িলাম। আমার বিছানাটিও পূজনীয় মহারাজের পাশেই করা হইল, কেননা আমিই সে দলের সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম ও বয়োজ্যেষ্ঠগণ তাঁহার পাশে শুইতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ

করিতেছিলেন। সেইজন্যই এরূপ ব্যবস্থা হইল। সেদিন রাত্রি ঠিক চারটে বাজিলে দেখি পূজনীয় খোকা মহারাজ তাঁহার শয্যায় বসিয়াই গভীর ধ্যানে মগ্ন। আমিও তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহার পাশে ধ্যান করিতে বসিলাম। সজ্জনের ক্ষণেক সঙ্গ পাইলেও আমাদের জীবন অনায়াসেই ভবসাগর উত্তীর্ণ হইতে পারে।

বালিয়াটিতে আমরা কয়েকদিন ছিলাম। এটি একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও অনেক জমিদারের বাস। তাঁহারা পরস্পর সর্বদাই কলহে ব্যস্ত থাকিতেন কিন্তু পূজনীয় মহারাজের আগমনে তাঁহাদের কলহ মিটিয়া গেল। আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা হইল ও উহার তদানীন্তন পরিচালক রাধিকামোহন অধিকারী কিছুদিন পরে মঠে আসিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন ও স্বামী সুন্দরানন্দ নামে আখ্যাত হইয়া দীর্ঘকাল উদ্বোধনে সম্পাদকের কার্যনির্বাহ করিয়াছিলেন।

ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াও খোকা মহারাজ আমাদের সহিত ছিলেন ও নিত্যই আমাদিগকে তাঁহার পূর্বজীবনের তপস্যা ও তীর্থভ্রমণাদির কাহিনী শুনাইয়া ও নানাবিধ উপদেশাদি দিয়া আমাদিগের সাধুজীবন পুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেন। এইসময় তিনি আমাদের গিরিশবাবু সম্বন্ধে নানাবিধ কথা বলেন। তিনি বলিতেন, গিরিশবাবুই ছিলেন যথার্থ বিশ্বাসী ও শ্রীশ্রীঠাকুরকে তিনিই ঠিক ঠিক চিনিয়াছিলেন। গিরিশ বলিতেন, "ওরে চৈতন্যদেব আর কি করেছেন। তিনি বড়জোর জগাই মাধাই নামক দুটি পাষণ্ডকে উদ্ধার করেছিলেন। কিন্তু জগাই মাধাই তো আমাদের জীবনের একাংশের একটি ছবি মাত্র। আমি যেখানে বসতাম মনে হতো সেখানের সাত হাত মাটি পর্যন্ত অপবিত্র হয়ে গেছে। কিন্তু আমার ন্যায় এরূপ পাষণ্ডকেও কি উচ্চাবস্থাতেই উঠিয়ে দিলেন। তাঁকে অবতার বলব না তো কাকে বলব।"

একদিন ধ্যান-জপ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, "দেখ ধ্যান-জপ না করলে যত উচ্চ পুরুষের নিকট হতেই দীক্ষাদি লও না কেন তা কখনও পরিস্ফুট হয় না।" এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "দেখ বৃন্দাবনের কুসুম সরোবরে আমি পূজনীয় মহারাজের সাথে তপস্যা করেছিলাম। কিন্তু আমার তো শৈশব হতেই

চা খাওয়া একটি রোগ, তোমরা জান। তাই সকাল হলেই একটি নারকেলের মালা হাতে করে গোস্বামীজীর (বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী) আশ্রমে উপস্থিত হতাম ও সেখানে চা পান করে কিছুক্ষণ পরে কুসুম সরোবরে ফিরে আসতাম। ঐ স্থান হতে ঐরূপ অনুপস্থিতি শ্রীশ্রীমহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন ও একদিন আমাকে ডেকে বললেন, 'খোকা তুই না এখানে তপস্যা করতে এসেছিস! তবে এরূপ ছটফট করে কেন এখান হতে বের হয়ে পড়িস?' তদুত্তরে আমি বলেছিলাম, 'মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুর তো আমাদের সকলই দিয়ে গেছেন তবে আবার তপস্যার প্রয়োজন কি?' তার উত্তরে মহারাজ একটু গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'সে সত্যই খোকা, তিনি সবই দিয়ে গেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে জপ-ধ্যানাদির দ্বারা ইহা উপলব্ধি কর।' তাই তোমাদেরও বলি যে তোমরা যার কাছ থেকে যেরূপ দীক্ষাই পেয়ে থাক না কেন উহা জপ-ধ্যানের দ্বারা উদ্বুদ্ধ কর, শুধু বসে থাকলে চলবে না।" ইহার উত্তরে আমরা কখনো কখনো বলিতাম, "মহারাজ, সারাদিন মঠমিশনের কাজ করে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ি। তাই সকাল সকাল উঠে ঠিক ঠিক জপ-ধ্যান আমরা করতে পারি না। আবার মিশনের কাজে আমাদের বের হতে হয়।" তদুত্তরে তিনি বলতেন, "রাত্রে কম করে খেও ও শোবার সময় মন হতে সকল কাজের চিন্তা দূর করে দিও, তাহলেই দেখবে শান্তিতে ঘুমাবে ও সকালে উঠে আর কোনও ক্লান্তি বোধ করবে না।"

তিনি দিনে ও রাত্রে অতি অল্পই খাইতেন। যদি কোনও ভক্ত তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতেন তাহা হইলে তিনি তাঁহাকে প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিতেন, "কি খাওয়াবে?" ভক্তটি হয়তো তাঁর বিনয়বশত বলিতেন, "কি আর খাওয়াব। শুধু চারটি ডাল আর ভাত।" তিনি যথাসময়ে সেখানে গিয়া আহারে বসিতেন ও তাঁহার থালায় নানাবিধ পঞ্চব্যঞ্জনাদি থাকিলেও তিনি তাহাদের কিছু স্পর্শ করিতেন না শুধু ডাল ভাত খাইয়াই চলিয়া আসিতেন। ভক্তটি অনেক অনুনয় বিনয় করিলেও তাঁহার ইহাতে অন্যথা হইত না। তিনি বলিতেন, "কথার সত্যতা রাখতে হয়, শ্রীশ্রীঠাকুর আমাদের এই শিক্ষা দিয়েছেন।"

ইহা ১৯২৫ সালের ঘটনা। ইহার পরবৎসর তিনি আবার কয়েকজন সাধু লইয়া ঢাকা মঠে আসিলেন ও ইহার কিছুদিন পরে সোনার-গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য আমাদের কয়েকজন ও পূর্বোক্ত সাধুগণকে লইয়া সেখানে রওনা হইলেন। পুণ্য অক্ষয়তৃতীয়া দিবসে সেখানকার মন্দিরে তাঁহারই শুভহস্তে শ্রীঠাকুর প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বৈকালে সেখানে একটি জনসভা হয় ও পূজনীয় মহারাজ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় যতদূর মনে পড়ে বক্তাগণ শ্রীশ্রীঠাকুরের মূর্তি যে সর্বধর্মের প্রতীক ইহা প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করেন। সকলেই উহা শুনিয়া মুগ্ধ হন ও হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অতঃপর প্রসাদ গ্রহণ করেন।

ইহার পর পাঁচ ছয় বৎসর আমাদের সহিত তাঁহার আর দেখা হয় নাই। আমরা মঠ-মিশনের কার্যে নানা স্থানে ব্যাপৃত ছিলাম ও পূজনীয় খোকা মহারাজের শরীর সোনার-গাঁ হইতে আসিয়া অতিরিক্ত পরিশ্রমের জন্য ভাঙিয়া পড়ায় তাঁহাকেও স্বাস্থ্যের উন্নতিকল্পে কাশী, ভুবনেশ্বর প্রভৃতি নানা স্থানে যাইতে হয়। পরে তাঁহার সহিত আমাদের শেষ দেখা হয় খুব সম্ভব ১৯৩২ সালের মাঝামাঝি সময়। তখন তাঁহার শরীরে ক্ষয় রোগ প্রবেশ করিয়াছে, দুইজন সেবক সর্বদাই তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রহিয়াছেন। তখন তিনি মঠের বর্তমান (১৯৭৭) অফিস ঘরের উপরতলায় থাকিতেন। তাঁহার সেবকগণ ও মঠের অন্যান্য সাধুরা তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতেন। দেখিতাম তখনও, ঐ রোগ-যন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার সর্বদা হাসিমুখ। আমরা দূর হইতে আসিয়াছি বলিয়া খুঁটিনাটি করিয়া আমাদের সকল খবর লইলেন। তাঁহার শারীরিক খবর জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুর যে রকম রেখেছেন সে রকমই আছি।"

ইহার কিছুদিন পরেই তাঁহার শরীর যায়।

(পুণ্যস্মৃতি ঃ উদ্বোধন কার্যালয়)

শ্রীশ্রীখোকা মহারাজ

ব্রহ্মচারী বীরেশ্বরচৈতন্য

ভগবান রামকৃষ্ণ যখন তাঁহার সাধনলীলা সমাপ্ত করিয়া, যুগধর্ম সংস্থাপন ও প্রচারের জন্য, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন এবং তাঁহার সেই দৈব আকর্ষণের আবেগে যখন একে একে শ্রীবিবেকানন্দাদি পার্ষদগণ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আসিয়া তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইতেছিলেন, শ্রীশ্রীখোকা মহারাজও তখন ঐরূপে একদিন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে তাঁহার ভিতর অনন্যসাধারণ আধ্যাত্মিকতা লাভের সামর্থ্য আবিষ্কার করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। তিনি তখন বিদ্যালয়ের বালক মাত্র।

খোকা মহারাজ ধনীর গৃহে জন্মিয়াছিলেন—কিন্তু সংসার তাঁহার নিকট কারাগার বলিয়া মনে হইত—সন্ন্যাসজীবনের মুক্ত-সুখের স্বপ্ন বালককে প্রায়ই মোহিত করিয়া তুলিত। এই স্বপ্ন ধীরে ধীরে বাস্তবতার স্পর্শ পাইতে আরম্ভ করিল—দক্ষিণেশ্বরের যে পুরুষপ্রবরের আকর্ষণে তিনি আবিষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট ঘন ঘন যাতায়াতের ফলে। ঠাকুর যখন তাঁহার যুবক ভক্তগণকে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেন, তখন বালক সুবোধও ঠিক করিতেন যে তাঁহার স্থান প্রাচীর বেষ্টিত গৃহ-কারাগারে নয়—উন্মুক্ত আকাশতলে—পথিপার্শ্বস্থ বটবৃক্ষের নিম্নে—ভীতিপ্রদ শ্মশান আবাসে। পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর, স্বামীজী প্রভৃতির সহিত, সন্ন্যাসিবেশে খোকাও বরাহনগর মঠে আসিয়া মিলিত হইলেন। বালককালের স্বপ্ন বাস্তব হইল।

শ্রীশ্রীঠাকুর এক এক জন ভক্তকে এক এক প্রধানভাবে ভাবিত করিয়াছিলেন। কেহ ছিলেন তপস্বী, কেহ বা বিচারশীল—কেহ আবার প্রেমিক

ভক্ত। পূজনীয় খোকা মহারাজের জীবনে স্বামীজী, (ব্রহ্মানন্দ) মহারাজ বা হরি মহারাজ প্রভৃতির ন্যায় প্রবল তপস্যার ভাব লক্ষিত হয় নাই। তাঁহার পথ ছিল বিশ্বাস-ভক্তি। ভক্তের কিছু পাইবার বা চাহিবার নাই—সে তাহার প্রিয়কে ভালবাসিয়াই তৃপ্ত। মুক্তির সাধনা তাহার নিকট অর্থহীন। আমাদের খোকা মহারাজও ছিলেন এই প্রকারের সাধক। গতিমুক্তির ভার ঠাকুরকে দিয়া তিনি নিঃশঙ্ক ও নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহাকে একবার ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন, তাহাতে খোকা মহারাজ বলেন, "ধ্যান-ট্যান করতে পারব না। ওসব যদি করতে হবে তো অপরের কাছে গেলেই তো চলত—আপনার কাছে আসবার কি দরকার ছিল?" ঠাকুর তাঁহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন—"আচ্ছা যা, ও সব তোকে কিছুই করতে হবে না, তুই দুবেলা একটু স্মরণ-মনন করে নিস।" এই স্মরণ-মননের অনুষ্ঠানটুকু তিনি কি অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত আজীবন সম্পন্ন করিয়াছিলেন, তাহা দেখিবার বিষয়। তিনি জানিতেন যে সাধন-ভজন হইতে নিষ্কৃতি দিলেও, ঠাকুর তাঁহাকে প্রেমের দায় হইতে নিষ্কৃতি দেন নাই—নিশিদিন তিনি তাঁহার অন্তর জুড়িয়া বসিয়া আছেন—একবার বা দুইবার প্রণাম করা তাঁহার নিকট নিরর্থক—তবুও শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের বাণী পাছে মিথ্যা হয় তাই দেখা যাইত যে জরাজীর্ণ উত্থানশক্তি রহিত দেহে যখন পার্শ্ব ফিরিবারও সামর্থ্য নাই, তখনও রাত্রে নিদ্রা যাইবার পূর্বে তিনি অতি কষ্টে ঘাড় ফিরাইয়া শিয়রস্থিত শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোর দিকে চাহিবার চেষ্টা করিতেছেন এবং করজোড়ে নমস্কার করিতেছেন।

তাঁহার বিশ্বাস ও ভক্তি বাস্তবিকই অদ্ভুত ছিল। ভগবান ভক্তি বিশ্বাসের বশ। তাই তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণাবতারে ভক্ত নন্দ যশোমতীর 'বাধা' (খড়ম) মাথায় বহিতে হইয়াছিল—গোপীদিগের অহৈতুকী ভালবাসায় বশীভূত হইয়া তাহাদের সহিত কত খেলা খেলিতে হইয়াছিল। এই অবতারেও খোকা মহারাজের বিশ্বাস ও প্রেম, ঠাকুরকে স্থূল শরীরের অপ্রকট হইবার পরও, বহুবার তাঁহার সম্মুখে তাঁহা আবির্ভূত করাইয়া তাঁহার জাগ্রৎঅস্তিত্ব ও অসীম ভক্ত-বাৎসল্যের নিদর্শন দিয়াছে। একাধিকবার কোনও সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পীড়িত হইয়া তিনি

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়াছেন—ঠাকুর আসিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "বল, তোর কি চাই? সেবার জন্য লোক বা টাকাকড়ি যা চাই বল—আমি সব ব্যবস্থা করিতেছি"—প্রেমিক ভক্ত উত্তর দিয়াছেন—"কিছুই চান না—শুধু এই চাই, আপনাকে যেন ভুলে না যাই।" দেহ মন প্রাণ সকলই ঠাকুরকে সমর্পণ করিয়া খোকা মহারাজ বাসনা হইতে সম্পূর্ণ নির্মুক্ত হইয়াছিলেন। আর এইজন্যই দুঃখ-দ্বন্দ্ব তাঁহার নিকট আসিয়া প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া যাইত। আনন্দময় পুরুষের মুখে প্রসন্ন হাস্য সর্বদাই লাগিয়া থাকিত—নির্মম রোগযন্ত্রণার মধ্যেও তাহা একটুও তিরোহিত হয় নাই। এই অপ্রাকৃতিক ভক্তি বিশ্বাস তাঁহাকে জীবিত অবস্থাতেই মরণজয়ী করিয়াছিল। শেষশয্যায় তাঁহার মুখে প্রায়ই শুনা যাইত, "শরীরটা যাবে তাতে আর হয়েছে কি? ড্যাং ড্যাং করে ঠাকুরের কাছে চলে যাব।" বাস্তবিক তিনি ড্যাং ড্যাং করিয়াই চলিয়া গেলেন। মহাসমাধির সময় যাঁহারা তাঁহার নিকটে ছিলেন তাঁহারা জানেন কি ধীর শান্ত ভাবে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

ধর্মানুভূতির এক প্রধান পরিচায়ক হইতেছে অভিমানশূন্যতা। পূজনীয় খোকা মহারাজ কিরূপ নিরভিমান ছিলেন, তাহা যাঁহারাই তাঁহার সহিত মিশিবার সুযোগ পাইয়াছেন, তাঁহারাই শতমুখে স্বীকার করিবেন। তিনি শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গ ভক্ত ছিলেন, এই হিসাবে তাঁহার স্থান শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে অতি উচ্চে হইলেও তাঁহার নিজের মনে বোধ হয় স্বপ্নেও কোন দিন কোন সম্মানের দাবি উঠে নাই। তাঁহার সেবার্থে সতত প্রস্তুত শিষ্যতুল্য শত শত সাধু ব্রহ্মচারী বর্তমান থাকিতেও তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও নিজের সকল কাজ নিজের হাতেই সম্পাদন করিয়া লইয়াছেন—সকলের সহিত সমানভাবে পঙক্তিতে বসিয়া আহার করিয়াছেন—ছেলে ছোকরাদের সহিত মিশিয়া মঠের মাঠের চোরকাঁটা তুলিয়াছেন—উৎসবের তরকারি কাটিয়াছেন। কেহ সসম্মানে প্রণাম করিতে আসিলে তিনি যেমন নির্বিকার থাকিতেন—কেহ অবজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেও তাঁহাকে তেমনিই শান্ত, অচঞ্চল দেখা যাইত। সর্বদা সকলকে মান দিতে প্রস্তুত ছিলেন—নিজে কখনো মানের দাবি করেন নাই।

মঠ তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ছিল। মঠ ছাড়িয়া সহজে কোথাও যাইতে চাহিতেন না। একবার শরীর খুব দুর্বল হইলে কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইবার কথা হয়—তাহাতে বলিয়াছিলেন, "শাকভাত খেয়ে মঠে পড়ে থাকতে পারলে আর কিছুই চাই না।"

মঠের বাগান, গাছপালা প্রত্যহ দুবেলা ঘুরিয়া ঘুরিয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। শ্রীশ্রীস্বামীজী মহারাজের সমাধিমন্দির ও বেলতলা তাঁহার বিশেষ প্রিয়ক্ষেত্র ছিল। অত্যন্ত দুর্বল শরীরেও লাঠি লইয়া একবার ঐদিকে ঘুরিয়া গিয়া হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "একবার স্বামীজীর ওখানটায় বেড়িয়ে এলুম।" স্বামীজীর উপর তাঁহার অপরিসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। বলিতেন, "ঠাকুর বলেছেন স্বামীজী হচ্চেন সাক্ষাৎ শিব। ওঁকে শ্রদ্ধা করলে শিবের পুজো করা হয়।" মঠে শ্রীমৎ স্বামীজীর ঘরের সম্মুখের ছোট ঘরটিতে থাকিবার কালে খোকা মহারাজ সকালে উঠিয়া প্রত্যহ স্বামীজীর ঘরে প্রণামাদি করিয়া আসিতেন এবং ঐ ঘরের সেবককে বিশেষ সতর্কতার সহিত সেখানকার কাজকর্ম করিতে বলিতেন। তিনি যেমন শ্রীশ্রীঠাকুরের আদরের খোকাটি ছিলেন—শ্রীমৎ স্বামীজীও তেমনি তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহদৃষ্টিতে দেখিতেন। স্বামীজী কোনও কারণে গম্ভীর হইলে অপরাপর গুরুভ্রাতারা কেহ তাঁহার সম্মুখে যাইতে সাহস করিতেন না—তখন খোকার উপর তাঁহার সেই গাম্ভীর্য ভাঙাইবার ভার পড়িত। খোকা মহারাজ বালকের ন্যায় ফষ্টিনষ্টি করিয়া স্বামীজীকে হাসাইয়া দিতেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার প্রথম অবস্থায় স্বামীজী খোকা মহারাজকেই মঠের কাজকর্ম তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

অন্যান্য গুরু ভ্রাতাদিগের উপরও তাঁহার অত্যন্ত ভালবাসা ছিল। শ্রীশ্রীমহারাজের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে তিনি অনেকদিন একত্রে ছিলেন। মহারাজ খুব কঠোর তপস্যা করিতেন। খোকা মহারাজ একদিন তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "ঠাকুরকে দেখেছ—আবার এত তপস্যা করার কি দরকার?" মহারাজ তাঁহার নিজের ভাবে উত্তর দিয়াছিলেন। খোকা মহারাজের ভাব পূর্বেই উক্ত হইয়াছে। শেষ অসুখের পূর্বে শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের ঘরে প্রত্যহ সকালে প্রণাম হয়

বলিয়া তিনি তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করিয়া আসিতেন। মহাপুরুষজীও "এস খোকা মহারাজ" বলিয়া কুশল প্রশ্নাদি করিতেন। এই দুই বৃদ্ধ গুরুভ্রাতার সপ্রেম সম্ভাষণ বাস্তবিকই উপভোগ করিবার বিষয় ছিল। শরীরে কালব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইলে যখন তাঁহাকে লাইব্রেরি বাড়িতে লইয়া যাওয়া হইল এবং চিকিৎসকগণ নড়াচড়া একেবারে নিষেধ করিলেন, তখনও তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সহিত দেখা করিবার জন্য মাঝে মাঝে খুব আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। একবার মাঝে মহাপুরুষজীর শরীরের অবস্থা খুব সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠে। খোকা মহারাজ শুনিতে পাইয়া বলেন "আমি দেখতে যাবই—শেষে কি তোমরা তাঁর শব দেখাবে?" এবং সকলের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া তিনি মহাপুরুষ মহারাজের সহিত দেখা করিতে যান। সেদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। উহাই তাঁহার শেষ নিচে নামা।

তিনি বরাবরই খুব চাপা ছিলেন; ভিতরের ভাব সহজে প্রকাশ করিতেন না। ধর্মপ্রসঙ্গ তাঁহার নিকট খুব কমই শুনা যাইত—কিন্তু বাজে প্রসঙ্গও কেহ কখনো তাঁহার কাছ হইতে শুনে নাই। নির্বৈর শান্ত পুরুষ আপন ভাবে থাকিতেন—কখনো কখনো নিজের মনে কোনও বই পড়িতেন। পুরাণ তাঁহার অতি প্রিয় গ্রন্থ ছিল। মঠের দ্বিতলের গঙ্গার দিকের বারান্দায় একখানি ইজি চেয়ারে কোনও না কোন পুরাণ হস্তে প্রায়ই তাঁহাকে বসিয়া থাকিতে দেখা যাইত। বলিতেন, "একটা কিছু নিয়ে থাকতে তো হবে—বেশ সৎ কথা নিয়ে থাকা যায়।" সাধু ব্রহ্মচারীরা কেহ অনর্থক গল্পে সময় নষ্ট করিলে বিশেষ ব্যথিত হইতেন। কাহাকেও হুকুম করা বা যাচিয়া উপদেশ দেওয়া তাঁহার স্বভাব ছিল না—কেহ জিজ্ঞাসু হইয়া কাছে বসিলে মিষ্ট আলাপে শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজী বা নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার কথা বলিতেন। তাঁহার কথার ভিতর কোনও আড়ম্বর ছিল না—কিন্তু তাহাতে একটা অপূর্ব বিশ্বাসের জোর ছিল, এজন্য সহজেই তাহা হৃদয়গ্রাহী হইত। নিজে অনেক সময় হাসিতে হাসিতে বলিতেন, "বিদ্যে কোথায়? মুখ্যু মানুষ।"

অসুখ যখন খুব বাড়িয়া উঠিল, তখন আর নিজে পড়িতেন না—

সেবকদিগের নিকট কথামৃত বা ভাগবত শ্রবণ করিতেন। শেষ শয্যায় তাঁহাকে কিছুদিন উপনিষদ্ শুনাইবার সৌভাগ্য দীন লেখকের হইয়াছিল। উপনিষদের ভাবে ভাবিত হইয়া মহারাজ খুব উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন এবং স্বেচ্ছায় নানাপ্রকার তত্ত্বকথা কহিতেন। বলিতেন, "দেখ, ঘর-বাড়ি, লোকজন সব যেন [illegible] চারিপাশে সাজানো রয়েছে দেখছি। কোন কিছুরই উপর টান বোধ করছি না।"

"কার অপেক্ষা করব? কার মুখের দিকে চাইব? দুটো মিষ্টি কথা বললে কাছে আসবে—আর তা যদি না বললে তবে ফিরেও চাইবে না। এই তো মানুষের মন! একমাত্র ভগবানের দিকে চেয়ে আছি।"

রোগ যন্ত্রণার কথায় বলিতেন, "যখন তাঁর চিন্তা করি তখন কোনও কিছু মনে থাকে না।" শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার বিশ্বাস ও তিতিক্ষাকে ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় যাচাই করিয়া লইলেন। তিল তিল করিয়া তাঁহার দেহ জীর্ণ হইতে লাগিল—শরীরের সকল শক্তি অন্তর্হিত হইতে আরম্ভ করিল—উঠা তো দূরের কথা একটু নড়িবারও সামর্থ্য রহিল না—কিন্তু তখনও সেই কঙ্কালের ভিতর যে মনটি বাস করিতেছিল তাহা তাঁহার বিশ্বাস ও প্রেমে পরিপূর্ণ! নিঃশঙ্ক, নিশ্চিন্ত, শান্তভাবে সে তাহার প্রিয়ের সহিত চরম শুভসম্মিলনের প্রতীক্ষা করিতেছে—ভয় নাই—উদ্বেগ নাই, বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য নাই!!

"ঠাকুরকে বলছি—আর কেন, এইবার গেলেই তো হয়—তা ঠাকুর বলছেন থাক থাক আরও কিছুদিন থাক। তাই হোক। তাঁর ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।"

অবশেষে একদিন সেই শুভ সম্মিলনের কাল উপস্থিত হইল। দেহ রক্ষার পূর্ব রাত্রে গভীর নিশীথে সেবক জিজ্ঞাসা করিল "মহারাজ, মঠের ভিতর কাউকে দেখলে যদি আপনার যন্ত্রণার একটু উপশম হয় তো বলুন—তাকে ডেকে আনি।" মহারাজ তখন অসঙ্গ শস্ত্র দ্বারা সংসার বৃক্ষের সকল মূল ছেদন করিয়াছেন। বলিলেন, "না, কাউকেও না। আমার এই অন্তিমকালে প্রার্থনা করি ঠাকুর আমাদের সঙ্ঘের সকলের কল্যাণ করুন—সকলকে সদ্‌বুদ্ধি দিন।"

সে রাত্রি প্রভাত হইল। মাঝে মাঝে দুটি একটি কথা কহিতেছেন। বেলা বাড়িবার সঙ্গে অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল—অবশেষে সমবেত সাধু ব্রহ্মচারিগণের "জয় রামকৃষ্ণ" ধ্বনির মধ্যে বিকাল ৩টা ৫ মিনিটের সময় মহাপুরুষ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামীর সমাধিস্থানের পার্শ্বে তাঁহার চিতার অগ্নি নির্বাপিত হইল। গম্ভীর কণ্ঠে সমস্বরে বেদমন্ত্র পঠিত হইল—

"পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥"
ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

(উদ্বোধন ঃ ৩৫ বর্ষ ২ সংখ্যা)

খোকা মহারাজ

জনৈক ভক্ত

একদিন 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ' পড়িয়া আমার বড়ই ইচ্ছা হইল যে শিষ্য যেমন স্বামীজীর পদ পূজা করিয়াছিলেন আমিও ঐরূপ করিব। পথে কিছু ফুল ও মিষ্টি কিনিয়া বেলুড় মঠে গিয়া হাজির হইলাম। দেখিলাম, খোকা মহারাজ সদ্যস্নাত হইয়া গৈরিক বস্ত্রে শোভা পাইতেছেন। প্রণাম করিয়া আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিনি শয্যোপরি উপবিষ্ট হইলেন, পদ-যুগল মেঝের উপর রহিল। আমি পুষ্প ও মাল্যদ্বারা তাহা শোভিত করিতে লাগিলাম। তৎপরে ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সন্দেশ প্রদান করিলাম। তিনি গ্রহণ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি প্রসাদ পাইলাম।

পূজনীয় খোকা মহারাজের নিকট হইতে ধ্যান ভজন সম্বন্ধে বেশি উপদেশ আমি পাই নাই। এ সম্বন্ধে কথা উঠিলে প্রায়ই তিনি বলিতেন, "খুব সকালে উঠে জপ করবি।" অধ্যয়নে উৎসাহ এবং ব্রহ্মচর্যের উপর খুব জোর দিতেন। একদিন ইষ্টকে ধ্যান করিবার পূর্বে তাঁহাকে কিছুক্ষণ ধ্যান করিতে বলিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে বলিতেন, "চিন্তাই ধ্যান।" একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া তিনি আমাদের কলকাতার হোস্টেলে আসিয়াছিলেন। সেদিনও ধ্যানে তন্ময় হইতে পারি না বলায় তিনি আমার বুকে হাত দিয়া চক্ষু বুজিয়া "জয় শ্রীগুরু" ৩।৪ বার জোরে উচ্চারণ করিয়া মনে মনে কি বলিয়াছিলেন। আমি খুব আশা ভাবিয়াছিলাম, আমার হয়ত কোনরূপ একটা অনুভূতি তখন তখনই হইয়া যাইবে। কিন্তু ইহা এমনভাবে পাইবার জিনিস নহে। ভগবান ন্যায়বিচারক, যাহার যে জিনিস প্রাপ্য নহে তাহাকে তাহা দিবেন কেন? তিনি আমাকে স্নেহ, আদর, আলিঙ্গন যখন যা দিয়া পারিয়াছেন ভগবানের দিকে টানিবার চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণবের তিনের দয়া সত্ত্বেও একের অর্থাৎ মনের দয়া বিনে আমি পড়িয়া রহিলাম।

তাঁহার উপদেশ ছিল শিশুর মতো সরল, মর্মস্পর্শী। শিশুর মতো লোকেই তাহা বুঝিতে ও কার্যে পরিণত করিতে পারিত। সত্য সূর্যের আলোর মতোই সহজে মিলে। মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, "আমি এ কথা খুব ভাল করিয়াই বিশ্বাস করি যে, যাহা আমার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে, তাহা একটি বালকের পক্ষেও সম্ভব। এ কথা বলার উপযুক্ত হেতুও আমার আছে। সত্যের অনুসন্ধানের উপায় বা সাধন যেমন কঠিন তেমনই সহজ। উহা আত্মাভিমানীর নিকট অসম্ভব বলিয়া মনে হইলেও একটি নির্দোষ বালকের পক্ষেও সম্ভব।" এ কথা বলার ভিত্তি এই যে, আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের জন্য শরীরের বল অথবা বুদ্ধি প্রাখর্য তো দরকার নয়ই পরন্তু উহারা বাধা এবং সত্যের ভিত্তি নিহিত, সরলতা ও পবিত্রতার মধ্যে, যাহা নির্দোষ শিশুর মধ্যে অপর্যাপ্ত।

একবার বেলুড় মঠে দুর্গাপূজার সময়ে আমি মঠে ছিলাম। আমি রাত্রে তাঁহার ঘরে শুইতাম। প্রায়ই রাত্রে তাঁহার প্রসাদ ও সেবা আমার প্রাপ্য হইত। তখন দেখিয়াছি তাঁহার দৈনন্দিন কার্য ছিল কিরূপ। সকালে কোনদিন আমি তাঁহার পূর্বে উঠিতে পারি নাই। সুতরাং মনে হয় তিনি ৩।৩½ টার সময় উঠিতেন। কেন না আমরা তখন মঠের ঘণ্টার সঙ্গে ৪টার সময় উঠিয়া পূজার কার্যে সাহায্য করিতাম। উঠিয়া তিনি তামাক খাইতেন পরে পায়খানায় যাইতেন। তৎপর ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া নিজের বিছানার উপরে অথবা গঙ্গার ধারের বারান্দায় প্রায় ৯।১০টা অবধি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। ধ্যান করিতেন না জপ করিতেন তিনিই জানেন। তবে প্রায়ই দেখিয়াছি, বিহ্বল দৃষ্টিতে একদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। তারপর স্নান সারিয়া ঠাকুর ঘরে প্রণাম করিয়া আসিয়া পুস্তক পাঠ করিতেন অথবা ঐরূপভাবে থাকিতেন। খাবার ঘণ্টা পর্যন্ত এইরূপ। পুনরায় ২½ টা ৩টার সময়ে পায়খানায় যাইতেন। তারপর হইতে রাত্রে আহারাদি পর্যন্ত কোন দিন বা চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, কোন দিন বা বেড়াইতে যাইতেন। আমরা ঐ সময়েই কথাবার্তা কহিতাম। আহারাদির পর রাত্রিতে শয়ন করিতেন। যাক, তিনি কিরূপ সরল উপদেশ দিতেন তাহা বলি ঃ একদিন সন্ধ্যার পরে আমি ও আমার এক বন্ধু তাঁহার সেবা করিতেছি।

বন্ধুটি হয়ত কিছু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি উত্তরে বলিলেন, "তুই যদি তোর ছোট ছোট ভাইবোনদের কোন জিনিস দিস তার জন্য কি কিছু ফেরত চাস? ভগবানকে ভালবাসতে হবে ঐ রকম। 'ঠাকুর, তোমাকে দেহ মন প্রাণ সব দিলাম, তুমি আমাকে পায়ে রেখো। আমি আর কিছু চাই না'।" কথাগুলি আমরা সকলেই জানি এবং চেষ্টা করিয়াও ঐরূপভাবে ফলত্যাগ করিয়া সেবাদি কার্য করিতে পারি না, অথচ নির্দোষ শিশু ইচ্ছা করিলে এই উপদেশ সহজে পালন করিতে পারে। আমি যখন কিছু দিয়া ফেরত চাই, তখন সকলেই ঐরূপ করে এই ভাবিয়া আমি নিশ্চিন্ত হই; কিন্তু আমি আশ্চর্য হই এই ভাবিয়া যে, আমাকে নিন্দা না করিয়াও যদি কেহ আমার সামনে অপর কাহারও প্রশংসা করে তখনই আমার ভিতর কালি হইয়া যায় এবং আমি সেই প্রশংসায় মন খুলিয়া যোগ দিতে পারি না।

আমার বন্ধুটি বলিলেন, "মহারাজ, আপনারা বরাহনগর মঠে কিরূপে আছিলেন?"

"সে আর কি বলব। স্বামীজী ও অন্যান্য সকলে সাধন-ভজন করতেন, আমি বাসনমাজা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, এইসব করতাম।"

আমরা আরও শুনিবার আগ্রহ করিলে বলিলেন, "স্বামীজী মেঝের উপর চাটাই পেতে শুতেন, আরও কত কি করতেন, এইসব তোরা বই পড়ে দেখিস।" নিজের সম্বন্ধে কিছুই বলিবেন না দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা, আপনার কুলকুণ্ডলিনী শক্তি জাগ্রত হয়েছে?" তিনি বলিলেন, "কখনো কখনো অনুভব হয় বটে নিচ থেকে উপরের দিকে একটা কি যেন সুর সুর করে যাচ্ছে।" আমরা আরও কিছু বলিবার জন্য চাপিয়া ধরিলাম কিন্তু তিনি আর কিছুই বলিলেন না। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁহার নির্বিকল্প সমাধি হইয়াছে কি না জিজ্ঞাসা করি কিন্তু সাহসে কুলাইল না।

কাম দমন কিভাবে করিতে হইবে তাহা কোন দিন সোজাসুজি জিজ্ঞাসা করি নাই, লজ্জা করিত। কিন্তু চিঠিতে বহুবার জিজ্ঞাসা করিয়াছি। তদুত্তরে কখনও জানাইয়াছেন, "পুব দিকে গেলে পশ্চিম দিক পেছনে পড়ে থাকে,

সুতরাং ঐ দিকে কোন নজর না দিয়ে যে পথে চলেছিস সেই পথে চলে যা। কিছুদিন পরে দেখবি কাম কোথা দিয়ে চলে গেছে, টেরও পাসনি।” কখনও লিখিয়াছেন, “মহামায়ার ইচ্ছা না হলে কিছু হবার উপায় নেই। মহামায়া যাকে যখন যেভাবে রাখেন সেইভাবেই থাকতে হবে। তিনি যখন কৃপা করে আমাদের দোষ ছাড়ায়ে দেবেন, তখনই গেল।” কখনো বলিয়াছেন, “তাঁর নিকট আন্তরিক প্রার্থনা কর, তবেই হবে। আন্তরিক প্রার্থনা কাকে বলে—না, কাঁদাকাটা করে তাঁর নিকট নিজের ব্যথা জানানো।” কখনো বা লিখিয়াছেন, “কেন হবে না? তুই ঠাকুরের লীলাসঙ্গীর সঙ্গী, সর্বদা মনে এই জোর রাখবি।”

সেবার পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদের নিকট গল্প করিয়াছিলেন যে, সোনারগাঁ মঠে স্বামীজীর জন্মতিথির দিন শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে তিনি বসিয়া আছেন, হঠাৎ দেখিলেন, স্বামীজী আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার কপালে বড় বড় চন্দনের ফোঁটা। ফোঁটাগুলি কে দিল জিজ্ঞাসা করাতে স্বামীজী উত্তর দিয়াছিলেন, মাদ্রাজের সব ভক্তেরা দিয়াছে। জামতাড়া রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যখন তিনি জীবন-সংশয় রক্তামাশয়ে ভুগিতেছিলেন, তখনও তাঁর ঐরূপ দিব্যদর্শন হইয়াছিল। ঘটনাটি আমি তাঁর সেবক অ—মহারাজের নিকট শুনিয়াছি। অ—মহারাজ বাতাস করিতেছিলেন, মহারাজ তাঁহাকে হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, “অ—, দেখিস কি, সরে দাঁড়া, ঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, মহারাজ—এরা সব এসেছেন। তুই কি দেখতে পাচ্ছিসনে? ঐ সময়ে সম্ভবত জানিতে পারিয়াছিলেন যে ঐ রোগে তাঁহার দেহত্যাগ হইবে না। তাই পরে অ—মহারাজকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুর তাঁকে বলিয়াছেন যে, এই রোগ শীঘ্রই সারিয়া যাইবে, কোন চিন্তা নাই।

তিনি ইচ্ছা করিলে মনের কথা বুঝিতে পারিতেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। একদিন একটি ছেলে তাঁহার পদসেবা করিতে ছিল, আমি নিকটে বসিয়াছিলাম। আমার মনে বড়ই ইচ্ছা হইল যে, আমি তাঁহার হাত টিপি। ইচ্ছাটি খুব তীব্র হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে তিনি আমার দিকে তাকাইয়া বলিয়া উঠিলেন, কিরে, হাত টিপবি নাকি, বলিয়া হাত আগাইয়া দিলেন। অন্য দিবস তিনি

কাফ খাইতেছিলেন। পূর্বেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমি খাইব কি না? আমি না বলিয়াছিলাম। তারপর তিনি যখন খান, তখন আমার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছিল যে আমি একটু প্রসাদ পাই। কিন্তু তিনি সব খাইয়া ফেলিলেন ও পাত্রটা আমাকে ধুইতে দিলেন। আমি দেখিলাম, পাত্রে সামান্য তখনও আছে। আমি মনে মনে বলিলাম, ঐটুকুও যদি আমায় দিতেন। ইহা মনে করাতেই অর্ধপথ হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "উহার ভিতরে একটুখানি আছে খেয়ে দেখ বেশ মিষ্টি লাগবে।" অবশ্য ঘটনা দুটি বিশ্লেষণ করিলে হয়ত কাকতালীয়বৎ মনে হইতে পারে কিন্তু তখন আমার ঐরূপই মনে হইয়াছিল।

তাঁহার সম্বন্ধে আর একটি গল্প অন্যান্য স্বামীজীদের নিকটে শুনিয়াছিলাম। গল্পটি তাঁহাকে দিয়া যাচাই করিয়া লইয়াছিলাম, সুতরাং এখানে বলা যাইতে পারে। তাঁহার সাধন অবস্থায় এক সময়ে তিনি হিমালয়ের কোন নিভৃত কুটিরে তপস্যা করিতেছিলেন। এই সময়ে তিনি জ্বরে ভুগিতেছিলেন। জ্বর হঠাৎ ছাড়িয়া যায় ও তিনি অচৈতন্য হইয়া পড়েন। চৈতন্য হইলে তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জল খাইবেন কিন্তু উঠিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া লইবেন এমন শক্তি নাই। কোনক্রমে উঠিয়া কুঁজা হইতে জল ঢালিয়া লইতেছেন, এমন সময়ে আর পারিলেন না, ঢলিয়া পড়িলেন। বড় দুঃখ হইল, অভিমান করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের উদ্দেশে বলিলেন, "হায় ঠাকুর, একটু জল ঢালিয়া খাইব, এমন শক্তিও রাখ নাই।" রাত্রি প্রভাত হইল। সকালে হঠাৎ একটা গোলমালে জাগরিত হইয়া দেখেন আর এক কাণ্ড! "মহারাজ, এ মহারাজ দরওয়াজা খুলিয়ে।" তিনি উঠিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মচারিবেশী একজন লোক। কি চাই জিজ্ঞাসা করাতে লোকটি তাঁহার সেবা করিতে চাহিল। তিনি বলিলেন, "প্রয়োজন নেই।" তথাপি লোকটি জোর করে দেখিয়া তিনি কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। লোকটি বলিল, সে গঙ্গাজীতে তর্পণ করিবার জন্য দুই দিন যাবৎ এই জনহীন দেশে আসিয়াছে। গতকল্য রাত্রে দুর্গামাঈ স্বপ্নে তাকে দর্শন দিয়া বলেন যে, তর্পণ করিয়া তাহার যে কাজ হইবে তাহা অপেক্ষা ঐ স্থানে এক সাধুর 'বুখার' হইয়াছে, তাঁহাকে সেবা করিলে বেশি ফল হইবে।

সকালে উঠিয়াই তাই সে এখানে আসিয়া দেখে সবই সত্য। খোকা মহারাজের চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিজেকে সম্বরণ করিয়া লোকটিকে নানারূপে বুঝাইয়া ফিরাইয়া দিলেন। পরদিন শেষরাত্রে লোকটি আবার আসিয়া উপস্থিত। সেদিনও নাকি রাত্রে দুর্গামাঈ তাহাকে ঐ কথা বলিয়া সেবা করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। সেবা সে করিবেই, কিছুতেই ছাড়িবে না। খোকা মহারাজও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, কিছুতেই সেবা করিতে দিবেন না। তাহাকে খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, নিশ্চয়ই দুর্গামাঈ অন্য কোন সাধুর কথা বলিয়াছেন, নহিলে তাহার তো সেবার কোন প্রয়োজন নাই। লোকটি চলিয়া গেলে খোকা মহারাজ প্রার্থনা করিলেন, "ঠাকুর আমাকে আর প্রলোভনে ফেল না। না বুঝে অভিমান করেছিলাম, অভিমান ভাঙালে, ভালই হলো। আর লোভ দেখিও না।" লোকটি তার পরের দিনও আসিয়াছিল। পরে আর আসে নাই।

(উদ্বোধন ঃ ৪০ বর্ষ ৬ সংখ্যা)

খোকা মহারাজের কথা

জনৈক ভক্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম শিষ্য শ্রদ্ধেয় খোকা মহারাজকে আমি প্রথম দেখি ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলায় বালিয়াটি গ্রামে। কয়েক বৎসর হইল এই গ্রামে একটি রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম স্থাপিত হইয়াছে। আশ্রমের উদ্যোক্তাগণ রামকৃষ্ণ মঠ হইতে সাধু-মহারাজদের নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন। এ পর্যন্ত তাঁহারা যথেষ্ট চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ শিষ্যদের মধ্যে কাহাকেও আনিতে সক্ষম হন নাই। এই জন্য যখন শুনিলাম যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের এক শিষ্য আসিতেছেন, তখন আমাদের উৎসাহ ও উদ্বেগের অন্ত ছিল না। খোকা মহারাজের সম্বন্ধে বহু কথা তাঁহার আসিবার পূর্বেই লোকমুখে প্রচারিত হইল। শুনিলাম, শ্রীশ্রীমা নাকি পা ছড়াইয়া বসিয়া মুড়ি খাইতেন, আর যে দুই একটি মুড়ি ডালা হইতে পড়িত, তাহাই ইনি কুড়াইয়া কুড়াইয়া মুখে দিতেন। এইরূপ অনেক বিষয় যাহা শুনিলাম, তাহাতে তিনি নামেও যেমন খোকা, কাজেও তেমনই খোকা, ইহাই মনে বদ্ধমূল হইল। আমরা এই খ্যাতনামা বৃদ্ধ খোকা মহারাজকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিলাম।

তখন আমি স্থানীয় স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ি—প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত হইতেছি। আশ্রমে যথাশক্তি সেবাকার্যাদি করিতাম। একদিন বিকালবেলা যথানিয়মে আশ্রমে যাইয়া দেখি, খুব সমারোহ, সেবকগণ ছুটাছুটি করিতেছেন, দর্শনার্থী লোকের বিশেষ ভিড়, ঘরে ঢুকিতে পারিলাম না। উঁকি মারিয়া দেখিলাম, একঘর লোক বসিয়া আছেন, একধারে একটি তক্তপোশের উপর বেশ ভাল বিছানা পাতা, তাহার উপর একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন, দুই জন সেবক দুই দিক হইতে দুইটি বড় বড় পাখা ধীরে ধীরে চালাইতেছেন। বেশ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, বৃদ্ধদের মতন মোটেই গম্ভীর নন, চেহারার মধ্যে সারল্য

ও খোলাখুলি ভাব। গায়ে একটি ওভারকোট, তদুপরি একখানা চাদর। শুনিয়াছিলাম, অল্প বয়সে মুখমণ্ডল গোলাকার ছিল, কিন্তু দেখিলাম, তাহা নহে, চেহারায় দৃঢ় ও প্রতিজ্ঞাব্যঞ্জক ভাবের মধ্যেও মনোমুগ্ধকর কমনীয়তা বর্তমান। চক্ষু দুইটি ছোট ও শ্রমকাতর, কিন্তু হাসিলেই উহা অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হইয়া উঠে।

নিকটে বসিয়া কথাবার্তার সুযোগ হইল না, এজন্য একটু মনক্ষুণ্ণ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। পরদিন সকালবেলা কিছু পয়সা লইয়া চলিয়াছিলাম বাজারের দিকে—মিষ্টি কিনিবার জন্য। ভাইবোনও সঙ্গে ছিল। আশ্রমের ধার দিয়া যাইতেছিলাম। ইচ্ছা ছিল, আশ্রমে উঠিয়া সন্ন্যাসীকে দেখিয়া ও প্রণাম করিয়া যাইব। আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই পূর্বের ঘরে একাকী বসিয়া আছেন। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিতেই তিনি ডাকিলেন, "আয় আয়, তোরা এদিকে আয়।" আমি সাহস করিয়া তাঁহাকে যাইয়া প্রণাম করিলাম। নিজে প্রণাম করিয়া ছোট ছোট ভাইবোনদের ডাকিয়া আনিয়া প্রণাম করাইলাম। তাহারা প্রণাম করিয়া ঘরের বাহিরে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তিনি আমাকে দুই-এক কথা কি যে জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহা এখন আমার মনে পড়িতেছে না। সম্ভবত পরিচয় ও কি পড়ি, তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকিবেন। হঠাৎ তিনি তক্তপোশের উপর হইতে নামিয়া আসিয়া সস্নেহে আমার কাঁধে হাত দিয়া কানের নিকট মুখ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "দীক্ষা নিবি?" আমি তখন একেবারে ছোট নই। ধর্মপুস্তক কিছু কিছু পড়িয়াছি। বয়স ১৫ হইতে ১৬-র ভিতর। সুতরাং এই প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারিলেও, ইহা অপ্রত্যাশিত বলিয়া একটু চমৎকৃত হইয়াছিলাম। আমি সামনের দিকে মাথা বাঁকাইয়া উত্তর করিলাম, "আচ্ছা।" আমাদের উভয়েরই খালি গা এবং উভয়েই দাঁড়াইয়া। তিনি আমার নিকট ঘেঁসিয়া আসিয়া কানে মৃদুস্বরে একটি মন্ত্র বলিলেন ও আমার বুঝিবার জন্য দুই তিনবার উচ্চারণ করিলেন। যখন দেখিলেন বুঝিতে পারিয়াছি, তখন বলিলেন, "আজ পূর্ণিমা, বেশ ভাল তিথি—ভালই হলো।" এই বলিয়া জলপাত্র হইতে গঙ্গাজল লইয়া নিজে একটু পান করিলেন, আমার

মুখেও কিছু ঢালিয়া দিলেন এবং পরে বলিলেন, "দীক্ষা নিলি, দক্ষিণা দিবিনে।" আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম। পরক্ষণেই স্মরণ হইল, আমার নিকট একটা সিকি আছে, তাহাই দিতে চাহিলাম। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "থাক থাক, তোর দিতে হবে না, তুই রেখে দে।" আমি পুনরায় তাঁহাকে প্রণাম করিলাম, তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন ও বলিলেন, "আবার আসিস।" ২।৩টার সময় আবার আশ্রমে গেলাম। তিনি শুইয়া ছিলেন, আমার শব্দ শুনিয়া তিনি চোখ মেলিয়া আমাকে দেখিয়া বলিলেন, "আয়।" আমি যাইয়া প্রণাম করিলাম ও তিনি মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন এবং আমাকে বলিলেন, "একটু টিপে দে দেখিনি।" আমি মেজের উপর হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পা টিপিব মনে করিতেছি। এমন সময় তিনি আমাকে টানিয়া একেবারে উপরে বসাইয়া দিলেন। আমি মৃদু আপত্তি করিলাম এবং বলিলাম, "আমার পায়ে ধুলা আছে।" কিন্তু তিনি শুনিলেন না। আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম, তিনি বলিতে লাগিলেন, "দ্যাখ, আর কারু থেকে মন্ত্র নিবিনে। আমি যা দিয়েছি সেই তোর মন্ত্র, আর গুরু করবিনি, আমিই তোর গুরু। যে মন্ত্র দিয়েছি, তাই সকালে সন্ধ্যায় একটু একটু জপ করবি। আর দ্যাখ, এই মন্ত্র কারুর কাছে বলবিনি, বললে কিন্তু ফল হবে না।" এমন সময়ে অন্য লোক ঘরের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার কথা বন্ধ হইল।

পরদিন সকালবেলা ৮।৯টার সময়ে আশ্রমে উপস্থিত হইয়াই দেখি, তিনি পায়খানায় চলিয়াছেন। পায়খানাটি আশ্রম হইতে প্রায় ৫০।৬০ গজ দূরে ছিল। আমাকে দেখিয়াই তিনি সঙ্গে যাইতে বলিলেন। আমি গাড়ু লইয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "দ্যাখ, যা দিয়েছি, ওতেই তোর সব হবে।" আমি বলিলাম, "এতে আমার ঈশ্বর লাভ হবে তো?" তিনি জোরের সহিত বলিলেন, "নিশ্চয়ই হবে।" পরে বলিতে লাগিলেন, "জপ করিস তো? বেশ বেশ, সকালে উঠে একটু জপ করে তারপর পড়তে বসবি। আর দ্যাখ, মেয়েমানুষের মুখের দিকে কখনো তাকাবিনে।" পায়খানা হইতে ফিরিয়া ঘরে আসিয়া তক্তপোশে তিনিও বসিলেন এবং আমাকেও বসাইলেন।

আমি পদসেবা করিতে লাগিলাম আর তিনি বলিতে লাগিলেন, "এখন তো তুই আমার 'পোলা' হলি, আমাকে খাওয়াতে হবে কিন্তু। এখন ভাল করে পরীক্ষা দে—স্কলারশিপ পেয়ে পাশ কর। পরে চাকুরি করে আমাকে খাওয়াতে হবে।" আমিও হাসিতে হাসিতে তাঁহার কথায় সায় দিতে লাগিলাম। এইরূপ মিষ্টি মিষ্টি কত কথা হইতে লাগিল।

এই স্থানে তিনি স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে বহু লোককে দীক্ষা দিয়াছিলেন। একদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণে সহস্র সহস্র লোকের সমক্ষে 'শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ ও সর্বধর্মসমন্বয়' সম্বন্ধে মিনিট দশেক বক্তৃতাও দিয়াছিলেন। প্রায় প্রতিদিনই সন্ধ্যারতির পরে তাঁহার ঘরে স্থানীয় ভদ্রলোকগণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা, তাঁহার সাধনকালের কথা ও সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতেন। তাঁহার নিজ জীবন সম্বন্ধে প্রশ্ন প্রায়ই এড়াইয়া যাইতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা উঠিলেই উৎসাহিত হইতেন। ঈশ্বর লাভের উপায় সম্বন্ধে প্রায়ই বলিয়াছেন, "ভগবানের কৃপা ছাড়া আর কোন উপায় নেই; সুতরাং তাঁর নাম করা, তাঁর কাছে আন্তরিক প্রার্থনা এইসব করতে হবে।"

এখানে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা না বলিয়া তৃপ্তি পাইতেছি না। আমাকে যে তিনি অহেতুক কৃপা করিয়াছিলেন, তাহা আমি গোপন রাখিতে পারি নাই। বন্ধুরূপী শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়কে ঐ কথা গর্বসহকারে বলিয়াছিলাম। ইনি আমাকে ও আমার নিম্ন শ্রেণির একটি বালককে খুব ভালবাসিতেন। এই বালকটি অত্যন্ত নম্র, সেবাপরায়ণ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল। এই সমস্ত গুণের জন্য সে তখনকার ছাত্রগণের আদর্শস্থানীয় ছিল। শিক্ষক মহাশয় আমাদের দুই জনের আধ্যাত্মিক কল্যাণের দিকে সর্বদাই লক্ষ্য রাখিতেন, তাই আমার সৌভাগ্যের কথা জানিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "Well boy, I do envy you." তাঁহার ইচ্ছা ছিল সেই বালকটিও ঐরূপে দীক্ষিত হয়। যাহা হউক, খুব সম্ভব তাঁহার এই ইচ্ছা বালকটির মধ্যে সংক্রমিত হয়। কিন্তু তখন সময় ছিল না। তাই যেদিন খোকা মহারাজ আমাদের গ্রাম

বাড়িতে চলিয়া যান, সেদিন বালকটি তাঁহার পালকির সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত দৌড়াইয়া গিয়াছিল। শুষ্কমুখ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই বালকটিকে ঐরূপে পালকির সঙ্গে দৌড়াইতে দেখিয়া খোকা মহারাজের দয়া হইল। তিনি পালকি থামাইয়া বালকটিকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই সে তাঁহার পায়ের উপর পড়িয়া ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন মহাপুরুষ সমস্তই বুঝিলেন। তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া তাহার আধ্যাত্মিক জীবনের যাহা প্রয়োজন সমস্ত উপদেশ দিয়া বিদায় দিলেন। কয়েক বৎসর হয় শিক্ষক মহাশয় অকস্মাৎ দেহত্যাগ করিয়াছেন। ইনি আজীবন ব্রহ্মচারী ও সংযত চিত্ত ছিলেন। ইঁহার নিষ্কলঙ্ক চরিত্র এখনও চোখের উপর ভাসিতেছে।

স্বপ্নের মতো খোকা মহারাজ আমার জীবনে আসিয়াছিলেন, আবার স্বপ্নের মতই চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলে আমি প্রায় সমস্ত ভুলিয়া গেলাম। পূর্বে যেরূপ ছিলাম সেইরূপই রহিয়া গেলাম। জপ করিতাম না বলিয়াই মনে হয়। তাই প্রবেশিকা পরীক্ষার পর অখণ্ড অবসরের মধ্যে যখন ঢাকায় ঘুরিতে ফিরিতে ছিলাম, তখন একদিন চমক লাগিল তাঁহাকে হঠাৎ ঢাকায় দেখিয়া। সেদিন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে ঢাকায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ দেখিতে গিয়াছিলাম। তিনি একান্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "সতু, জপ করিস তো!" আমি কি বলিব? নীরবে "হাঁ" বলিলাম। সঙ্গী বন্ধুগণ পাছে জানিয়া ফেলে এই ভয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিলাম। পরের দিন পুনরায় একাকী মঠে যাইয়া তাঁহার বিছানার উপর বসিয়া পদসেবা করিতে লাগিলাম। তিনি বলিলেন, "তুই তো এবার ম্যাট্রিক দিলি। বৃত্তি পেলে বেশ ভাল হয় না? চাকুরি করে আমাকে খাওয়াবি তো? লোকে আমায় খোকা বলে, তুই কি তাই বলিস? না তুই বুড়ো খোকা বলিস?" পরক্ষণেই অনুচ্চ স্বরে বলিলেন, "দ্যাখ, আমিই তোর গুরু। এতেই তোর সব হবে।"

পূজনীয় খোকা মহারাজকে তৃতীয়বার দর্শন করি বেলুড় মঠে। তখন কলিকাতায় হোস্টেলে থাকিয়া আই-এ পড়ি। সন ইংরাজি ১৯২৫। নূতন কলিকাতায় আসিয়াছি, কলেজ তখনও খোলে নাই; দ্রষ্টব্য নানা জিনিস দেখিয়া

বেড়াইতেছি। এইরূপে মিউজিয়ম, চিড়িয়াখানা, কালীঘাট, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট ও ইডেন গার্ডেন দেখা হইল। সহপাঠিদের প্রস্তাব হইল বেলুড় মঠ ও দক্ষিণেশ্বর দেখিতে হইবে। সদলবলে স্টিমারে বেলুড় মঠে আসিয়া বেলা দুইটার সময়ে উপস্থিত হইলাম। গেস্ট হাউস, ডাক্তারখানা, স্বামীজীর মন্দির, মা-র মন্দির, মহারাজের মন্দির ইত্যাদি দর্শন করিতে করিতে আমাদের সময় কাটিতে লাগিল। শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করিয়া আমরা সামান্য প্রসাদ পাইলাম। তখন আমাদের মধ্যে কেহ প্রস্তাব করিল, "চল মঠের প্রেসিডেন্ট মহাপুরুষজীকে দেখে আসি।" আমরা জনৈক স্বামীজীকে আমাদের অভিপ্রায় বলিলাম। তিনি আমাদের মহাপুরুষজীর ঘরে পৌঁছাইয়া দিলেন। আমরা সকলেই একে একে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলাম। শুনিয়াছিলাম ইনি অত্যন্ত গম্ভীর। দেখিয়া সেরূপ মনে হইল না। তথাপি তাঁহার মুখের মধ্যে এমন একটা কিছু আছে, যাহাতে সহজে ও ইতস্তত না করিয়া তাঁহার কাছে যাওয়া ও খোলাখুলি আলাপ করা চলে না। আমরা নিঃশব্দে বসিয়া রহিলাম। মনে করিয়াছিলাম ইনি হয়তো আমাদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, কিন্তু ৫।৭ মিনিটের মধ্যেও কিছুই বলিলেন না। কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া আমরা উসখুস করিতে লাগিলাম। তখন তিনি বলিলেন, "ব্যস, এইবার তোমরা যাও, আর ঘর গরম করে লাভ কি।" আমরা লজ্জিত হইয়া পুনরায় প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, এমন সময়ে একজন স্বামীজী আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "সতু কে?" আমি বলিলাম, "আমার নাম।" "তবে চল, তোমাকে খোকা মহারাজ ডেকেছেন।" আমরা সকলেই খোকা মহারাজকে দর্শন করিতে চলিলাম। আমি একটু আশ্চর্য হইয়া ছিলাম এই ভাবিয়া—তিনি জানিলেন কি করিয়া যে আমি এখানে আসিয়াছি। আমি অবশ্য খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম যে, তিনি বেলুড় মঠেই আছেন কিন্তু কোন্ ঘরে থাকেন তাহা জানিতাম না, কাজেই তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে পারি নাই। ঘরে গিয়া দেখিলাম, আমাদের সু-বাবু তাঁহার পদ সেবা করিতেছেন। তখন বুঝিলাম, সু-বাবু বলিয়া দিয়াছেন যে আমি এখানে আসিয়াছি। আমরা সকলেই একে একে প্রণাম করিয়া মেঝেতে বসিলাম। তিনি আমাকে বাড়ির কথা

জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি তাঁহার মাথার নিকট বসিয়া হাওয়া করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পর অন্যান্য ছেলেরা উঠিয়া তাঁহাকে পুনরায় প্রণাম করিয়া বিদায় গ্রহণ করিল। তিনি আমাকে আর একদিন সকালে আসিতে বলিলেন। আমিও বিদায় গ্রহণ করিলাম।

খুব সম্ভব তার পরের দিনই আমি আবার একাকী বেলুড় মঠে গেলাম। বেলা ৭টা হইবে। সোজাসুজি পূজনীয় খোকা মহারাজের ঘরে যাইয়া উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া তাঁহার পদসেবা করিতে লাগিলাম। নানা কথাবার্তা হইতে লাগিল। একটা কথা মনে আছে। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন তো আমার 'পোলা' হলি (আমি পূর্ববঙ্গীয় বলিয়া তিনি আমার সহিত পূর্ববঙ্গীয় কথ্যভাষাতেই প্রায় কথাবার্তা বলিতেন), আর চিন্তা কি? আমিও চলিলাম, আর তুইও চললি। তবে আমি কিছুদিন আগে আর তুই কিছুদিন পরে।" ইতোমধ্যে ঘোলের ঘণ্টা পড়িল। তিনি বলিলেন, "চল, ঘোল খেয়ে আসি।" এই বলিয়া আমাকে লইয়া রান্নাঘরের বারান্দায় আসিলেন। তিনি একটু ঘোল খাইয়া অধিকাংশই আমাকে দিলেন। আমিও সন্তুষ্ট চিত্তে প্রসাদ পাইতে লাগিলাম। তাহার পর মুড়ির টিন হইতে মুড়ি লইয়া উপরে তাঁহার ঘরে যাইয়া আমাকে মুড়ি প্রসাদ দিলেন। দ্বিপ্রহরে আমরা এক স্থানেই প্রসাদ পাইতে বসিয়া ছিলাম। তিনি ভাল জিনিস হইলেই আমার পাতে উঠাইয়া দিতে লাগিলেন। জনৈক স্বামীজী আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে পরিচয় দিয়া বলিলেন, "ছেলেটি বড় ভাল।" ইহা শুনিয়া আমার বুক ফুলিয়া উঠিল। বৈকালে ফিরিয়া আসিবার সময়ে তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া গভীর আলিঙ্গন করিলেন।

ইহার পর বি-এ পড়া পর্যন্ত অনেক বারই মঠে গিয়াছি কিন্তু প্রায় কিছুই মনে নাই, কেবল একটা গভীর অনুভূতি আছে যে, খোকা মহারাজ আমাকে খুব ভালবাসিতেন। গেলেই বলিতেন, "ঠাকুরকে প্রণাম করেছিস? যা, মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে আয়।" আমি মঠে যাইয়া প্রায়ই তাঁহার ঘরে থাকিতাম, আর কোথাও যাইতাম না। সেজন্য অন্যান্য সাধু-মহারাজগণ আমাকে মধুর উপহাস করিতেন। কখনো কখনো মঠে যাইয়া তাঁহাকে দেখিতাম

না, তখন অনেকে বলিতেন, "আজ এসেছিস যে?" একদিন দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সোজাসুজি তাঁহার ঘরে না গিয়া ভিজিটার্স রুমে বসিয়া গল্পসল্প করিতেছিলাম। তিনি জনৈক সাধুকে আমার খোঁজ করিতে পাঠাইয়াছিলেন। আমি তাঁহার ঘরে গেলে অনুযোগ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই দ্যাখ, তুই কোথায় ছিলি, আর আমি ঘুমাতে পারছি না।" আমি লজ্জিত হইয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইলাম। আরও দুই একদিন ঐরূপ ঘটনা হওয়ায় তিনি যে মৃদু অনুযোগ করিয়াছিলেন, তাহা হইতে বুঝিয়াছিলাম যে, আমি মঠে গিয়া কুঁড়েমি করিয়া অথবা গল্প করিয়া সময় কাটাই ইহা তাঁহার অভিপ্রায় নহে। একদিন তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "মঠে এসে আর কোথাও যাসনি, সোজাসুজি এ ঘরে চলে আসবি।"

আমার যে সমস্ত কথাবার্তা স্মরণ আছে তাহার অনেক কথা আমি বাদ দিয়া যাইতেছি। সমস্ত কথা বলিবারও নয়। যাহা বলিতেছি, তাহা দ্বারা যদি দেখাইতে পারি যে, তিনি কেমন নিঃস্বার্থভাবে আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণকামনা করিতেন, তাহা হইলেই ইহা সার্থক হইবে। পাঠকগণ দয়া করিয়া এই লেখা হইতে লেখককে বাদ দিয়া কেবল মাত্র এই মহাপুরুষের কার্যকলাপের দিকটিই লক্ষ্য করিলে আমার উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

(উদ্বোধন ঃ ৪০ বর্ষ ৩ সংখ্যা)

শ্রীশ্রীখোকা মহারাজের কথা

জনৈক ভক্ত

৫ অক্টোবর ১৯২৪।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় চিন্তা করিবে। মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫।

যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়েছ ভাবনা কি? কল্পনা করিয়া নানাপ্রকার বাজে চিন্তার আবশ্যক নাই। এই জানিয়া রাখ তিনি আমার হৃদয়ে—আমি তাঁর আশ্রিত।

তোমরা আমার সন্তান ও ছেলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আমার নিকট হইতে নাম পাইয়াছ। খুব বিশ্বাস রাখ তিনি আমার—আমি তাঁর। তাঁকে খুব আপনার জানিবে। ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নাই।

৫ জানুয়ারি ১৯২৭, রাঁচি।

একটা কথায় বলে,

> "গুরু, কৃষ্ণ, ইষ্ট তিনের দয়া হয়।
> একের দয়া বিনা জীব ছারে খারে যায়॥"

অর্থাৎ সকল সময় মন ঠিক থাকে না। এর উপায়, সদসৎ বিচার দ্বারা মনে শান্তি আনিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "উত্তর দিকে যে মানুষ চলে, দক্ষিণ দিক তার কাছে দূর হয়ে যায়। সেই রকম ভগবানের রাস্তায় যে চলে শান্তি তার নিকটবর্তী হয়, অশান্তি দূরে চলে যায়।" ভগবানের কৃপায় মঙ্গল হইবে। বাজে চিন্তা রাখিবে না।

৫ মার্চ ১৯২৭, পাটনা।

"নামেতে কালপাশ কাটে।" যে লোক সকল রকম বাসনাশূন্য হইয়া

একমনে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, তার কোন রকম মনের বন্ধন থাকে না। মন থেকে সকল বাসনা কামনা চিরদিনের মতো তাড়াইতে হইবে—তবে মন স্থির হয়। বিচার-বুদ্ধি যার যার নিজের কাছে।

২৩ মার্চ ১৯২৭, কাশীধাম।

শুধু যদি ভগবানের দিকে মন থাকে তবে সমস্ত মায়া মোহ মন থেকে দূর হইয়া যায়। মন লইয়া যত সব ব্যাপার ঘটে। যদি কাহারও মনে রাগ থাকে, সদা সর্বদা সেই মানুষ সকলের উপর রাগ করিয়া থাকে। মনে মনে যদি কেহ স্ত্রীলোকের কথা ভাবে, দিনরাত ঐ সব চিন্তাতে তার মন মায়া মোহে আচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন, "স্ত্রীলোককে যদি দেখতে হয় তবে শুধু তার পা দেখে মনে মনে মা বলে প্রণাম করবে। তাতে কামরিপু চলে যাবে। যে মন কোন রকম আসক্তিতে পূর্ণ, সে মন দিয়ে ভগবানকে চিন্তা করা কষ্টকর ব্যাপার। যে সরিষা দিয়ে ভূত ছাড়াবে সে সরিষার মধ্যেই যে ভূত ঢুকে বসে আছে।" এখানে মনকে সরিষা বলা হইয়াছে।

গল্পে শুনিয়াছিলাম যদি কাহাকেও ভূতে পায় রোজারা (ওঝারা) আসিয়া সরিষা লইয়া মন্ত্র পড়ে, অবশেষে সেই সরিষা ভূতে পাওয়া মানুষকে ছুঁড়ে মারে।

মন তোমার, বিবেকবুদ্ধি তোমার, বিচার তুমি করিবে। আমি ভাত খাইলে তোমার পেট ভরিবে না নিশ্চয় জানিবে।

৩০ মার্চ ১৯২৭, কাশীধাম।

যখন যে অবস্থায় থাকিবে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করিবে। এমন কি পথে চলিতে চলিতেও তাঁর নাম লইবে। নামের এক মাহাত্ম্য আছে—তাহাতেই কাজ হইবে।

১৯ এপ্রিল ১৯২৭, কাশীধাম।

মানুষ ভগবানের দর্শন পায়, যদি স্বার্থত্যাগ করে, তাঁকে চিন্তা করে ও ডাকে।

যে লোক যে ভাবে থাকিয়া জপ করুক, মনে শান্তি লইয়া দরকার। সোজাভাবে বসুক বা সাধারণভাবে বসুক কোন আপত্তি নাই। লোক দেখানো জপ ধ্যান কিছু আবশ্যক নাই। যখন সোজা বসিয়া কষ্ট বোধ হইবে তখন অন্যভাবে বসিলে কোন আপত্তি নাই।

শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভগবানকে মানুষ এই রকম দেখিতে পায় যেমন, দুই জনে বসিয়া গল্প করিতেছে, দুই জনে বেড়াইতেছে।" ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে ডাকা চাই।

৭ মে ১৯২৭, কাশীধাম।

তাঁর নামে অমঙ্গল মঙ্গলে পূর্ণ হয়, অশান্তি থেকে শান্তি আসে। শুধু বিশ্বাস চাই। তারপর ভাল মন্দ তিনি যেমন চালাইবেন তাঁর হাত।

৫ জুন ১৯২৭, কাশীধাম।

ভগবানের নাম করিয়া যাইবে। তাহাতে সমস্ত অশান্তি শান্তিতে পূর্ণ হইবে। যেখানে যত মহাপুরুষ সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন, নামের উপর তাহাদের কত জোর দেখাবে। শ্রীশ্রীঠাকুরও নামের উপর খুব জোর দিয়া বলিতেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাক—নামেতে সব ভাল হইবে।

১০ সেপ্টেম্বর ১৯২৭, কাশীধাম।

ভক্ত ভগবানের নাম দিয়াছে 'দীননাথ", "পতিত পাবন" ইত্যাদি। যে বাসনা-কামনা শূন্য হইয়া তাঁহাকে ডাকে সেই তাঁহাকে লাভ করে।

মনে কর কাহারও পিতা খরচ পত্রাদি করিয়া ছেলেকে বিদেশে লেখাপড়া করিতে পাঠাইয়াছেন। সে ছেলে যদি লেখাপড়া না করে, তাহা হইলে সে দোষ কি পিতার না ছেলের? অনেকে আমার নিকট হইতে দীক্ষা চাহিয়াছে ও পাইয়াছে। কিন্তু সেই মতো তাহারা যদি কাজ না করে, তবে সে দোষ কাহার?

৩১ জানুয়ারি ১৯২৮, কাশীধাম।

যেরূপ পরিশ্রম করিবে সেইরূপ ফল পাইবে। গাজীপুরের পাওহারী বাবা বলিতেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।"

২৭ মে ১৯২৮, বেলুড় মঠ।

কোন প্রকার কাজকর্ম করিতে গেলে লোকে নানাপ্রকার কষ্ট যন্ত্রণা পায়। সব রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করিয়া যে লাগিয়া থাকিতে পারে সেই কাজের মানুষ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন "শ, ষ, স, তারপর হ। যে সয় সেই রয়।"

১৬ জুন ১৯২৮, বেলুড় মঠ।

মানুষের মন সদাসর্বদাই চঞ্চল থাকে। ভগবানের নিকট কেঁদে আন্তরিক প্রার্থনা করিতে হয়, যাহাতে মনে শান্তি আসে। চিরকাল মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয় না, এইটুকু জানিয়া রাখিবে যে—

"যখন যেরূপে মাগো রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।"

৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৮, রাঁচি।

তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। সে সম্বন্ধ একদিনের নয়। ইহকাল পরকালের জন্য—বরাবরের জন্য। সে বিষয়ে কোন চিন্তা বা সন্দেহ রাখিবে না। ভগবানের দিকে মন রাখিয়া চলিবে। দুঃখ-কষ্ট যাহা হয় কিছুতেই ভয় পাইবে না। স্রোতের জল নদীতে একটানা যায়, কিন্তু মাঝে মাঝে পাক খায়। টানের মুখে ঘোর-পাক আবার সোজা হইয়া চলে। সেইরূপ ভগবানের উপর মন থাকিলে ঘোর-পাকেতে কিছুই করিতে পারিবে না। দুদিন হয়ত মন এদিক ওদিক যাইবে, আবার কিছুদিন পর ভগবানের দিকে আপনিই চলিয়া যাইবে।

৩ আগস্ট ১৯২৯, জামতাড়া রামকৃষ্ণ মঠ।

শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে তিনিই সবসময়ে সকল অভাব দূর করিয়া দেন।

(উদ্বোধন ঃ ৩৫ বর্ষ ৬ সংখ্যা)

খোকা মহারাজের স্মৃতিকথা

সঙ্কলক ঃ ব্রহ্মচারী নির্গুণচৈতন্য

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দজী মহারাজ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে 'খোকা মহারাজ' নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন বড়ই লাজুক, কাউকে কোন কথা সহজে বলতে চাইতেন না। তাঁর সাধনজীবনও ছিল অতি গোপনীয়। তাঁর সঙ্গে যাঁরা খুব ঘনিষ্ঠভাবে মিশতেন, শুধু তাঁরাই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানতে পারতেন। তাঁর সম্বন্ধে যখন কিছু শুনি, আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই—কী সুন্দর অনাড়ম্বর সহজ-সরল এই মহাপুরুষের জীবন, কী অমূল্য তাঁর উপদেশ! উপদেশগুলি হয়তো কঠিন, অথচ পরিবেশানুযায়ী কত সহজ-সরল হতো, যখন তিনি সাধু-ব্রহ্মচারীদের কাছে সেগুলি বলতেন। তাঁদের মনে তাঁর কথাগুলি গভীরভাবে রেখাপাত করত, যা তাঁরা কোন দিন ভুলতে পারতেন না। এইরকম একজন সাধু—তখন তিনি ছিলেন তরুণ ব্রহ্মচারী, এখন প্রবীণ সন্ন্যাসী—তাঁর কাছ থেকে খোকা মহারাজের সম্বন্ধে কিছু শোনার সৌভাগ্য হয়েছিল। এই প্রবীণ সন্ন্যাসী—স্বামী বিদেহানন্দ—রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে গঙ্গাচরণ মহারাজ নামেই পরিচিত। তাঁর কাছে খোকা মহারাজের সম্বন্ধে যা শুনেছি, তা লিপিবদ্ধ করে উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকাদের উপহার দিচ্ছি ঃ

খোকা মহারাজ সত্যি খোকার মতো ছিলেন—কী সরল বালকস্বভাব! কখনো কখনো শিশুদের সঙ্গে খেলা করতেও ভালবাসতেন। একবারের একটি ঘটনা খুবই সাধারণ, তা সত্ত্বেও তারই মধ্যে তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ঘটনাটি ঘটে রাঁচি আশ্রমে। তখন ভাদ্র-আশ্বিন মাস, ক্ষুদে জামের সময়। আশ্রমের একটি গাছে ক্ষুদে জাম ভরতি হয়ে আছে। ছোট ছোট ছেলেরা ঐ গাছের তলায় পড়া জাম কুড়িয়ে খাচ্ছে। খোকা মহারাজ

ঐ না দেখে সেখানে গেলেন, আর তাদের সঙ্গে জাম কুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করলেন। তাই দেখে একজন ব্রহ্মচারী তাঁর কাছে ছুটে গেলেন এবং নিষেধের ভঙ্গিতে বললেন ঃ "মহারাজ, একি করছেন? আপনি কেন জাম কুড়িয়ে খাচ্ছেন?" খোকা মহারাজ উত্তরে বললেন ঃ "ক্ষুদে জাম খেলে ডায়াবেটিস সেরে যায়।" এই বলছেন আর শিশুসুলভ হাসি হেসে এক-একটা করে জাম কুড়িয়ে মুখে টপ করে পুরে দিচ্ছেন। এই দেখে ব্রহ্মচারী আর হাসি চাপতে পারলেন না, তিনিও খোকা মহারাজের সঙ্গে হাসতে লাগলেন।

আর একটি মজার ঘটনা। খোকা মহারাজ তখন বেলুড় মঠে আছেন, একদিন মনে মনে ঠিক করলেন—মঠের সব সাধুকে নিমন্ত্রণ করে কফি খাওয়াবেন। তিনি প্রথমে রান্নাঘরে গিয়ে পাচক ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "আজকে কিছু পায়েস কি বেশি হয়েছে?" পাচক ঠাকুর বলল ঃ "হ্যাঁ মহারাজ, এক বালতি বেশি হয়েছে।" খোকা মহারাজ সেই এক বালতি পায়েস তাঁর ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলে সব সাধুকে নিমন্ত্রণ করতে চলে গেলেন। প্রত্যেকের ঘরে ঘরে গিয়ে নিমন্ত্রণ করে নিজের ঘরে ফিরে এলেন। ঘরে এসে পায়েস থেকে দুধ আর চিনির রস ছেঁকে বের করে নিয়ে একটি পাত্রে রাখলেন। তাতে পরিমাণ মতো কফি-পাউডার মিশিয়ে দিলেন। এদিকে নিমন্ত্রিত সাধুরা তো বেজায় খুশি—আজ খোকা মহারাজ তাঁদের কফি খাওয়াবেন। তাঁরা তাড়াতাড়ি খোকা মহারাজের ঘরে এলেন। সবাই এলে তিনি প্রত্যেকের কাপে কাপে ঐ পাত্র থেকে কফি ঢেলে দিলেন। সবাই এক চুমুক খেয়ে বলতে লাগলেন ঃ "আঃ ওয়াণ্ডারফুল, ভেরি নাইস! কী সুন্দর সুইট ফ্লেভার বেরুচ্ছে!" এই বলতে বলতে সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে কফি খাওয়া শেষ করলেন। তখন খোকা মহারাজ হাসতে হাসতে বলতে লাগলেন ঃ "তোমাদের ঠকিয়েছি—পায়েসের কফি খাইয়েছি।" সবাই তো অবাক! সবাই তাঁর দিকে জিজ্ঞাসুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তিনি দুষ্টু হেসে বলছেন ঃ "রান্নাঘর থেকে পায়েস এনে, তা ভাল করে চটকিয়ে, কাপড় দিয়ে ভাল করে ছেঁকে, তাতে কফি-পাউডার মিশিয়ে তোমাদের খাইয়েছি।" সবাই তখন ঠকে যাওয়ার হাসি হাসতে লাগলেন। দেখে খোকা মহারাজের খুব আনন্দ হলো।

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। একদিন তিনি রিভল্‌ভিং চেয়ারে বসে আছেন, আর মাটিতে পা দিয়ে ঠেলে ঠেলে একটু একটু করে ঘুরছেন। তিনি যেখানে চেয়ারে বসে ঘুরছিলেন, তার ঠিক সামনের ঘরে মহাপুরুষ মহারাজ চেয়ারে বসে তাঁর ঘোরা দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি একটি মাদ্রাজি লাল-পেড়ে গেরুয়া কাপড় পরেছিলেন। তিনি কাপড়টিকে ভাঁজ করে হাঁটুর ওপর তুলে খোকা মহারাজের কাছে উঠে এলেন। তিনি হাততালি দিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে বলতে লাগলেন ঃ "বা খোকা ঘোরে, বা খোকা ঘোরে।"—এই না শুনে খোকা মহারাজ খুব জোরে জোরে ঘুরতে লাগলেন। খোকা মহারাজের বয়স তখন ৬০। ৬১ বৎসর হবে। মহাপুরুষ মহারাজের বয়স তাঁর থেকে আরো বেশি ছিল। যাঁরা এই দৃশ্য দূর থেকে দেখছিলেন, তাঁরা এই দুই মহাপুরুষের শিশুসুলভ খেলা দেখে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলেন।

খোকা মহারাজের চরিত্রের আর একটি দিক। একবার গরমের সময় তিনি বেলুড় মঠে আছেন। দোতলায় স্বামীজীর ঘরের পাশে পূর্ববারান্দায়, সন্ধ্যার কিছু পরে তিনি ইজিচেয়ারের ওপর গঙ্গার দিকে মুখ করে শুয়ে আছেন। একজন ব্রহ্মচারী হাত-পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছেন। খোকা মহারাজ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখন কি জোয়ার এল রে?"

ব্রহ্মচারী ঃ "হ্যাঁ, মহারাজ।"

খোকা মহারাজ ঃ "এই যে নৌকাগুলি জোয়ারে এগিয়ে যাচ্ছে—এইরকম সাধন-ভজন করে এগিয়ে যেতে হয়। সাধকজীবনেও এক এক সময় মনে জোয়ার আসে—সাধন-ভজন করার ইচ্ছা হয়। তখন লেগে-পড়ে সাধন-ভজন করতে হয়। আর দেখ, কিছুদিন তপস্যা ও পরিব্রাজক জীবনযাপন না করলে সন্ন্যাসজীবন পরিস্ফুট হয় না।"

খোকা মহারাজ রাঁচিতে এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছেন। সেখান থেকে রাঁচি আশ্রমে যান। তখন সেখানকার অধ্যক্ষ ছিলেন স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী (জিতেন মহারাজ)। রাঁচি আশ্রমটি বেশি দিন স্থাপিত হয়নি, তাই আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। কফি-টফি ওখানে কেউ খেতেন না, আর অতিথিদের

জন্য কোন ব্যবস্থাও ছিল না। খোকা মহারাজ এসেছেন। তিনি কফি খেতে খুব ভালবাসেন। তিনি বিকালে বরাবরই এক কাপ কফি খান। এখন কি করা যায়—ভেবে স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহা চিন্তায় পড়লেন। আশ্রমে একটি হিন্দুস্থানী জমাদারের ছেলে কাজ করত। আশ্রমের পাশে পাহাড়ের ওপর একজন অ্যাডভোকেটের বাড়ি ছিল। সেখানে ঐ ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম করত। কোন উপায় না দেখে একজন ব্রহ্মচারী ঐ অ্যাডভোকেটের বাড়ি থেকে কফি-পাউডার চেয়ে নিয়ে আসেন। স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী জানতে পেরে বললেন ঃ "তুমি শেষ পর্যন্ত ওদের বাড়ি থেকে কফি-পাউডার চেয়ে নিয়ে এলে! ওখানে ঐ জমাদারের ছেলেটি বাড়ির সব কাজকর্ম করে!" খোকা মহারাজ পাশের ঘরে শুয়ে ছিলেন। তিনি শুনতে পেয়ে বললেন ঃ "ও জিতেন, তোমাদের বেদান্ত কি শুধু বইয়ে লেখা থাকবে, ব্যবহারে আসবে না?" স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী আর কিছু না বলে চুপ করে রইলেন। তিনি খোকা মহারাজের ইঙ্গিতটি বুঝতে পারলেন।

রাঁচিতে আর একটি ঘটনা। আশ্রমে তখন বেশি ঘর ছিল না জিনিসপত্র রাখবার। আশ্রমবাসীরা প্রত্যেকের কাছে শীতের লেপকম্বল যা ছিল, সব তাঁদের বিছানার ওপর পেতে তার ওপর একটা চাদর পেতে দিতেন। তার ওপর তাঁরা শুতেন। খোকা মহারাজ রাঁচি গিয়েছেন। তিনি আশ্রমে ঢুকেই একজন ব্রহ্মচারীর নাম ধরে জোরে জোরে ডাকতে লাগলেন। ব্রহ্মচারী তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে এসে বললেন ঃ "আজ্ঞে মহারাজ, আসুন।" খোকা মহারাজ তাঁর ঘরে ঢুকেই ধুপ করে বিছানার ওপর শুয়ে পড়লেন। ব্রহ্মচারী তাঁর শোয়ার ব্যবস্থা করতে অন্য ঘরে গেলেন। ঘর ঠিক করে এসে দেখেন তিনি তখনও তাঁর বিছানায় শুয়ে আছেন। তিনি লজ্জা পেয়ে বললেন ঃ "মহারাজ, আপনার বিছানা ঠিক হয়ে গেছে। আপনি চলুন—সেখানে শোবেন।" খোকা মহারাজ বললেন ঃ "কেন? এই তো আমি বেশ শুয়ে আছি।"

ব্রহ্মচারী ঃ "মহারাজ, এটা আমার বিছানা—।"

খোকা মহারাজ ঃ "তুই এটায় শুসতো? তবে আমি শুলে দোষ কি?"

কোন রকম তাঁর ওঠার লক্ষণ না দেখে ব্রহ্মচারী বললেন ঃ "মহারাজ, অন্তত একটা চাদর পেতে দি, বিছানার ওপর।"

খোকা মহারাজ ঃ "কোন দরকার নেই।" তারপর কিছু সময় চুপ করে থেকে বললেন ঃ "হ্যাঁরে গঙ্গা, তুই আজকাল বড় রাজপুত্র হয়ে গেছিস, না!"

ব্রহ্মচারী ঃ "কেন, মহারাজ, ও কথা বলছেন?"

খোকা মহারাজ ঃ "না, তোর বিছানাটা নরম নরম লাগছে তাই।"

ব্রহ্মচারী ঃ "শীতের লেপ-কম্বল রাখবার জায়গা নেই, তাই বিছানায় সব পেতে রেখেছি।"

খোকা মহারাজ ঃ "তাই বল। ব্রহ্মচারীদের নরম বিছানায় শুতে নেই।"

খোকা মহারাজ মঠে আছেন। তিনি হুঁকোতে তামাক খেতেন। টিকে ধরাবার জন্য মোমবাতির দরকার হতো। তিনি ঠাকুরঘরের পোড়া মোমবাতির মোম জোগাড় করতেন। তারপর পেঁপে গাছের পাতা কেটে তার ডাঁটা নিয়ে তার মধ্যে সুতো সমেত গরম মোম ঢেলে দিয়ে মোমবাতি তৈরি করতেন। কেউ যদি বলতেন ঃ "মহারাজ, আপনি অত পরিশ্রম করে, মোমবাতি নিজে তৈরি না করে কোন ভক্তকে বললেই তো তাঁরা আনন্দের সঙ্গে দোকান থেকে আপনার জন্য অনেক ভাল মোমবাতি কিনে এনে দেবেন।" তিনি তার উত্তরে বলতেন ঃ "Waste not, want not. (অপব্যয় কোরো না; অভাবে পড়বে না।) ভক্তদের বুকের রক্ত জল করা টাকা নেওয়া উচিত নয়। আর যত কম নেওয়া যায় ভক্তদের কাছ থেকে, তত সাধুর পক্ষে ভাল।"

তরুণ ব্রহ্মচারীদের লক্ষ্য করে তিনি মাঝে মাঝে তাঁদের সাবধান করে দিয়ে বলতেন ঃ "দেখ, ভক্তদের কাছ থেকে কোন জিনিস নিবি না। আর নিজেদের ব্যবহারের জন্য জিনিসপত্র যত কম নিতে পারিস, তত ভাল। ভক্তরা যা কিছু জিনিসপত্র দেয়, সাধুদের জপ-ধ্যান থেকে তা কাটা যাবে। তারা যতই ভগবানের নাম করে দিক না কেন, সাধুর জপ-ধ্যান থেকে কিছু অংশ কাটা যাবে।"

খোকা মহারাজের উপদেশ

সঙ্কলক ঃ অবনীমোহন গুপ্ত

১। যাঁর মায়া সেই মহামায়া পশ্চাতে, মায়া ছুটে গেলে পর মহামায়া অন্তরে বাহিরে বিরাজমান।

২। সমুদ্রের অতলস্পর্শে জীবজন্তু থাকে। ভগবান তাহাদের দেখেন, মহামায়ার স্নেহমায়া সেখানেও বিস্তারিত। সকলে বুঝিতে পারে না, "চাঁদা মামা সকলের মামা।" ভগবান কারোর হাতে ধরা-বাঁধা নয়, যে বিশ্বাস করে ডাকিবে তার। বিশ্বাসে মিলায় শীঘ্র।

৩। মানুষ ভগবানের দর্শন পায়, যদি স্বার্থ ত্যাগ করে তাঁকে চিন্তা করে ও ডাকে। শ্রীশ্রীঠাকুর আমাকে বলিয়াছিলেন, "ভগবানকে মানুষ এইরকম দেখিতে পায় যেমন দুই জনে বসিয়া গল্প করিতেছে, দুই জনে বেড়াইতেছে। ঠিক ঠিক নিঃস্বার্থভাবে ডাকা চাই।

৪। ভক্ত ভগবানের নাম দিয়াছে 'দীননাথ' 'পতিতপাবন' ইত্যাদি। যে বাসনা শূন্য হইয়া তাঁহাকে ডাকে সেই তাঁহাকে লাভ করে।

৫। ভগবানকে মা বাপের মতো ভালবাসবে।

৬। গুরু এক। শিক্ষা সকলের কাছেই লইতে পার।

৭। তোমাদের সঙ্গে আমার সম্বন্ধের কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছ। এ সম্বন্ধ একদিনের নয়, ইহকাল পরকালের জন্য—বরাবরের জন্য। সে বিষয়ে কোন চিন্তা বা সন্দেহ রাখিবে না। ভগবানের দিকে মন রাখিয়া চলিবে। দুঃখ কষ্ট যাহা হয় কিছুতেই ভয় পাইবে না। স্রোতের জল নদীতে একটানা যায়, কিন্তু

মাঝে মাঝে পাক খায়। টানের মুখে ঘুরপাক আবার সোজা হইয়া চলে। সেইরূপ ভগবানের উপর মন থাকিলে ঘুরপাকেতে কিছুই করিতে পারিবে না। দু-দিন হয়তো মন এদিক ওদিক যাইবে আবার কিছুদিন পর ভগবানের দিকে আপনিই চলিয়া যাইবে।

৮। তোমরা আমার সন্তান ও ছেলে। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছায় আমার নিকট হইতে নাম পাইয়াছ। খুব বিশ্বাস রাখ—তিনি আমার আমি তাঁর। তাঁকে খুব আপনার জানিবে। ভয় বা চিন্তার কোন কারণ নাই।

৯। মন তোমার, বিবেকবুদ্ধি তোমার, বিচার তুমি করিবে। আমি ভাত খাইলে তোমার পেট ভরিবে না নিশ্চয় জানিবে।

১০। মনে কর কাহারও পিতা খরচপত্রাদি করিয়া ছেলেকে বিদেশে লেখাপাড়া করিতে পাঠাইয়াছেন। সে ছেলে যদি লেখাপড়া না করে, তাহা হইলে সে দোষ কি পিতার না ছেলের? অনেকে আমার নিকট দীক্ষা চাহিয়াছে ও পাইয়াছে। কিন্তু সেই মতো তাহারা যদি কাজ না করে, তবে সে দোষ কাহার?

১১। যে যেরূপ পরিশ্রম করিবে সেইরূপ ফল পাইবে। গাজীপুরের পওহারী বাবা বলিতেন, "যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি।"

১২। "নামেতে কাল পাশ কাটে।" যে লোক সকলরকম কামনাশূন্য হইয়া একমনে ভগবানের নাম উচ্চারণ করে তার কোনরকম মনের বন্ধন থাকে না। মন থেকে সকল বাসনা-কামনা চিরদিনের মতো তাড়াইতে হইবে, তবে মন স্থির হয়। বিচার-বুদ্ধি যার যার নিজের কাছে।

১৩। "নামেতে কাল পাশ কাটে।" সামান্য বিষয় মন থেকে চলে যায়; ঠাকুরের নাম হাতে করুক বা মালায় করুক কি মনে মনে করুক যেমন করেই করুক না, তাহাতে উপকার ও শান্তি। গঙ্গাজলে মড়া ও কত কি ভাসিয়া যায়, মানুষ সেই জল স্পর্শ করিয়া নিজেকে পবিত্র মনে করে। নামের জোরে মানুষের মন দেহ শুদ্ধ হয়, আগুন জেনেই ছোঁও আর না জেনেই ছোঁও হাত

পুড়িবে, সেইরকম নামের জোর—ভালভাবে করুক আর মন্দভাবে করুক, নামের এক মাহাত্ম্য আছে।

১৪। তাঁর নামে অমঙ্গল মঙ্গলে পূর্ণ হয়, অশান্তি থেকে শান্তি আসে। শুধু বিশ্বাস চাই। তারপর ভাল মন্দ তিনি যেমন চালাইবেন তাঁর হাত। ভগবানের নাম করিয়া যাইবে। তাহাতে সমস্ত অশান্তি শান্তিতে পূর্ণ হইবে। যেখানে যত মহাপুরুষ সিদ্ধপুরুষ হইয়াছেন নামের উপর তাঁহাদের কত জোর দেখিবে। শ্রীশ্রীঠাকুরও নামের উপর খুব জোর দিয়া বলিতেন—তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, নামেতে সব ভাল হইবে।

১৫। মানুষের মন সর্বদাই চঞ্চল থাকে। ভগবানের নিকট কেঁদে আন্তরিক প্রার্থনা করিতে হয়, যাহাতে মনে শান্তি আসে। চিরকাল মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিতে হয় না, এইটুকু জানিয়া রাখিবে যে—

"যখন যে রূপে মা গো রাখিবে আমারে
সেই সে মঙ্গল যদি না ভুলি তোমারে।"

১৬। শ্রীশ্রীঠাকুরের উপর নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে তিনিই সকল অভাব দূর করিয়া দেন।

১৭। সৎ বিষয়ে যত আলোচনা হয় ততই ভাল। সৎচিন্তা ও সৎচর্চা যার যত থাকে সেই লোক তত সুখী। সকল সময়ে সে মনের আনন্দে থাকে।

১৮। খালি শুনলে কি হবে! করব বলে (ফেলে) রাখলেই মুশকিল, তার আর হয় না। একজন সমুদ্র স্নানে গিয়েছিল, তা পারে দাঁড়িয়ে বললে, ঢেউটা গেলেই স্নান করে নেব। তা সমুদ্রের ঢেউও গেল না, তার স্নানও হলো না।

১৯। সংসারে নানা গোল, ঝগড়াঝাটি ইত্যাদি। তা ঝগড়া না করলেই হলো। বলছো কি করে না করবে? চুপ করে থাকবে। বোবার শত্রু নেই।

২০। কোন প্রকার কাজকর্ম করিতে গেলে লোকে নানাপ্রকার দুঃখ-কষ্ট পায়। সবরকম কষ্ট সহ্য করিয়া যে লাগিয়া থাকিতে পারে, সেই কাজের মানুষ হইয়া যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—"শ ষ স—তারপর হ। যে সয় সেই রয়।"

২১। শুধু যদি ভগবানের দিকে মন থাকে তবে সমস্ত মায়া মোহ মন থেকে দূর হইয়া যায়। মন লইয়া সব ব্যাপার ঘটে। যদি কাহারো মনে রাগ থাকে, সদাসর্বদাই সেই মানুষ সকলের উপর রাগ করিয়া থাকে। মনে মনে যদি কেহ স্ত্রীলোকের কথা ভাবে, দিনরাত ঐসব চিন্তাতে তার মন মায়ামোহে আচ্ছন্ন থাকে। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—স্ত্রীলোককে যদি দেখতে হয় তবে শুধু তার পা দেখে মনে মনে মা বলে প্রণাম করবে। তাতে কামরিপু চলে যাবে। যে মন কোনরকম আসক্তিতে পূর্ণ, সে মন দিয়ে ভগবানকে চিন্তা করা কষ্টকর ব্যাপার। যে সরিষা দিয়ে ভূত ছাড়াবে, সেই সরিষার মধ্যেই যে ভূত ঢুকে বসে আছে।

এখানে মনকে সরিষা বলা হয়েছে। গল্পে শুনেছিলাম, যদি কাহাকেও ভূতে পায় রোজারা (ওঝারা) আসিয়া সরিষা লইয়া মন্ত্র পড়ে, অবশেষে সেই সরিষা ভূতে পাওয়া মানুষকে ছুঁড়ে মারে।

২২। মনের অবস্থা পরিবর্তন করিতে হইলে ঠাকুরের সম্বন্ধে বই পড়িতে হয় জপ-ধ্যান করিতে হয় এবং অন্যলোকের সঙ্গে ঐ বিষয়ে কথাবার্তা কহিতে হয়, এই তো সাধারণ নিয়ম। পাখি পড়ার মতো পড়িলে হইবে না; মনে কর তোমার আত্মীয় তোমায় পত্র লিখেছে, সে সময় শুধু কি চিঠি পড়বে, না তার চেহারা আর কত কি মনে আসবে। এখন ভেবে দেখ।

২৩। গভীর চিন্তা সেই গভীর ধ্যান; মন সেই দিকে রাখা। সময় সময় মন কতদিকে ছুটিয়া যায়, সেই সময় সাবধান থাকিতে হয়। গৃহস্থ বাড়িতে যদি চোর আসে, আর গৃহস্থ যদি জাগিয়া থাকে, চোর সেখানে কতক্ষণ থাকে?

২৪। যে লোক যেভাবে থাকিয়া জপ করুক, মনে শান্তি লইয়া দরকার। সোজাভাবে বসুক বা সাধারণভাবে বসুক কোন আপত্তি নাই। লোক দেখানো জপ-ধ্যান কিছু আবশ্যক নাই। যখন সোজা বসিয়া কষ্ট বোধ হইবে তখন অন্যভাবে বসিলে কোন আপত্তি নাই।

২৫। যখন শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম নিয়েছ ভাবনা কি? কল্পনা করিয়া নানাপ্রকার

বাজে চিন্তার আবশ্যক নাই। এই জানিয়া রাখ তিনি আমার হৃদয়ে—আমি তাঁর আশ্রিত।

২৬। ভগবানের কৃপায় মঙ্গল হইবে—বাজে চিন্তা রাখিবে না। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় চিন্তা করিবে—মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন।

২৭। একটা কথায় বলে—

"গুরু কৃষ্ণ ইষ্ট তিনের দয়া হয়—
একের দয়া বিনে জীব ছারে খারে যায়।"

অর্থাৎ সকল সময় মন স্থির থাকে না। এর উপায় সদসৎ-বিচার দ্বারা মনে শান্তি আনিতে হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর বলিতেন—উত্তর দিকে যে মানুষ চলে, দক্ষিণ দিক তার কাছ থেকে দূর হয়ে যায়। সেইরকম ভগবানের রাস্তায় যে চলে শান্তি তার নিকটবর্তী হয়—অশান্তি দূরে চলে যায়।

২৮। সংসারের চাপে কিছুমাত্র ভয় খাইবে না। জন্ম মৃত্যু বিবাহ কখন কি হয় ঠিক নাই। বিশ্বাসী ভক্তের হৃদয়—তার কি কোনরকমে মন টলে?

২৯। এ সংসার সুখ দুঃখ জড়িত পরীক্ষার স্থল, অশান্তি মনে স্থান দিবে না; হৃদয়ে তিনি আছেন, বুক খালি হবে কেন? খুব বিশ্বাসের সহিত তাঁকে স্মরণ করিবে। এখন রামের বনবাস, আবার রাম অযোধ্যায় আসিবেন।

৩০। এ শরীর থাক আর যাক শ্রীশ্রীঠাকুর ও মা সর্বদাই তোমাদের দেখছেন ও দেখবেন।

(স্বামী সুবোধানন্দের জীবনী ঃ সংকলক—অবনীমোহন গুপ্ত)

খোকা মহারাজের স্মৃতি

স্বামী অপূর্বানন্দ

মঠে রয়েছি, আনন্দে কাজকর্ম ও জপ-ধ্যান করি, শ্রীশ্রীমায়ের চিতাস্থানে রোজ প্রণাম করি। ঠাকুরঘরে গেলেও শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন হয়। শ্রীশ্রীমা যেন সমগ্র অন্তর জুড়ে রয়েছেন। মহাপুরুষ মহারাজ, খোকা মহারাজ প্রভৃতি সকলেও শ্রীশ্রীমায়ের শরীর যেখানে দাহ করা হয়েছিল সে স্থানে রোজ প্রণাম করতেন। যাত্রীরাও। শ্রীশ্রীমায়ের চিতাটি বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছিল, সেখানে রোজ পূজা হতো, ধূপ-ধুনা দেওয়া হতো। শ্রীশ্রীমায়ের চিতার ওপর গঙ্গার দিকে মুখ করে একটি মন্দির হবার কথা চলছিল। তখন পরেশ মহারাজ মঠের কিছু কিছু কাজকর্ম দেখাশুনা করতেন।

তিনি একদিন আমায় ডেকে বললেন ঃ "দেখুন, খোকা মহারাজের বয়স হয়েছে, শরীরও তত ভাল নয়। লোকাভাবে তাঁর সেবার কোন ব্যবস্থা করতে পারছি না, অথচ তাঁর সেবার খুব দরকার। আপনি যদি সন্ধ্যার পরে তাঁর গা-হাত-পা একটু টিপে দেন তো ভাল হয়। আর মাঝে মাঝে তাঁর তামাকটা সেজে, কাপড় পরিষ্কার করে দেবেন।" আমি সানন্দে রাজি হয়ে বললাম ঃ "ঠাকুরের একজন পার্ষদের সেবা করা তো মহাভাগ্যের কথা।" আমার কথা শুনে তিনি খুশি হয়ে আমাকে খোকা মহারাজের কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর সেবার ব্যবস্থা করে দিলেন। পরদিন থেকে আমি অন্যান্য কাজের ফাঁকে ফাঁকে খোকা মহারাজের তামাক সেজে ও তাঁর কাপড় পরিষ্কার করে দিতাম এবং রোজ সন্ধ্যার পরে খানিকক্ষণ তাঁর গা-হাত-পা টিপে দিতে আরম্ভ করলাম।

তিনি কখনো কখনো ঠাকুরের প্রসঙ্গ করতেন। একদিন পা টিপতে টিপতে জিজ্ঞাসা করি ঃ "মহারাজ, আপনি আজকাল ঠাকুরকে দেখতে পান কি?" তিনি খানিকক্ষণ পরে বললেন ঃ "আজকাল শ্রীঠাকুরকে বড় একটা দেখতে

পাই না, মাঝে মাঝে শ্রীমাকে দেখতে পাই। ...হরিদ্বারে (হৃষীকেশে) যখন তপস্যা করতাম তখন স্বপ্নে শ্রীঠাকুর দেখা দিয়েছিলেন। আমি মাসাবধিকাল অত্যাগী জ্বরে ভুগে ভুগে অস্থিচর্মসার ও খুব দুর্বল হয়ে পড়ি। এত দুর্বল যে নিজের শক্তিতে কমণ্ডলু তুলে একটু জল খেতেও পারছিলাম না। তাই শ্রীঠাকুরের ওপর খুব অভিমান হয়েছিল, তিনি একটু দেখছেন না। কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে ঠাকুর দেখা দিয়ে বললেন, 'খোকা, তুই কি চাস? লোকজন না টাকাকড়ি?' আমি বললুম, 'ওসব কিছুই চাই না। শুধু আপনাকে চাই। শরীর থাকলে অসুখ-বিসুখ হবেই; কিন্তু আপনাকে যেন না ভুলি।' এই বলতেই ঠাকুর অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। পরদিন হতে একজন সাধু আমায় সেবাযত্ন করতে লাগলেন। তাঁকে বারণ করলেও তিনি শুনতেন না। আমি মনে করলুম শ্রীঠাকুরই সাধুটিকে পাঠিয়েছেন।" এই বলতে বলতে তিনি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলেন। আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

এইভাবে পূজনীয় খোকা মহারাজের সামান্য সেবা কিছুদিন করেছিলাম। তিনি সেবা নিতে চাইতেন না। খুব সাদাসিধা তাঁর জীবন। ওপরে খালি পায়েই থাকতেন। নিচে কোন কাজকর্মে নামলে বা বাইরে গেলে চটিজুতা ব্যবহার করতেন। তিনি মঠের সাধুদের অসুখ-বিসুখে খুব খোঁজখবর নিতেন ও নানাভাবে যত্ন করতেন, ভক্তদের ঘরে ঘরে গিয়ে দেখাশুনা করতেন। কলকাতার ভক্তদের অসুখ-বিসুখে কলকাতায় পায়ে হেঁটে দিনের পর দিন রোগীদের বাড়িতে গিয়ে দেখাশুনা করতেন। তিনি সাঁতার জানতেন না—সেজন্য হাঁটুজলে নেমে গঙ্গাস্নান সমাপ্ত করতেন। কলকাতার ভক্তদের খোঁজখবর নিতে হলে তিনি হেঁটে হাওড়ার পুল পেরিয়ে কলকাতায় যেতেন, অথবা হেঁটে শালকিয়া পর্যন্ত গিয়ে স্টিমারে গঙ্গা পেরিয়ে বড়বাজারে নেমে হেঁটে ভক্তদের বাড়ি বাড়ি যেতেন। তিনি সকলেরই দরদী ছিলেন। সকলেই তাঁকে খুব ভালবাসত ও ভক্তি করত। মঠের সব কাজকর্মে তিনি অগ্রণী ছিলেন। ঐসময় পূজনীয় খোকা মহারাজ থাকতেন মঠবাড়ির ওপর তলায় স্বামীজী ও রাজা মহারাজের ঘরের মাঝের ছোট ঘরটিতে—মহাপুরুষজীর ঘরে

যেতে ডানদিকে ছিল খোকা মহারাজের ঘর। আবার যখন স্বামীজীর মন্দির বা অন্যান্য কাজে পূজনীয় হরিপ্রসন্ন মহারাজ মঠে আসতেন, খোকা মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ঘরটি হরিপ্রসন্ন মহারাজের জন্য ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র চলে যেতেন বা কলকাতায় বলরাম মন্দিরে কয়েকদিন কাটিয়ে আসতেন। পূজনীয় খোকা মহারাজের জীবন অনেক দিক থেকে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল।

প্রবীণদের মুখে শুনেছি, স্বামীজী যখন গম্ভীর হয়ে যেতেন তখন তাঁর কাছে রাজা মহারাজ, শরৎ মহারাজ প্রভৃতি কেউ যেতে সাহস করতেন না। তখন স্বামীজীর গাম্ভীর্য ভাঙার জন্য খোকা মহারাজকে তাঁর কাছে পাঠানো হতো। খোকা মহারাজ নানা রকম ফষ্টিনষ্টি করে স্বামীজীর মনকে সাধারণ ভূমিতে আনতেন। স্বামীজী একসময়ে তাঁর সেবাতে তুষ্ট হয়ে খোকা মহারাজকে বর দিতে চেয়েছিলেন। তা শুনে খোকা মহারাজ স্বামীজীর কাছে বর নিতে উপস্থিত হয়ে করজোড়ে বললেন ঃ "বর দেবেন তো এই বর দিন যাতে সকাল-বিকাল চা খেতে পাই।" স্বামীজী খোকা মহারাজের প্রার্থনা শুনে হো হো করে হেসে বলেছিলেন ঃ "আচ্ছা, তোর তা-ই হবে। চা দুবেলাই পাবি।" ঠাকুরের শিষ্যের যোগ্য প্রার্থনাই বটে। ব্রহ্মজ্ঞান, ভক্তি-মুক্তি কিছুই চাইলেন না; কারণ ঠাকুরের দয়াতে ব্রহ্মজ্ঞান তো তাঁর শিষ্যদের 'করামলকবৎ' সহজলভ্য।

খোকা মহারাজের চায়ের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। আমরা শুনেছি ঠাকুরের যখন গলরোগের প্রথম সূত্রপাত হয় তখন খোকা মহারাজ ঠাকুরকে ঐ রোগের প্রতিকারকল্পে একটু একটু চা খেতে বলেছিলেন। ঠাকুরও প্রথমটায় তাতে রাজি হয়ে রাখাল মহারাজের সঙ্গে পরামর্শ করতে রাখাল মহারাজ বলেছিলেন ঃ "ও কি আপনার সহ্য হবে? চা যে গরম জিনিস।" বালকস্বভাব ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে রাখালের কথা মেনে নিলেন এবং খোকাকে বললেন ঃ "না রে, সইল না।" হাসি-তামাশাতে চা খাওয়ার পর্ব ওখানেই সমাপ্ত হয়ে গেল।

ঠাকুরের সন্তানদের দীক্ষা দেওয়া সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমা একসময় বলেছিলেন ঃ "কেন, খোকা মন্ত্র দেয় না কেন? যে কদিন তাঁর ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।" শ্রীশ্রীমায়ের এ খোলা আদেশ বোধহয় ১৯১০।১২ খ্রিস্টাব্দের ঘটনা।

শ্রীশ্রীমায়ের ঐ আদেশ পেয়ে সম্ভবত ১৯১৫।১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে খোকা মহারাজ দুই-একজন প্রার্থীকে দীক্ষা দিতে আরম্ভ করেছিলেন। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তিনি বলতেন ঃ "আমি দীক্ষার কি জানি, আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল মহারাজ কিংবা মায়ের কাছে কিংবা শরৎ মহারাজের কাছে নিও—তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উচ্চ।" কেউ যদি ব্যাকুলভাবে ধরত, তিনি সোজাসুজি বলতেন ঃ "বাবা, আমি মূর্খ, কিছু জানি না, মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হয় না।"

প্রথম জীবনে খোকা মহারাজ এত বৈরাগ্যপ্রবণ ছিলেন যে, ভক্তদের সঙ্গে বিশেষ করে মেয়ে-ভক্তদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দূরে থাকুক, তাদের দেখলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চলে যেতেন। স্বামীজী তা লক্ষ্য করে তাঁকে বলেছিলেন ঃ "খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসে, তুমি বলবে। তোমরাও যদি এরূপ এড়িয়ে চল, তবে তারা কার কাছে যাবে? তারা জগদম্বার রূপ, তাদের সঙ্গে মা ও বোনের মতো মিশবে।" তারপর হতে মেয়েদের কাছে তিনি ঠাকুরের কথা বলতেন। খোকা মহারাজ বিভিন্ন সময়ে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, ছোটনাগপুর, যুক্তপ্রদেশ এবং শেষ জীবনে বিশেষ করে পূর্ববঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশের) নানাস্থানে গিয়ে ঠাকুরের নাম ও বাণী প্রচার করে বহু লোকের আধ্যাত্মিক কল্যাণ সাধন করেছেন। মহাপুরুষজীর আদেশে পূর্ববঙ্গে ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়। সময় সময় এমন হতো যে একটু বেড়াবার সময়ও পেতেন না। সকাল হতে রাত দশটা-এগারটা পর্যন্ত ধর্মপিপাসু নরনারীদের সঙ্গে অবিরাম ধর্মালোচনা এবং কখনও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রভৃতি পাঠ চলত।

পূর্ববঙ্গেই তাঁর বহুমূত্র রোগ প্রথম ধরা পড়ে। অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় অনেকটা উপকার দেখা যায়। মঠে এসে তিনি আমাশয়ে আক্রান্ত হন। তখন তিনি অন্য চিকিৎসা ছেড়ে শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের কবিরাজী চিকিৎসা আরম্ভ করেন। কবিরাজ মহাশয় বেলপোড়া, গলা ভাত ও গাঁদাল পাতার ঝোল, কাঁচকলা সিদ্ধ ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। মহাপুরুষজীর আদেশে আমি

খোকা মহারাজের পথ্য রান্না করে দিতে লাগলাম। তাঁর অভ্যাস ছিল, গঙ্গাস্নান করে এসে সঙ্গে সঙ্গে খেতে বসতেন। দেরি হলে 'পিত্তি পড়ে' বলতেন। খাবার ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি গঙ্গাস্নান করে ভিজে গামছা পরে ভিজে কাপড় কাঁধে করে ওপরে আসতেন এবং নিজের ঘরে যাবার পূর্বেই মহাপুরুষজীর ঘরে ঢুকে তাঁর সামনে মেঝেতে বসে দুহাত পেতে প্রসাদ নিতেন। মহাপুরুষজী নিজের থালা থেকে তুলে খোকা মহারাজের হাতে ঠাকুরের প্রসাদ দিতেন, তা-ই নিয়ে খেতে খেতে তিনি নিজের ঘরে আসতেন। মহাপুরুষজীর কাছ থেকে খোকা মহারাজের প্রসাদ নেবার দৃশ্যটি বড়ই সুন্দর। ঠিক যেমন ছোট ছেলেরা বাবা-মায়ের কাছ থেকে হাত পেতে খাবার নেয়।

কবিরাজী চিকিৎসায় থাকতে থাকতে খোকা মহারাজের আমাশয় পুনরায় বেড়ে গেল এবং ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের রথযাত্রার কিছুদিন পরে তিনি চিকিৎসা ও বায়ু পরিবর্তনের জন্য ভুবনেশ্বর মঠে গেলেন।

১৯৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দে ভুবনেশ্বর থেকে কতকটা ভাল স্বাস্থ্য নিয়ে খোকা মহারাজ মঠে ফিরে এলেন। সকলেই তাঁকে পুনরায় নীরোগ অবস্থায় পেয়ে বিশেষ আনন্দিত। মহাপুরুষ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সেবক ও পৃথক রান্নার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রচারকার্যে পূর্ববঙ্গে যাওয়াও বন্ধ হলো। দীক্ষাদিও কদাচিৎ। তাঁকে মহাপুরুষ মহারাজের চিকিৎসকের অধীনেই রাখা হলো। নিয়মিত দুবেলা বেড়ান। এত ব্যবস্থা সত্ত্বেও কিছুদিন পরে তিনি পুনরায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সেই পুরাতন রক্ত-আমাশয় রোগ দেখা দিল। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের পরামর্শ অনুসারে তাঁকে স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য সেবকসহ জামতাড়া আশ্রমে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। সেখানে জল-হাওয়া ভাল, কিন্তু ভাল চিকিৎসাদির কোন ব্যবস্থা ছিল না। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর রোগ ভীষণ আকার ধারণ করায় জীবন সংশয় দেখা গেল। খোকা মহারাজ কিন্তু নির্বিকার—আনন্দে ভরপুর। তিনি বলেছিলেন যে, তিনি গভীর রাত্রে ঠাকুরের দর্শন পেলেন এবং নিজেকে নীরোগ মনে করলেন। পরদিন হতে খোকা মহারাজের রক্ত-আমাশয় ধীরে ধীরে সেরে গেল, কিন্তু আর এক নতুন উপসর্গ দেখা

দিল। বিকালের দিকে ঘুসঘুসে জ্বর প্রায়ই হতে লাগল। বিকাল হতেই শরীরটা একটু ভার ভার বোধ করেন। সন্ধ্যায় কোন কোন দিন ১০০ ডিগ্রি জ্বর হয়। রাত্রে জ্বর ছেড়ে যায়। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার দেখে বললেন ঃ "ও কিছু নয়, শীঘ্রই সেরে যাবে।" ঔষধ দিলেন, খাওয়া-দাওয়ার নিয়ম করলেন, কিন্তু জ্বর যেমন ছিল তেমনি রয়ে গেল। জ্বরের ধারাটা সন্দেহজনক হতে ডাক্তারবাবু একদিন হতাশ হয়ে বললেন ঃ "আমি তো কিছু করতে পাচ্ছিনে, এঁকে কলকাতায় নিয়ে গেলে ভাল হয়।" খোকা মহারাজকে কলকাতায় আনা হলো। কিন্তু জ্বরের বিরাম হচ্ছিল না। জ্বর বরং বাড়তে লাগল। সারারাত তিনি জ্বরে ছটফট করেন। শীতকাল, তবু রাত্রে ঘাম হয়। কলকাতায় জ্বরের উপশম হচ্ছিল না দেখে খোলামেলা জায়গায়—গঙ্গাতীরে, বেলুড় মঠে তাঁকে আনা স্থির হলো। তিনিও খুশি হলেন—মহাপুরুষ মহারাজও। তিনি তাঁর ঘরে ফিরে এলেন। চিকিৎসা চলছে—কিন্তু জ্বরের গতি ও বেগ সমভাবেই বেড়ে চলেছিল।

বেলুড় মঠ থেকে ৫।২।১৯৩১ তারিখে লেখা তাঁর একখানি চিঠি হতে জানা যায়, তিনি লিখছেন ঃ "কল্যাণীয়া মায়ী, ...আমার শরীর পূর্বের ন্যায়ই আছে—প্রত্যহই জ্বর হচ্ছে। শ্রীঠাকুর আর কতদিন এই শরীর দ্বারা কাজ করাইবেন তিনিই জানেন। শরীর থাক বা যাক আমার কিছুতেই আপত্তি নাই।" কিন্তু এর কিছুদিন পরে জ্বরের সঙ্গে গলা দিয়ে যখন সামান্য সামান্য রক্ত পড়তে আরম্ভ হলো, তখন ডাক্তাররা সকলে একমত হয়ে 'ক্ষয়রোগ' ঘোষণা করলেন। রোগীকেও আকারে-ইঙ্গিতে তা জানানো হলো এবং তাঁকে যতটা সম্ভব পৃথক রাখার ব্যবস্থা হলো। ডাক্তাররা তাঁর স্থান পরিবর্তনের পরামর্শ দিলেন। মহাপুরুষজীকে রোজই খোকা মহারাজের সব খবর দেওয়া হতো। তিনি চিকিৎসাদির আরও ভাল ব্যবস্থা করতে বললেন। কিন্তু খোকা মহারাজের যে এমন কঠিন অসুখ হয়েছে তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে চাননি। কেউ ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন ঃ "খোকার এমন কি আর হয়েছে, এখন তো ক্রমে ভালর দিকেই যাচ্ছে। তাঁর কাজের জন্য তিনি যতদিন

রাখবেন, ততদিন থাকতেই হবে—এই পাকা কথা। আমি এই পর্যন্ত জানি, যে যাই বলুক। খোকারও তাই, আমারও তাই। আমরা বাবা, বৈদ্যির কথা বিশ্বাস করি না। 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে?' তিনি যতক্ষণ রক্ষা করবেন ততক্ষণ খোকার কেউ কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"

মহাপুরুষ মহারাজ মাঝে মাঝে প্রায়ই খোকা মহারাজের খোঁজখবর নিতে আসেন। একদিন বিকালে তিনি নিজের ঘর থেকে বের হয়ে খোকা মহারাজকে ঘরে দেখতে না পেয়ে তাঁর ঘরের পাশ দিয়ে স্বামীজীর বারান্দায় এলেন। খোকা মহারাজ গঙ্গার ধারের বারান্দাতে একটা ইজিচেয়ারে অর্ধশায়িত অবস্থায় 'অধ্যাত্ম রামায়ণ' পড়ছিলেন। মহাপুরুষজীকে দেখেই তিনি একটু চঞ্চল হলেন। মহাপুরুষজী জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি পড়ছ, খোকা মহারাজ?" খোকা মহারাজ বই বন্ধ করে বললেন ঃ "অধ্যাত্ম রামায়ণ পড়ছি, একটা সৎ চিন্তা নিয়ে থাকা।" মহাপুরুষজী খুশি হয়ে বললেন ঃ "বেশ, বেশ।" এবং বেড়ানো শেষ করে নিজের ঘরে ফিরে গেলেন।

খোকা মহারাজ এত বড় অসুখ সত্ত্বেও খুব আনন্দে ছিলেন এবং দিনে দিনে যেন অন্তরে ডুবে যেতে লাগলেন। তাঁর নানা অলৌকিক দর্শনাদি হতে লাগল। তিনি নিজ দর্শনাদি সম্বন্ধে কদাচিৎ বলতেন। একদিন বললেন ঃ "সেদিন ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছিলুম, দেহটা ছেড়ে গেছি। রাখাল মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ, যোগীন মহারাজ—এঁদের সব দেখলুম। কেবল স্বামীজীকে দেখলুম না। ওঁরা বললেন—'বসো, বসো।' আমি বললুম—'না, আগে বল স্বামীজী কোথায়?' ওঁরা বললেন—'তিনি এখানে কোথায়? তিনি যে অনেক দূরে, তিনি ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে আছেন।' 'তা হোক অনেক দূরে, আমি চললুম তাঁর কাছে'—এই বলে রওনা হলুম। এর মধ্যে ঘুম ভেঙে গেল। সেখানে দেখলুম, কেবল আনন্দ। আনন্দনগরে তাঁরা বাস করছেন। মহাআনন্দে আছেন সব। সেখান থেকে আর আসতে ইচ্ছা হয় না। যত কষ্ট এখানে—এই পৃথিবীতে।" অবশ্য এই কষ্টবোধ তাঁর অতি অল্পই ছিল। তিনি বলতেন ঃ "তাঁর কথা যখন স্মরণ করি তখন সব দেহযন্ত্রণা ভুলে যাই।" আর স্মরণ-

মনন অবিরাম চলত। সেই সময় তাঁর কাছে নিয়মিতভাবে উপনিষদ ও পুরাণাদি পাঠ করা হতো।

ক্ষয়রোগ বেড়ে চলেছিল। বেলুড় মঠ থেকে ১৮।৪।১৯৩১ তারিখে তিনি জনৈকা ভক্তকে লিখছেন ঃ "হঠাৎ গত শনিবার হইতে আমার গলা দিয়া রক্ত পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। এই কয়েকদিনে প্রায় একপোয়া-দেড়পোয়া রক্ত পড়িয়াছে। তাই শরীর দুর্ব্বল। ...অদ্য অনেকটা ভাল, চিন্তার কোন কারণ নাই।"

খোকা মহারাজের ক্ষয়রোগ বেশ বেড়ে যাওয়াতে ডাক্তার তাঁকে অবিলম্বে স্থানান্তরিত করতে বললেন। অমন একটি রোগীকে সকলের সঙ্গে রাখা মোটেই নিরাপদ নয়—মঠ-কর্তৃপক্ষের তা গভীর চিন্তার বিষয় হয়েছিল। রোগীকে স্থানান্তরিত করার প্রধান অন্তরায় হলো যে, রোগী বা মহাপুরুষ মহারাজ কেউই ভাবতে রাজি নন যে অসুখ এতটা গড়িয়েছে (খোকা মহারাজের অন্য চিঠিতে তার আংশিক পরিচয় পাওয়া যায়)। অগত্যা ডাক্তাররা যখন খোকা মহারাজের অসুখ ও স্থানান্তরের বিষয় মহাপুরুষজীকে সরাসরি জানালেন, তখন তিনি যেন একেবারে ভেঙে পড়লেন। খুব উত্তেজিত হয়ে বললেন ঃ "এ্যাঁ, বলে কি? না, অতদূর নয়! খোকার অসুখ অতটা এগিয়েছে?" এই কটি কথার ভিতর এতটা আবেগ প্রকাশিত হয়েছিল যে, তা প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্যের হৃদয়ঙ্গম করাও দুঃসাধ্য। তিনি একেবারে চুপ করে গম্ভীর হয়ে গেলেন। খোকা মহারাজও মহাপুরুষজীকে ছেড়ে অন্যত্র যাবার কথা ভাবতেই পারেন না। মহাপুরুষজীর মনের অবস্থাও কতকটা তা-ই ছিল। বেলুড় মঠ হতে ১৫।৫।১৯৩১ তারিখে লেখা খোকা মহারাজের চিঠিতে তার একটু আভাস পাওয়া যায় ঃ "...গত শনিবার বিকালবেলা জোরে কাশিতে পুনরায় গলা দিয়া রক্ত পড়া আরম্ভ হলো। ...কিন্তু জ্বর (রোজ) হয় এবং পরে ৯৯ ডিগ্রি পর্যন্ত নামে।"

ডাক্তারদের নির্দেশমতো এর কয়েকদিন পরেই খোকা মহারাজকে তখনকার দিনের অফিস ও লাইব্রেরি বিল্ডিং-এর ওপরে গঙ্গার ধারের প্রশস্ত ও উন্মুক্ত ঘরে আনা হলো। প্রতিদিন সকালে খোকা মহারাজের শারীরিক অবস্থা

মহাপুরুষজীকে জানানো হতো। সকালের দিকে প্রায়ই খোকা মহারাজের জ্বর থাকত না। ওখানে সম্পূর্ণ বিশ্রাম। সর্বক্ষণ শুয়ে থাকা। ঐ অবস্থাতে খোকা মহারাজের রক্ত পড়াটা কয়েকদিন বন্ধ ছিল, কিন্তু রোজ বিকালে জ্বর হতো। এইভাবে সাত-আট দিন থাকার পরে একদিন দুপুরবেলা সেবকেরা খোকা মহারাজকে শুইয়ে অন্য কাজে গিয়েছে, এর মধ্যে এক অচিন্তনীয় ব্যাপার ঘটে গেল। দুপুরবেলা সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গিয়েছে, মঠবাড়ি নীরব ও নিঝুম। মহাপুরুষজী তাঁর ঘরে বসে খাওয়া-দাওয়ার পর তামাক খাচ্ছেন। আমি মহাপুরুষজীর কাজকর্ম করছিলাম। নীলকণ্ঠ মহারাজ নিচের বারান্দায় একা বসেছিলেন—এমন সময় তিনি দেখেন যে খোকা মহারাজ এক রকম খালি গায়ে চটি-জুতা পায়ে লাঠিটি হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে মঠবাড়িতে এসে হাজির। খোকা মহারাজের বিছানা ছেড়ে উঠবার কথা নয়। কয়েকদিন মহাপুরুষজীকে দেখতে পাননি, তাই তিনি দুপুরবেলা একা কাউকে না বলে তাঁকে দেখতে এসেছেন। নীলকণ্ঠ মহারাজ অপ্রত্যাশিতভাবে অসময়ে খোকা মহারাজকে দেখতে পেয়ে প্রথমটায় ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পরে নিজেকে সামলে নিয়ে খোকা মহারাজকে প্রণাম করে বসান। বসেই তিনি বললেন ঃ "আমি মহাপুরুষ মহারাজকে দেখতে যাব।" বলেই ওপরে যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। নীলকণ্ঠ মহারাজ তাঁকে নানাভাবে প্রতিনিবৃত্ত করছিলেন। আমি তখনও মহাপুরুষজীর ঘরে কাজকর্ম করছিলাম। নীলকণ্ঠের গলা শুনে তাড়াতাড়ি নিচে নেমে এসে সব ব্যাপার বুঝে খোকা মহারাজকে প্রণাম করে হাতজোড় করে বললাম ঃ "এখন তো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে দেখা করা মুশকিল। এখন তিনি বিশ্রাম করছেন। তাছাড়া আপনি এই অসময়ে অতটা পথ হেঁটে এসেছেন শুনলে তিনি সেবকদের ওপর বিশেষ বিরক্ত হবেন। আপনি এখন ধীরে ধীরে ফিরে যান, আমি দেখব চেষ্টা করে কাল সকালে তাঁকে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার জন্য।" ততক্ষণে তাঁর দুজন সেবকও এসে উপস্থিত হলো। একখানি চেয়ার সঙ্গে দিয়ে নীলকণ্ঠ মহারাজ ও সেবকদের সাথে তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম। বিকালে খোকা মহারাজের আগমন ও তাঁকে ফেরত পাঠানোর কথা বলতে

মহাপুরুষজী খুবই গম্ভীর হয়ে বললেনঃ “কাল সকালেই আমাকে একবার নিয়ে যেও, খোকাকে দেখে আসব।”

পরদিন সকালে প্রায় নটা নাগাদ মহাপুরুষ মহারাজ ধীরে ধীরে খোকা মহারাজকে দেখতে গেলেন। তিনি খোকা মহারাজের জন্য বেদানা, আঙুর প্রভৃতি ফল সঙ্গে করে এনেছিলেন। চেয়ারে বসিয়ে তাঁকে ওপরে উঠানো হলো। তিনি খোকা মহারাজের ঘরে গিয়ে তাঁর মাথায় ও গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে সাবধানে ডাক্তারদের কথামতো চলার কথা বলে বললেন ঃ “আমি ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করি, তুমি ভাল হয়ে ওঠ, আরও অনেকদিন থাক।” তাতে খোকা মহারাজ হাতজোড় করে বললেন ঃ “আমার কিন্তু আর থাকতে ইচ্ছা হয় না।” এ কথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন এবং ধীরে ধীরে নেমে এলেন। পরে তিনি রোজ সকালে কিছু ফল দিয়ে আমাকে খোকা মহারাজের খবর নিতে পাঠাতেন। আমি তাঁকে ঐ ফল দিয়ে তাঁর সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে, মহাপুরুষজীকে খোকা মহারাজের খবর দিতাম। কোন কোন দিন বিকালেও খোকা মহারাজের খবর নিতে আমায় পাঠাতেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস। ঠাকুরের অন্যতম সন্ন্যাসী পার্ষদ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ কয়েকমাস যাবৎ কঠিন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে বেলুড় মঠে পৃথক বাড়িতে অবস্থান করছেন। তাঁর চিকিৎসা ও সেবাদির যথাযথ ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও রোগ ক্রমে বেড়ে চলেছে; কিন্তু মহাপুরুষজীর প্রাণ যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় না যে, খোকা মহারাজের এমন কঠিন অসুখ হয়েছে। মহাপুরুষজী রোজই সকাল-বিকাল বিভিন্ন ফল দিয়ে সেবকদের খোকা মহারাজের খবর নিতে পাঠাতেন এবং নিবিষ্ট মনে খোকা মহারাজের শারীরিক অবস্থার কথা শুনতেন। খোকা মহারাজের শারীরিক অবস্থা যেমন দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছিল, ততই তিনি বেশি অন্তর্মুখ হয়ে যাচ্ছিলেন। আমি রোজ সকালে-বিকালে খোকা মহারাজের কাছে গিয়ে মঠের নানা প্রসঙ্গ করতাম, কিন্তু তাঁর সেসব শোনার আগ্রহ দিনের পর দিন কমে যেতে লাগল। মহাপুরুষজীর খবর তিনি রোজ নিতেন এবং তাঁকে রোজ প্রণাম জানাতেন।

প্রণাম জানাবার সময় তিনি দুহাত কপালে ঠেকাতেন। মহাপুরুষজীও চোখ বুজে খোকা মহারাজের খবর শুনতেন এবং তাঁর প্রণাম গ্রহণ করতেন।

শেষ সাত-আট দিন যাবৎ খোকা মহারাজের অসুখের দ্রুত অবনতি হতে লাগল। রক্ত রোজই পড়ত, রক্ত পড়ার বিরাম ছিল না। রক্তহীনতা ক্রমে বেড়ে গেল—খাওয়ায় অরুচি ও অনিচ্ছা। ঠাকুরের প্রসাদ বলে ফলের রস যা দেওয়া হতো তা খেতেন এবং অধিকাংশ সময় চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে থাকতেন। ক্রমে টেম্পারেচার দেখতেও দিতেন না। কৌশলে নাড়ি দেখা হতো। দেহত্যাগের পূর্বদিন সন্ধ্যার পরে আমি প্রতিদিনের মতো খোকা মহারাজের খবর নিতে গিয়েছি—তিনি তখন চোখ বুজে ছিলেন। মহাপুরুষজীর নাম করতে চোখ মেলে হাতজোড় করে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করলেন। পুনরায় চোখ বুজে খানিকক্ষণ থেকে একটু জড়িত স্বরে (ঠাকুরের উদ্দেশে) বললেন ঃ "আমার এই অন্তিম প্রার্থনা, ঠাকুর আমাদের সঙ্ঘের সকলের কল্যাণ করুন। সকলের সুবুদ্ধি দিন।" এই বলেই পুনরায় চোখ বুজে রইলেন। সেবকদের কাছে খবর নিয়ে জানা গেল, সেরাত্রে তিনি কিছু খাননি, কোন কথাও বলেননি, যেন গভীর ধ্যানস্থ হয়ে ছিলেন। আমি তখনই মঠবাড়িতে এসে দু-তিনজন প্রবীণ সন্ন্যাসীকে পূজনীয় খোকা মহারাজের সেই অন্তিম প্রার্থনার কথা বললাম। তাঁরা শুনে বললেন ঃ "খোকা মহারাজ শরীর ছেড়ে দেবেন। মহাপুরুষ মহারাজকে এখন বলো না।"

২ ডিসেম্বর, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ, পূজনীয় খোকা মহারাজের দেহত্যাগের দিন। ঐ দিন সকালের দিকে তিনি বেশ ভালই বোধ করছিলেন। সুধীর মহারাজ তাঁকে প্রণাম করতে গিয়েছেন। তিনি তখন সুধীর মহারাজকে স্বাভাবিকভাবে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ "কি সুধীর, ভাল আছ তো? আর সব খবর ভাল তো?" এই খবর পেয়ে মহাপুরুষজীর মন বেশ প্রফুল্ল। তিনি বারংবার বললেন ঃ "কেন, খোকা তো আজ বেশ ভালই আছে, সুধীরের সঙ্গে অনেক কথা বলেছে।" কিন্তু বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খোকা মহারাজের শরীরের অবস্থা খারাপের দিকে যেতে লাগল। জ্বর ও অস্বস্তি বাড়তে লাগল। তিনি ঔষধ-

পথ্য কিছুই খেতে নারাজ। চোখ বুজেই আছেন—যেন ধ্যানস্থ। ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার এসে নাড়ি দেখে বললেন যে, অবস্থা ভাল নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই একটা কিছু হবার সম্ভাবনা। কিছু করবার ছিল না। সেবকেরা চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। আমি দশটা নাগাদ একটু ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে খোকা মহারাজের খবর আনতে গেলাম। চরণামৃত খেতে বলাতে তিনি চোখ বুজেই হাঁ করে মুখ বাড়িয়ে দিলেন। আমি তিনবার চরণামৃত খাওয়ালাম। কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করতে—চোখ বুজে হাত দিয়ে কথা বলতে বারণ করলেন। তিনি ক্রমেই গভীর ধ্যানস্থ হলেন, চোখ আর খোলেন না। বেলা এগারটার পরে ডাক্তার এসে নাড়ি দেখে আশা নেই বলে গেলেন। তিনি চোখ বুজে আছেন, গভীর ধ্যানস্থ।

মহাপুরুষ মহারাজকে সে সংবাদ দেওয়া হয়নি। কিন্তু তিনি কোন অজ্ঞাত কারণে সকাল থেকে খুবই অস্থির হয়ে পড়লেন। মঠের সর্বত্রই মহা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঠাকুরের ভোগরাগ যথাসময়ে হয়ে গেল—সাধুদের খাওয়া-দাওয়াও। মহাপুরুষজী সেদিন নামমাত্র খেলেন। অন্যদিনের মতো বিশ্রাম করলেন না। সর্বক্ষণ অস্থিরভাবে নিজের ঘরে পায়চারি করলেন। দুটোর পরে আমাকে খোকা মহারাজের খবর নিতে পাঠালেন। আমি এসে দেখি খোকা মহারাজের ঘরে ও বারান্দায় সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। আমি ঘরের ভিতরে গিয়ে দেখি যে পূজনীয় খোকা মহারাজ চিৎ হয়ে শান্তভাবে চোখ বুজে শুয়ে আছেন—শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসছে। মুখ দিয়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন। ঠাকুরের নাম শোনাবার কথা হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি মহাপুরুষজীর কাছে ছুটে এলাম এবং তাঁকে সংক্ষেপে বললাম—ডাক্তার জবাব দিয়ে গিয়েছেন, এখন ঠাকুরের নাম শোনাবার কথাবার্তা হচ্ছে। খোকা মহারাজ চোখ বুজে শান্তভাবে শুয়ে আছেন। মহাপুরুষজী এই দুঃসংবাদ শুনে প্রথমটায় শিউরে উঠলেন। খানিক পরে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন ঃ "আমি বসে থাকব, তুমি যাও খোকা মহারাজের কাছে।" আমি তাঁকে বিছানায় বসিয়ে তাড়াতাড়ি খোকা মহারাজকে দেখতে এলাম। ততক্ষণে সাধুরা তাঁকে 'রামকৃষ্ণ'

নাম শোনাচ্ছিলেন। আমি ঠাকুরের চরণামৃত নিয়ে গিয়েছিলাম। তাঁর ঘরের ভিতর বিছানার কাছে গিয়ে হাতে করে তাঁর মুখে একটু চরণামৃত দিলাম। তিনি চুপচাপ চোখ বুজে আছেন—নিঃশ্বাস পড়ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না। ডাক্তার এসে তাঁর নাড়ি দেখতে গিয়ে নাড়ি পেলেন না। মুখ দিয়ে কিছুক্ষণ পরে একটা বড় নিঃশ্বাস পড়ল। তিনি শান্ত, সমাহিত—শুয়ে আছেন—সর্বাঙ্গ আবৃত। সাধুদের 'রামকৃষ্ণ' নাম ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত—সেবকেরা কাঁদছে। কয়েক মিনিট পরেই খোকা মহারাজের মুখ দিয়ে (ফু শব্দে) শেষ নিঃশ্বাস বেরিয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সর্বাঙ্গ যেন কেঁপে উঠল। তারপরেই সব শেষ। আরও খানিকক্ষণ 'রামকৃষ্ণ' নাম করার পরেই অনেকেই তাঁকে প্রণাম করে চুপচাপ বাইরে এল। আমিও দৌড়ে গিয়ে মহাপুরুষজীকে খোকা মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ দিলাম। তিনি শান্তভাবে সব শুনলেন এবং চুপচাপ বসে রইলেন।

১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের ২ ডিসেম্বর, অপরাহ্ণ তিনটা পাঁচ মিনিটের সময় সকলের প্রিয় খোকা মহারাজ মহাসমাধিযোগে শ্রীগুরুপাদপদ্মে মিলিত হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-গগনমণ্ডলে একটা উল্কাপাত হলো। গঙ্গাস্নান, প্রণাম ও পূজাদি সমাপ্ত হবার পরে মহাসমাধিলীন খোকা মহারাজের পূত দেহ নববস্ত্র, মাল্য, বিভূতি, চন্দনাদি দ্বারা সুশোভিত করে সাধুগণ-কর্তৃক জয় রামকৃষ্ণ, বেদধ্বনি ও কীর্তনাদিসহ বাহিত হয়ে স্বামীজীর মন্দিরের দক্ষিণ পার্শ্বে যেখানে ঠাকুরের অন্য পার্ষদদের শরীর দাহ করা হয়েছিল সেখানে চন্দনকাষ্ঠাদির রচিত চিতাশয্যায় স্থাপিত হলো। প্রবীণ সন্ন্যাসিগণ অগ্নি হাতে নিয়ে বৈদিক মন্ত্রাদি আবৃত্তি করতে করতে অশ্রুপূর্ণ লোচনে প্রদক্ষিণান্তে অগ্নি প্রজ্বলিত করলেন। তখন সন্ধ্যা ছটা অতীত প্রায়। এদিকে সন্ন্যাসীদের উপনিষদ ও গীতাদি শাস্ত্র আবৃত্তি ও নামকীর্তন চলতে লাগল। সব কাজ শেষ হতে প্রায় রাত্রি নটা।

(উৎস ঃ দেবলোকে)

শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দের মহাসমাধি (খোকা মহারাজ)*

উদ্বোধন

শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম প্রিয় শিষ্য শ্রীমৎ স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজ বিগত ১৬ অগ্রহায়ণ, ইং ২ ডিসেম্বর, শুক্রবার, ষট্‌পঞ্চমী শুভতিথিতে, ৬৬ বর্ষ বয়সে বেলুড় মঠের লাইব্রেরি গৃহে বেলা ৩টা ৫ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণ লোকে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। ইনি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রতিষ্ঠাকাল হইতেই উহাদের অন্যতম ট্রাস্টি ও গভর্ণিংবডির সদস্য এবং বর্তমান রামকৃষ্ণ মিশনের কোষাধ্যক্ষ রূপে নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি বহুদিন যাবৎ হৃদরোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। বিগত বৃহস্পতিবার দ্বিপ্রহর হইতেই হঠাৎ অসুস্থতা খুব বাড়িয়া উঠে এবং দেখা যায় নাড়ি খুব দুর্বল হইয়া চলিতেছে। তৎক্ষণাৎ চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হয় এবং তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা হয়। এই অসুস্থতার ভিতর তাঁহার জ্ঞান দেহত্যাগের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত সমানভাবেই ছিল। রাত্রি তিনটার সময় হঠাৎ বলেন, "মহাপুরুষ মহারাজ, আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন তো?" সেবক বলিল, "নিরন্তরই করেন।" তারপর বলিলেন, "তোদের সব সুবুদ্ধি হোক। ঠাকুর সব শীঘ্রই শান্তি করে দেবেন।" সকালে স্বামী শুদ্ধানন্দজী দর্শন করিতে যান। তিনি ভাবিয়াছিলেন, হয়ত তিনি কোনও কথাই বলিতে পারিবেন না, তিনি মাত্র একবার দেখিয়াই চলিয়া আসিবেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখিবামাত্রই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি সুধীর কেমন আছ?" তাহার পর অনেকক্ষণ নিমীলিত চক্ষে অবস্থান করেন। সেবকেরা

* পূর্বাশ্রমের নাম—শ্রীসুবোধচন্দ্র ঘোষ। জন্ম ৮ নভেম্বর, ১৮৬৭, শুক্রবার, ২৩ কার্তিক ১২৭৪ সাল, উত্থান একাদশী। পিতার নাম—কৃষ্ণদাস ঘোষ। মাতার নাম—নয়নতারা দেবী—হোগোল কুঁড়িয়া ৺দুর্গাচরণ গুহের কন্যা। পিতামহ—রামচন্দ্র ঘোষ। প্রপিতামহ—শঙ্কর ঘোষ—ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী দেবীর স্থাপনা করেন। উঁহাদের উপস্থিত ঠিকানা—৪১নং শঙ্কর ঘোষ লেন। (খোকা মহারাজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে সংগৃহীত।)

জিজ্ঞাসা করে, "মহারাজ, ঠাকুর, মা, স্বামীজীর বেশ স্মরণ হচ্ছে তো?" উত্তরে বলিলেন, "হাঁ বেশ হচ্ছে।" মহাপ্রয়াণের এক ঘণ্টা পূর্ব হইতেই তিনি স্থিরদৃষ্টে সম্মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের ছবির দিকে চাহিয়া থাকেন। তাহার পর হঠাৎ খুব উজ্জ্বল হাসি তাঁহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। সমবেত সকলের মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরকে দেখতে পাচ্ছেন তো?" চক্ষে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। তারপর চক্ষের তারা বামদিক হইতে দক্ষিণ দিকে সরিয়া গেল—চক্ষু যেন কাহার অনুসরণ করিতেছে। তাহার পর আবার সেই অপূর্ব হাসি এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ সকল মহাপুরুষ-সেবিত সেই চিরন্তন মহাপ্রস্থানের পন্থা অবলম্বন করিল। জয় রামকৃষ্ণ ধ্বনিতে সমস্ত গৃহ ধ্বনিত হইতে লাগিল। যথা নিয়মে পুষ্পচন্দনে সুসজ্জিত করিয়া নামকীর্তনের সহিত ভক্ত ও সন্ন্যাসীরা গঙ্গার ঘাটে আনিয়া তাঁহার শরীরের স্নানকার্য সমাপন করেন। পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে আরাত্রিক কার্য সম্পাদিত হইলে ভক্তেরা flash light-এ তাঁহার ফটোগ্রাফ গ্রহণ করেন। অতঃপর ভক্তদের প্রণামকার্য সমাপ্ত হইলে, মঠের দক্ষিণ দিকে পূজনীয় শরৎ মহারাজের সমাধিভূমির পূর্বদিকে ঘৃত, চন্দনকাষ্ঠ, গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার শেষকার্য সাধিত হয়।

খোকা মহারাজের সম্বন্ধে ঠাকুরের সমসাময়িক যে সকল ঘটনা শ্রীযুক্ত গুরুদাস বর্মন মহাশয় তাঁহার "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-চরিতে" বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহা উদ্বোধনের ভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের নিকট অর্পণ করিলাম—

শঙ্কর ঘোষের নাম কলকাতাবাসীদের মধ্যে সকলের পরিচিত। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত। তাহারই নিকট শঙ্কর ঘোষের গলিতে তদ্‌বংশীয়গণের বর্তমান বাস। বিষয় বৈভব তাদৃশ না থাকিলেও ঐ বংশীয়গণের কলকাতা সমাজে এখনও বেশ মান আছে। সুবোধ এই বংশের সন্তান, বয়ঃক্রম আন্দাজ ১৭।১৮-র অধিক নহে। একদিন পিতার নিকট একখানি ছোট পুস্তক পাইল—"শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের উক্তি।" রামকৃষ্ণদেবের জনৈক শিষ্য শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র দত্ত তাঁহার কতকগুলি উক্তি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা বাহির করেন—উহা তাহাই। সুবোধের

পিতাঠাকুর একজন পরম ধার্মিক ব্যক্তি, ধর্ম-সম্বন্ধীয় ভাল পুস্তকাদি সুবোধকে পড়িতে দিতেন। সুবোধের পুস্তকখানি পাঠ করিয়া বড় ভাল লাগিল। পিতাকে বলিলেন, "পুস্তকখানি পাঠ করিয়া পরমহংসদেবকে দেখিবার বড়ই ইচ্ছা হইয়াছে।" পিতা বলিলেন, বেশ কথা, অফিসের যখন ছুটি থাকিবে, তখন বাড়ির সকলে মিলিয়া একদিন দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসদেবকে দর্শন করিবেন। কিন্তু সুবোধের বিলম্ব অসহ্য! সে তাহার জনৈক প্রতিবেশী বালক বন্ধুকে ডাকিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দর্শন করিতে যাইবার প্রস্তাব করিল। দুই একদিন পরেই কোন কারণে বিদ্যালয়ের সকাল সকাল ছুটি হইলে, দুই বন্ধুতে মিলিয়া পদব্রজে দক্ষিণেশ্বর যাত্রা করিল। ইতঃপূর্বে বাড়ি হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া সে এতদূরে কখনও কোথাও যায় নাই। পথে সুবোধ বন্ধুকে বলিল, "দেখ, বাড়িতে বলে আসা হয়নি—টের পেলে বকবে, খুব শিগ্‌গির শিগ্‌গির চলে যাই চল—সন্ধ্যের আগেই ফিরতে হবে।" এই বলিয়া দুজনে খুব বেগে চলিতে চলিতে একেবারে আড়িয়াদহে উপস্থিত। পথে একজনকে 'পরমহংস মশাই কোথায় থাকেন' জিজ্ঞাসা করায় লোকটি বলিল, "আপনারা পথ ভুলে দূরে এসে পড়েছেন।" পরে একটি ধেনো জমির মধ্যবর্তী আলপথ দেখাইয়া বলিল, "এইখান দিয়া যান, শিগ্‌গির রাসমণির বাগানে পৌঁছিবেন।" সুবোধ ইহার পূর্বে মাঠে চাষাদের কৃষিকার্য করিতে কখনও দেখে নাই—ধান্যক্ষেত্র দেখিয়া তাহার মনে নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল—অমনি তাহার চলনও ঢিলা হইয়া আসিল। দেখিতে দেখিতে ধীর পদে কিয়দ্দূর যাইলে পর প্রতিবেশী বালক তাহাকে বলিল, "চল, চল, দেরি হচ্ছে।" সুবোধের হুঁশ হইল যে পরমহংসদেবকে দর্শন করিয়া সন্ধ্যার অগ্রেই ফিরিতে হইবে, আবার বেগে চলিল এবং অল্পক্ষণেই রাসমণির বাগানে পৌঁছিল। সুবোধের ধারণা, পরমহংস একজন বাজিকর, নানা ভেলকি দেখায়। কিন্তু এ পরমহংসের উক্তি পড়িয়া মনে হইয়াছে ইনি একজন সাধু। সাধুর সহিত কথোপকথন সুবোধ ইতঃপূর্বে কখনও করে নাই; পাছে কি বলিতে কি বলিয়া ফেলেন তাই বন্ধুকে বলিল, "দেখ, তুই এগিয়ে পরমহংসদেবের সঙ্গে কথা কইবি। আমি সাধুদের সঙ্গে কেমন করে মান্য করে কথা কইতে হয় জানি না। আমার পরিচয় চান তো

তুই সব বলরি, যা জানতে চান বলবি। আমি কিন্তু কথা কইব না। তোর পেছনে থাকব, তুই এগিয়ে থাকবি।" বন্ধু বলিলেন, "আচ্ছা।"

অতঃপর রামকৃষ্ণদেবের ঘরের দ্বারে প্রবেশ করিয়াই করজোড়ে তাঁহাকে দুজনে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কোথা থেকে আসছ?"

প্রতিবেশী বন্ধু বলিলেন, "কলকেতা থেকে।" পরমহংস বলিলেন, "ওবাবুটি অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন? ওগো বাবু, অতদূরে দাঁড়িয়ে কেন, এগিয়ে কাছে এস না।" সুবোধ বন্ধুর সঙ্গে বন্দোবস্ত মতো পশ্চাতে একেবারে দ্বারের নিকট ছিলেন ও বন্ধুটি ঘরের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত কথা কহিতেছিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সাদর আহ্বানে সুবোধ একটু অগ্রসর হইল; রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তুমি শঙ্কর ঘোষের বাড়ির না?"

সুবোধ আশ্চর্য হইয়া কহিল, "হ্যাঁ—আপনি কেমন করে জানলেন?"

রামকৃষ্ণদেব উত্তর করিলেন, "যখন ঝামাপুকুরে ছিলুম তোদের সিদ্ধেশ্বরীর মন্দিরে, তোদের বাড়িতে কতবার গেছি, তুই তখন জন্মাসনি, তুই এখানে আসবি জানতুম। যাদের হবে মা তাদের পাঠিয়ে দেন। তুই অত দূরে কেন, কাছে আয় না—কাছে আয়।"

বারম্বার কাছে আসিতে বলায় বালক তাঁহার কাছে আসিলেন, নিকটে আসিবামাত্র তার হাত ধরিলেন। হাত ধরিয়া চক্ষু মুদিয়া কিছুক্ষণ রহিলেন। পরে বলিলেন, "দেখ, তোর হবে, মা বললেন—তোর হবে।" আপনার তক্তপোশ দেখাইয়া বলিলেন, "এই বিছানায় বোস।" ডাক্তারেরা লোকের হাত ধরিয়া লোকের শারীরিক সুস্থতা বা অসুস্থতা জানিতে পারে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবও তদ্রূপ লোকের হাত ধরিয়া তাহার মানসিক অবস্থা বুঝিয়া তাহার ধর্মলাভ হইবে কি না, যথাযথ বুঝিতে পারিতেন। এ বিষয় তাঁহার সকল শিষ্যেরাই একবাক্যে সাক্ষ্যদান করেন।

বালক কহিল, "না মশাই স্কুলের কাপড়ে কত লোককে ছুঁয়েছি, প্রস্রাব করেছি, এ কাপড়ে আপনার ও বিছানায় বসবো না।"

রামকৃষ্ণদেব তাহা শুনিলেন না, হাত ধরিয়া বলপূর্বক তাহাকে নিকটে বসাইলেন। অগত্যা বালক অল্পক্ষণ বসিয়া তথা হইতে নামিয়া মেঝেয় বসিলেন। রামকৃষ্ণদেব তখন ব্যস্ত হইয়া নিজ ভ্রাতষ্পুত্র রামলালকে একখানি আসন আনিতে বলিলেন। রামলালদাদা আসন আনিলে সুবোধ তদুপরি এবং তাহার বন্ধু রামকৃষ্ণদেবের আসনের নিকট যে পাপোশখানি ছিল তাহার উপর বসিলেন।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোমরা কেমন করে এখানে এলে?" সুবোধ তাঁহার আদর যত্ন পাইয়াছেন, আর মনে ভয়ের ভাব নেই, কলকাতার ছেলেরা যেমন করে, সব কথায় চটপট জবাব দিতে লাগিলেন। সুবোধ কহিলেন, "হেঁটে এলুম।" রামকৃষ্ণদেব আশ্চর্য হইয়া কহিলেন, "বলিস কিরে? এতটা পথ হেঁটে এলি! তা এখানকার খবর পেলি কি করে।"

সুবোধ বলিলেন, "আপনার উক্তি পড়ে বড় ভাল লাগল—আপনার কি চমৎকার কথা। আপনার কত নাম, আপনি মহৎ লোক, তাই আপনাকে দেখতে এসেছি।"

এই কথা বলিবামাত্র রামকৃষ্ণদেবের ভাবান্তর হইল। তিনি তখনি বলিলেন, "আমি গুয়ের কীটেরও অধম, আমার আবার নাম কি? আমি গুয়ের কীটেরও অধম।" বালক এই কথার সঙ্গে তাঁহার মুখের অপূর্ব দীনভাব দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "যাদের ধর্ম হবে, মা তাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। তা দেখ, এখানে শনি মঙ্গলবারে আসিস, এখানে শনি মঙ্গলবারে আসা ভাল। তোদের পাড়ার কত লোক শনি মঙ্গলবারে আসে। তুইও আসিস।" সুবোধ বলিলেন, "তাহলে মশাই বাড়িতে জানতে পারবে। আপনার বলবার যা আছে, তা এখুনিই সব বলে ফেলুন না। শনিবার তো আসতে পারবই না—সেদিন বাবার সকাল সকাল অফিসের ছুটি হয়।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "নারে মুখ দিয়ে যা বেরিয়ে গেছে তা করতেই হবে। এই যে দেখ না, যেখানে অমুক দিন যাব বলি, তা ঝড় হোক, বৃষ্টি

হোক, বাদল হোক, যেতেই হবে। ইচ্ছে না থাকলেও মা সেখানে নিয়ে যাবেনই যাবেন, কিছুতেই নিস্তার নেই। মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে, শনিবার কি মঙ্গলবার এখানে আসিস।"

কাজেই সুবোধ রাজি হইলেন ও ভাবিলেন, "আজ আর বেশিক্ষণ থাকব না—আজ আর বেশি কিছু কথাও হবে না।" অতঃপর বাটি ফিরিয়া যাইবার জন্য উঠিলেন। রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "কিছু খাবি?" সুবোধ উত্তর করিলেন, "তা বাড়ি গিয়ে খাব এখন।" রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "একটু মিষ্টি খেয়ে জল খা, তারপর যাবি।" এই বলিয়া লাটুকে একটু মিষ্টান্ন ও জল আনিতে বলিলেন। সুবোধ ও তাহার বন্ধু জলযোগের পর ফিরিয়া যাইতে প্রস্তুত হইলে, পরমহংসদেব আবার কহিলেন, "অনেকটা দূর, ছেলেমানুষ হেঁটে যেতে কষ্ট হবে, পয়সা দিতে বলি, গাড়ি কি নৌকোয় যা।"

সুবোধ বলিলেন, "সাঁতার জানিনি, নৌকোয় যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তবে গাড়ি করে যা।"

সুবোধ কহিলেন, "না, হেঁটেই যাব।"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "নারে কষ্ট হবে, ছেলেমানুষ, এতটা পথ হাঁটতে পারবি কেন?"

সুবোধ পুনরায় কহিলেন, "এই বয়সে হাঁটব না তো হাঁটব কবে? আর আপনি পয়সা দেবেন কেন? আপনি পয়সা পাবেন কোথায়?"

রামকৃষ্ণদেব একটু হাসিয়া বলিলেন, "ওরে এখানে অনেকে দেয়, তোর তা কিছু ভাবতে হবে না। পয়সা দিতে বলছি গাড়ি করে যা।"

সুবোধ কিছুতেই পয়সা লইতে রাজি হইলেন না। রামকৃষ্ণদেব অবশেষে অপর বালকটিকে বলিলেন, "তুমি পয়সা নাও দুজনে গাড়ি করে যেও।" সুবোধ বলিলেন, "নারে পয়সা নিসনি, হেঁটেই যাব।" অগত্যা পরমহংসদেব আর জিদ না করিয়া কহিলেন, "আসিস, শনি, মঙ্গলবার দেখে আসিস।" তাঁহার পদধূলি লইয়া বন্ধুদ্বয় হন্ হন্ করিয়া বাড়ি অভিমুখে চলিলেন।

ইতঃপূর্বে সুবোধ হেয়ার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়িত, গণিত বিদ্যায় তাঁহার একটু বেশি প্রীতি ছিল। প্রতিবার পরীক্ষার সময় মনে করিতেন, "এবার ফুল নম্বর পাব।" পাছে না পায় সেজন্য ঠাকুর দেবতার স্মরণ লইয়া পরীক্ষা দিতে যাইতেন। আবার ২।৪ নম্বর কম পাইলে দেবতাদের ওপর রাগ করিয়া বলিতেন, "দেবতা টেবতা সব মিথ্যে।" বাল্যকালে দেবদেবীর ওপর যে ভাবভক্তি ছিল, কিছুদিন স্কুলে পড়ার পর আর তাহা তেমন রহিল না। যদি বা কখনও একটু বিশ্বাস আসিত, তাহা ঐ প্রকারে দেবদেবীর ক্ষমতা পরীক্ষায় নিয়োজিত হইয়া ভাসিয়া যাইত। তিনি ৪র্থ হইতে তৃতীয় শ্রেণিতে উঠিলেন। এই সময়ে তাঁহার বিবাহের কথা বাড়িতে উত্থাপিত হইল। বড় বংশ, কাজেই ভাল ভাল ঘরের সহিত সম্বন্ধের কথা আসিতে লাগিল। সুবোধের কিন্তু ভবিষ্যৎ জীবনের একটা অপরিস্ফুট ছবি অহরহ মনমধ্যে জাগিয়া থাকিত। তিনি মাঝে মাঝে ভাবিতেন আমি বিবাহ করিব না, কারণ বাড়িতে তো থাকিব না। নানা দেশে ঘুরিয়া বেড়াইব, পর্বত জঙ্গল দেখিয়া বেড়াইব। অতএব বিবাহের প্রয়োজন নাই। অতঃপর পিতামাতাকে স্পষ্ট একদিন কহিলেন, "আপনারা আমার বিবাহ দেবেন না। আমি বিবাহ করব না।"

পিতা বলিলেন, "কেন, বিবাহ করবে না কেন? এই বছরটা উঠে পড়ে লেগে পাশ কর, বেশ ভাল জায়গায় বিবাহ হবে।" সুবোধ কহিলেন, "দেখুন, আপনারা যদি জিদ করে বে দেন তো আমার আর উপায় নেই, আপনাদের কথা তো অগ্রাহ্য করতে পারব না, বে করব; কিন্তু আমার বাড়িতে থাকা হবে না। কোথায় কোন দেশে চলে যাব, তার কিছুই ঠিক নেই। বাড়ি থেকে সংসার করা আমার পোষাবে না। তাই বলছি মিথ্যা একটা বিবাহ দিয়ে আবার ছেঁড়া লেঠা জড়ানর আর দরকার কি?"

পিতা বলিলেন, "আচ্ছা এ বৎসরটা তো ভাল করে পড়, তারপর বোঝা যাবে।" সুবোধ তাঁহার কথার আভাসে বেশ বুঝিলেন, এবার পরীক্ষার ফল ভাল হইলেই পিতা বিবাহ দিবেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন, এ বৎসর তাহার পরীক্ষার ফল যেন খুবই মন্দ হয়। পড়াশুনায় আর তাঁহার মন লাগিল

না। ফলেও তাহাই হইল। স্কুলের শিক্ষকেরা পরীক্ষার পর পরামর্শ করিয়া কহিলেন, "এ বৎসর সুবোধ তৃতীয় শ্রেণিতে থাকিলে পরে ভাল হইবে।" পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়ায় সুবোধের পিতার বিবাহ দিবার ঝোঁকও কমিয়া গেল। অতঃপর সুবোধ হেয়ার স্কুল পরিত্যাগ করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিদ্যালয়ে ভর্তি হইলেন; অতএব তিনি যখন পরমহংসদেবকে দর্শন করিতে যান, তখন দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়িতেছিলেন।

প্রথম দর্শনের পরই যে শনিবার আসিল, সেই শনিবার সুবোধ বন্ধুকে সঙ্গে লইয়া স্কুল পলাইয়া দ্রুতপদে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন রামকৃষ্ণের ঘরে অনেকগুলি লোক। ঘরের দ্বারে উঁকি মারিয়া করজোড়ে প্রণাম করিবামাত্র পরমহংসদেবের সঙ্গে তাঁহার চোখাচুখি হইল। রামকৃষ্ণদেব অভয় কর উত্তোলনপূর্বক ইঙ্গিত করিলেন, "ঐখানেই থাক।" বালকের মনোভাবও তাহাই, তিনি ঘরে প্রবেশ করিতে অনিচ্ছুক, পাছে পাড়ার কোন লোক থাকে ও তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার পিতাকে বলিয়া দেয়।

রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে ইঙ্গিত করিয়া উপস্থিত ভদ্রলোকদের "তোমরা একটু বোস, আমি এখনই আসছি" বলিয়া বাহিরে আসিলেন। বেলা তখন প্রায় ৩টা।

রামকৃষ্ণদেবের প্রিয় মানসপুত্র রাখাল তখন সেখানে ছিলেন, তাঁহাকে গঙ্গাজল আনিতে বলিলেন। গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া তাঁহার প্রকোষ্ঠের দক্ষিণে যে শিবমন্দির, তাহার সিঁড়ির উপরে আপনি আসন পিঁড়ি হইয়া বসিলেন এবং সুবোধ ও তাহার বন্ধুকে বসিতে বলিলেন। এবারও সুবোধ পূর্ববারের ন্যায় সকল বিষয়ে তাঁহার বন্ধুকে অগ্রসর করিয়া রাখিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণদেব এইবার দুইজনকেই জামার বন্ধ খুলিতে বলিলেন এবং অপর বালকটিকে জিহ্বা বাহির করিতে বলিলেন। তিনি জিহ্বা বাহির করিলে তাহাতে কি লিখিয়া দিলেন এবং তাহার নাভি হইতে কণ্ঠ পর্যন্ত হস্ত স্পর্শ করিলেন। এবার সুবোধের পালা। সুবোধের ইংরাজি ডৌলের কামিজ, এখনও সকল বন্ধ খোলা হয় নাই। কিন্তু রামকৃষ্ণদেবের আর বিলম্ব সহ্য হয় না, কি যেন একভাবে তাঁহার

মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ও চক্ষুদ্বয় পদ্মাভ। শিবনেত্র হইয়াছে। তিনি স্বহস্তে ফড়ফড় করিয়া সুবোধের বোতাম খুলিয়া দিলেন এবং পূর্বোক্তভাবে তাঁহার জিহ্বা ও শরীর স্পর্শ করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী, জাগো মা ব্রহ্মময়ী!!"

পরে উভয়কে ধ্যান করিতে বলিলেন। ধ্যান করিতে আরম্ভ করিবামাত্র সুবোধের সর্বাঙ্গ প্রকম্পিত হইতে লাগিল এবং তাঁহার মেরুদণ্ড মধ্যে এক প্রবল স্রোত উত্থিত হইয়া, মস্তিষ্ক মধ্যে ধাবিত হইতেছে বোধ হইতে লাগিল। পরে সর্বাঙ্গে এক অপূর্ব আনন্দের ভাব উপস্থিত হইল এবং ভিতরে এক অপূর্ব জ্যোতি দর্শন হইতে লাগিল। ধ্যান ক্রমে গভীর হইল এবং আমি কে, কোথায় আসিয়াছি, কাহার কাছে আছি, সুবোধ সমস্ত কথা বিস্মৃত হইলেন। সেই অপূর্ব জ্যোতির মধ্যে ক্রমে কত দেব, কত সুপ্রসন্না দেবী মূর্তি একে একে উদিত হইয়া অনন্তে বিলীন হইতে লাগিল। তৎপরে সুবোধের আর সংজ্ঞা রহিল না। যখন পুনরায় সংজ্ঞা লাভ হইল, তখন সুবোধ দেখিল পরমহংসদেব তাহার মস্তক হইতে নাভি পর্যন্ত অর্থাৎ পূর্বে যেরূপ করিয়াছিলেন, তদ্বিপরীতভাবে তাহার শরীরে হস্ত বুলাইতেছেন। রামকৃষ্ণদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে তুই কি বাড়িতে ধ্যান করতিস।"

সুবোধ বলিলেন, "একটু একটু ঠাকুর দেবতার বিষয়ে মার কাছে যা শুনতুম তাই ভাবতুম।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তাই তোর এত শিগ্‌গির হলো।" পরে বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কিছু দেখতে-টেকতে পেলে হ্যা!" সে কহিল, "না।"

রামকৃষ্ণ কহিলেন, "পরে পাবে।"

সুবোধ প্রকৃতিস্থ হইলে, রামকৃষ্ণদেব তাহাদের আবার বলিলেন, "এখন যা, পঞ্চবটীতে গিয়ে একটু ধ্যান করগে।" এই বলিয়া গঙ্গাজলে হাত ধুইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গেলেন।

এদিকে সুবোধ পঞ্চবটী কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানে না। নহবতখানার নিকটে যাইয়া, যেখানে মাতাঠাকুরানী অবস্থান করিতেন, দেখিলেন স্ত্রীলোকের

জনতা। সুবোধ ঐ স্থানেই পঞ্চবটী ভাবিয়া বন্ধুকে বলিলেন, "তুই পঞ্চবটীতে যা, আমি কালীমন্দিরে যাই।" এই বলিয়া সুবোধ কালীমন্দিরে যাইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন। একটু পরে তাঁহার বন্ধু তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সুবোধ ধ্যানমগ্ন। বালকের ধ্যানাবসানে বন্ধু কহিলেন, "ওখানে অনেক মেয়েরা রয়েছেন, তাই আমি চলে এলুম।" পরে দুইজনে বিদায় লইবার জন্য, পরমহংসদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, "তাঁহার ঘরের জনতা এখন অনেক কমিয়া গিয়াছে। বিদায় লইবার পূর্বে রামকৃষ্ণদেব সেদিনও জিদ করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করাইলেন এবং গাড়ি করিয়া বাটি যাইবার জন্য তাঁহাদের অনুরোধ করিলেন। সুবোধ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় কহিলেন, "তবে একটা ছাতি নিয়ে যা, এখনও বড় রোদ্দুর।"

সুবোধ কহিলেন, "মহাশয়, আবার কবে আসতে পারব না পারব, এখানকার ছাতি নিয়ে যাব না।"

রামকৃষ্ণদেব অবশেষে সুবোধের বন্ধুকে বলিলেন, "ওগো, তুমি একটা ছাতি নিয়ে যাও।"

সুবোধ তাহাকে বলিলেন, "নারে এখানকার ছাতি নিয়ে যাবি, আবার ওঁদের কখন দরকার হবে তখন পাবেন না। নিয়ে যাসনে।"

পরমহংসদেব কহিলেন, "না দরকার হবে না। ফেরত দেবার জন্য কোনও ভাবনা করতে হবে না। তোরা একটা ছাতি নিয়ে যা।" একজনকে তাঁহাদের একটি ছাতি দিতে অনুমতি করিলেন। অগত্যা সুবোধ আর কোনও আপত্তি করিতে পারিলেন না।

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "তোদের পাড়ায় মহেন্দ্র মাস্টার আছে। সে এখানে আসে, বেশ লোক, তার কাছে যাস। আর মাঝে মাঝে এখানে আসিস।" সুবোধ কোনও উত্তর করিলেন না; আসিতে পারিবেন, কি না পারিবেন, সেইজন্য।

বাল্যকাল হইতেই সুবোধের রাত্রে অন্ধকারে বড় ভয়। একলা শয়ন করিতে ভয়, সেইজন্য তাঁহার বিছানার পার্শ্বেই তাঁহার ঠাকুরমার বিছানা থাকিত; রাত্রে

উঠিতে হইলে বৃদ্ধা সঙ্গে থাকিতেন। রামকৃষ্ণদেবের সঙ্গলাভ করিয়া অবধি তাঁহার পূর্বের ভাব খুব বাড়িয়া উঠিল। তখন তিনি ভাবিলেন, "বাড়িতে থাকা তো কখনই হবে না। কিন্তু মাঠে, ঘাটে, গাছতলায়, কোথায় কত দেশে থাকতে হবে এত ভয়-ডর হলে কেমন করে চলবে? অতঃপর ভয় কমাবার চেষ্টা করা উচিত; রাত্রে ওঠবার আবশ্যক হলে আর ঠাকুরমার সাহায্য নেওয়া হবে না।" তদবধি রাত্রে উঠিয়া অন্ধকারে বুক দুর-দুর করিলেও সুবোধ একাকী যাওয়া-আসা করিতেন।

রামকৃষ্ণদেবের নিকট যাওয়ার পর হইতে সুবোধ নিজ ভ্রূমধ্যে একটা জ্যোতি কখনো কখনো দেখিতে পাইতেন। বালকের মনের সকল কথাই মাতার সহিত হইত। কারণ, মাতা বাল্যকালে তাঁহাকে নানা গল্প ও উপদেশ শুনাইতেন, রামায়ণ ও মহাভারতের কথা, সত্য পালন ও ঈশ্বরে বিশ্বাস ও নির্ভরতার সুখ-পরিণাম, তাঁহার অত্যন্ত কৃপা, যথা—সন্তান জন্মিবার পূর্বেই মাতৃস্তনে তাহার আহারের জোগাড় করিয়া রাখা ইত্যাদি এবং উহা হইতেই যে তাঁহার মনে ধর্ম-বিশ্বাস অঙ্কুরিত হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখনও ঐরূপ জ্যোতি দর্শনের কথা আপনার মাতাকে বলিলে তাঁহার মাতাঠাকুরানী তাঁহাকে কহিলেন, "বাবা আর কারুকে এসব কথা বোলো না, এসব বড় ভাগ্যে হয়, সবাইকে বললে ক্ষতি হয়।"

বালক উত্তর করিলেন, "মা ক্ষতি কি হবে? ওসব নিয়ে আমি কি করব? যে বস্তু থেকে এই আলোর উৎপত্তি, সেই বস্তুই যদি না পাই তো আমার ও আলোটার কাজ কি?"

সুবোধের আর লেখাপড়া করিতে মন লাগে না। সদাই পরমহংসদেবের নিকট যাইতে বাসনা হয়। আপন ভাবে কখনো ধ্যান, কখনো জপ, কখনো বা ঈশ্বর চিন্তা লইয়া থাকেন। রামকৃষ্ণদেব ইহার পূর্বে মহেন্দ্রনাথকে সুবোধের কথা বলিয়া রাখিয়াছিলেন। মহেন্দ্র মাস্টার মহাশয় এজন্য প্রায় পত্র লিখিয়া সুবোধকে ডাকিয়া পাঠান। পত্র পাইয়া সুবোধ বালক বুদ্ধিতে ভাবেন, "মাস্টার মহাশয় স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করেন, তাঁহার কাছে গিয়ে ধর্ম-কর্ম আবার কি

শিখব? যদি ধর্ম শিক্ষা করতে হয় তো কাম-কাঞ্চন ত্যাগী পরমহংসের কাছেই শিখব। সংসারী লোকের কাছে যাব না।"

দিন কয়েক পরে আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলেন। সে দিন রামকৃষ্ণদেব তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদের সঙ্গে সুবোধের পরিচয় করিয়া দিলেন। সুবোধ, শরৎ, শশীকে দেখিয়া ভাবিলেন, "এদের দাড়ি আছে, বোধ হয় বাঙাল।" কিন্তু নাম-ধাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহাদের কলকাতায় চাঁপাতলায় বাড়ি; কথাবার্তাও দেখিলেন ঠিক কলকাতার লোকের ন্যায়, তথাপি তাঁহাদের দাড়ি দেখিয়া স্থির করিলেন, ইহারা নিশ্চয় বাঙাল।

যাহা হউক, রামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোদের বাড়ি থেকে এদের বাড়ি কত দূর? তোরা এর বাড়ি যাবি।" আবার সুবোধের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "তুইও এদের বাড়ি যাবি, আলাপ করবি।"

সুবোধ বলিলেন, "বাবা রাগ করবেন।"

রামকৃষ্ণদেব শরৎ ও শশীকে বলিলেন, "তোরা নরেনের সঙ্গে এর আলাপ করিয়ে দিবি। এর বাড়ি থেকে নরেনের বাড়ি কাছে।" তাহার পর সুবোধকে বলিতে লাগিলেন, "দেখ, নরেন বড় ভাল ছেলে, যেমন পড়াশুনাতে, তেমনি গাইতে-বাজাতে, তেমনি বলতে-কইতে, এখানে প্রায়ই আসে; আমাকে খুব ভালবাসে।" ক্ষণিক পরে রামকৃষ্ণদেব সুবোধকে আবার বলিলেন, "হ্যাঁরে মাস্টারের বাড়ি তোর বাড়ি থেকে খুব কাছে। তার কাছে যাসনি কেন? যাস।"

সুবোধ উত্তর করিলেন, "মশাই, তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঘর করেন, তাঁর কাছে কি করতে যাব?" সুবোধের বৈরাগ্যপূর্ণ কথায় রামকৃষ্ণদেব উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন, বলিলেন, "ওরে সে আর কোন কথাই কইবে না, এখানকার কথাই কইবে। তুই যাস তার কাছে।"

সুবোধ অগত্যা কহিলেন, "আপনি যখন বলছেন, যাব!"

ইহার দুই-একদিন পরেই মাস্টার মহাশয় আবার একখানি চিরকুট লিখিয়া সুবোধকে বাড়ি হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুবোধ গেলেন। মাস্টার মহাশয়

তাহাকে খুব আদর-যত্ন করিয়া কহিলেন, "তিনি (রামকৃষ্ণদেব) এখানে আসতে বলেন, আস না কেন?"

সুবোধ উত্তর করিলেন, "আপনি সংসারী বলে আপনার কাছে এতদিন আসিনি। তবে তিনি (রামকৃষ্ণদেব) বললেন, আপনি তাঁর কথাই কইবেন, তাই এলুম।"

মাস্টার মহাশয় কহিলেন, "সে কথা ঠিক, আমরা সামান্য মানুষ। তবে সাগরের ধারে বাস করি, এক-আধ কলসী সাগরের জল এনে রাখি, কেউ এলে সেই জলই দিই এই পর্যন্ত। তাঁর কথা ছাড়া আর কি কথা কইব? এই যে এতটা পড়াশুনা করলুম, তাঁর কাছে গিয়ে সবই তো মিথ্যে হয়ে গেল। লেখাপড়া শিখে মনে হয়েছিল, দুনিয়ার সব তত্ত্বই জেনে ফেলেছি। ও মা? তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে দেখলুম, সব বিদ্যা—অবিদ্যা; সব কোথায় ভেসে গেল, মনে হলো, কি আশ্চর্য, এই বিদ্যে নিয়ে মানুষের এত অহঙ্কার হয়!"

মাস্টার মহাশয়ের সঙ্গে সুবোধের অনেক কথাবার্তা হইল। পরে মাস্টার মহাশয় তাঁহাকে মিষ্ট মুখ করাইয়া বিদায় দিলেন। রামকৃষ্ণদেবের সেবকরা এইরূপে পরস্পর এক অপূর্ব ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত হইতে লাগিলেন।

রামকৃষ্ণদেবের আজ প্রায় মাসাবধি গলার বেদনা বাড়িয়াছে, শারীরিক অবস্থা ভাল নয়। তাঁহার ত্যাগী বাল-ব্রহ্মচারী শিষ্যেরা প্রায় সকলেই কাছে থাকে। সুবোধ একদিন এই সময়ে দেখা করিতে যাইয়া বলিলেন, "মশাই, দক্ষিণেশ্বরে আপনি যে স্যাঁতস্যাঁতে ঘরে থাকতেন, বোধ হয় ঠাণ্ডা লেগে আপনার গলার ব্যথা হয়েছে, আপনি চা খেতে পারেন না? আমরা সব চা খাই, আপনি চা খান, বেদনা সেরে যাবে। আমার বাবার চায়ের অফিস আছে, আমাদের বাড়িতে খুব ভাল ভাল চায়ের নমুনা আসে, আমি আপনার জন্য উৎকৃষ্ট চা এনে দেব।"

রামকৃষ্ণদেব কহিলেন, "হ্যাঁরে, এই চা খেলে গলার বেদনা সেরে যাবে?"

সুবোধ কহিল, "হ্যাঁ মশাই; আমাদের গলার ব্যথা হলে চা খাই, ভাল হয়ে যায়।" সেখানে রাখাল প্রভৃতি প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণদেব রাখালকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রাখাল, তবে চা খাওয়াই যাক, এ চা এনে দেবে বলছে।"

রাখাল কহিলেন, "চা কি আপনার সহ্য হবে?"

রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "সহ্য হবে না?"

রাখাল কহিলেন, "সে যে বড় গরম। তাই বলছি, আপনার হয়ত সহ্য হবে না। উলটে গরম হয়ে যাবে।"

রামকৃষ্ণদেব অমনি ছেলে মানুষের মতো কহিলেন, "তবে কাজ নেই বাপু, আবার গরম হয়ে যাবে!" রামকৃষ্ণদেবের এইরূপ বালকের মতো স্বভাব দেখিয়া সুবোধ মুগ্ধ হইয়া রহিলেন।

সুবোধের রামকৃষ্ণদেবের উপর টান দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এই সময় রামকৃষ্ণদেবের গলায় ক্ষত হওয়ায় চিকিৎসার জন্য ভক্তেরা তাঁহাকে চিৎপুরের নিকট কাশীপুরে একটি বাগানবাটি ভাড়া করিয়া তাহাতে রাখিয়াছেন। সুবোধ ঘন ঘন স্কুল পলাইয়া তথায় গমন করেন। সমস্ত দিন অতিবাহিত করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে বাড়ি আসেন। একদিন আবশ্যক হইলে পরমহংসদেব তাঁহাকে 'সীতাপতি রামচন্দ্র' ইত্যাদি গানের একটি চরণ লিখিতে বলিলেন। হাতের লেখা ভাল নয় বলিয়া তিনি উহা লিখিতে নারাজ হইলেন। রামকৃষ্ণদেব তথাপি বলিলেন, "লেখা যেমনই হোক তুই লেখ না, না হয় একটু খারাপই হবে।" সুবোধ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তখন রামকৃষ্ণদেব বলিলেন, "দূর বোকা, কেবল বুঝি খেলিয়ে বেড়িয়েছিস।" সুবোধ এইরূপে ভর্ৎসিত হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণদেব তাই দেখিয়া হাসিতে লাগিলেন ও তাহাকে বলিলেন, "হ্যাঁরে, তোকে যে গাল দিলুম, তুই রাগ করলিনি?" সুবোধ ত্বরিত উত্তরে কহিলেন, "মশাই, আপনার গালাগালও মিষ্টি।" রামকৃষ্ণদেব অমনি আহ্লাদে সকলকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে শোন শোন, এ বলে কি শোন। বলে গালাগালও মিষ্টি লাগে।" তৎপরে স্নেহময়ী জননীর মতো হস্তদ্বারা সুবোধের চিবুক স্পর্শ করিয়া চুম্বন করিলেন।

(উদ্বোধন ঃ ৩৪ বর্ষ ১২ সংখ্যা)

স্বামী সুবোধানন্দের মহাসমাধি

স্বামী কালেশানন্দ

(একখানি পত্র)

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

বেলুড় মঠ
১৪ পৌষ ১৩৩৯ সাল

শ্রদ্ধেয় নরোত্তম মহারাজ,[১]

প্রণাম। আপনাকে আজ কি খবর জানিয়ে পত্র লিখব। আপনি তো মহারাজের[২] সকল খবরই জানেন, আপনি লিখেছেন মহারাজের শেষ সময়ের অবস্থা জানাতে ও তিরোধান উৎসবের খবর জানাতে। আমার শরীর মন ভাল নয় বলে আপনাকে এ পর্যন্ত কিছু জানাতে পারি নাই। আপনাকে না জানালে হয়ত অত্যন্ত দুঃখিত হবেন তাই সংক্ষেপে কিছু জানাচ্ছি। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় চিকিৎসায় কোন পরিবর্তন হচ্ছে না দেখে অন্য কাহাকেও দেখাতে বা অন্য কোন চিকিৎসা করাতে বললেন। শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয় পূজার পর পর্যন্ত চিকিৎসা করেন। তারপর গণনাথ সেন চিকিৎসা করেন তাহাতে কিছু হলো না, পরে একজন অবধূত ও তারপর একজন কবিরাজ কিন্তু কেহই কিছু করতে পারল না। শরীর শুকাইয়া অস্থিচর্মসার হয়ে গিয়েছিল।

শরীর যাওয়ার পূর্ব দিনের খবর।

শরীর যাওয়ার পূর্ব দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ১১½ টার সময় শরীরে কম্প হয়। আধ ঘণ্টা পরেও নাড়ি পাওয়া যায় নাই। সপ্তাহ খানেক পূর্বে একদিন এইরূপ অবস্থা হয়েছিল। তখন মঠের ডাক্তার মণীন্দ্র মহারাজ অন্যান্য ডাক্তারদের পরামর্শ নিয়ে কস্তুরি এবং অন্যান্য ঔষধ মিশানো মকরধ্বজ ব্যবস্থা করেন। ঔষধ খাওয়ার ঘণ্টা দুই পরে আবার নাড়ি সামান্য পাওয়া গেল এবং

১ স্বামী পরিশুদ্ধানন্দ
২ খোকা মহারাজ

মহারাজ একটু-আধটু কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। সন্ধ্যায় ডাক্তার কবিরাজ অনেক আসে। সকলেই বললেন আজ রাত্র কাটবে কি না সন্দেহ। মহারাজ কিন্তু প্রথম রাত্রেই জিজ্ঞাসা করলেন—"আজ কি বার?" অভয়[৩] মহারাজ বললেন—"বৃহস্পতিবার।" কাল কি বার? শুক্রবার। মহারাজ আর কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। অভয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"কেন?" মহারাজ বললেন—"না এমনি জিজ্ঞাসা করলুম।" রাত্রি শেষে বললেন, "আশীর্বাদ করি তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস হউক।" মহারাজকে বলা হলো মঠের সকলকে খবর দেব? ঠাকুরের ছবি কাছে আনব? মহারাজ বললেন, "না খবর দিয়ে কাজ নেই। না না ছবির দরকার নাই। ঠাকুর, মা, স্বামীজী ও মহারাজ আসছেন, যাচ্ছেন, ছবি দিয়ে কি হবে।" রাত্রে বাহ্য না হওয়ায় অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। বাহ্যের জন্য অনেক কিছু করা হলো। ভোরে একটু দুধ, সামান্য একটু বেদানার রস বারংবার চলতে লাগল। ১০টার সময় কবিরাজ এল। তিনি নানারকম অনুপানের সহিত মকরধ্বজ ব্যবস্থা করে গেলেন এবং বলে গেলেন আজ আর দিন কাটবে না। সকল কথা মনে পড়ছে না। রাত্রে মহারাজ বলেছিলেন, আর ঔষধ খাব না। রাত্রে হিক্কা হয়েছিল, কবিরাজ পূর্বেই বলে গিয়েছিলেন এ অবস্থায় হিক্কা হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। ভোরে সিদ্ধেশ্বরবাবু[৪], তার স্ত্রী ও বাড়ির মেয়েরা মহারাজকে দেখতে এসেছিলেন কিন্তু মহারাজ তাহাদিগকে ঘরের ভিতর থাকতে দিলেন না। তাহারা বারান্দায় বসেই সব দেখছিল। দুপুরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। নাড়ি মন্দ হইয়া গেল। কিন্তু ঘরে কেহ আসিলেই জিজ্ঞাসা করেন—"কে?" আমরা নাম বলে দিতুম। গত রাত্রে একটুও ঘুমান নাই—ঘুম আসিলেই চক্ষু স্থির করিয়া চাহিয়া থাকিতেন। ২½ টার সময় মঠের সকলে কে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। একবারে শেষ সময়েও অর্থাৎ শরীর ছাড়বার ১৫ মিনিট আগে বিকাশ মহারাজ এলেন। অভয় মহারাজ জিজ্ঞাসা করলেন—"একে চিনতে পারছেন?" মহারাজ বললেন, "হ্যাঁ, বিকাশ।" তারপর বললেন, "এই শরীর থাক আর যাক ঠাকুর তোমাদের দেখছেন ও দেখবেন।" রাত্রেও

---

৩ স্বামী পরব্রহ্মানন্দ

৪ খোকা মহারাজের অনুজ

এরূপ বলেছিলেন। তারপরই চক্ষু স্থির, নাড়ি পাওয়া গেল না। ডাকলে চক্ষুর তারা নেড়ে দেখতেন মাত্র—সকলে ঠাকুরের নাম করতে লাগলেন। কয়েক মিনিট নাম করার পরেই দেখা গেল তিনি তিনবার হাসলেন। সঙ্গে সঙ্গে চক্ষের পাতা নেমে অর্ধনিমীলিত আকার ধারণ করল এবং ঐরূপ অবস্থায় যেন সামনের সকলকে দেখছেন। হাসির সঙ্গেই শরীর ছাড়লেন। শরীর একটু একটু করে ক্ষয় হওয়ায় অনেক যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল। সে কি ভীষণ যন্ত্রণা—সাধারণ লোক হলে চিৎকার করে সকলকে অস্থির করে তুলতেন। শেষের কয়েকদিন হারনিয়ার ব্যথায় বড় কষ্ট পেয়েছেন। কিছুই খেতে পারতেন না। ১২।১৩বার পায়খানায় বসতেন, পায়খানা যাওয়ার জন্য একটা গাড়িকমোড তৈয়ার করা হয়েছিল। শরীর ছাড়বার ২।৩ দিন পূর্ব হতে বিছানায়ই পায়খানায় যেতেন। তাও আবার উঠে বসে। শরীর যাওয়ার রাত্রে ৮½ টার সময় একটি ফটো তোলা হয়। প্রায় ৯টার সময় পূত দেহ সংস্কার কার্য আরম্ভ হয় এবং পৌনে বারটায় ঐ কার্য শেষ করা হয়।

মহাসমাধি উপলক্ষে ভাণ্ডারায় রাধাবল্লভি, মালপোয়া, লুচি, লেডিকেনি, শাক, আলু-কপির ডালনা, কিসমিসের চাটনি ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে হয়েছিল। প্রায় তিন হাজার লোক প্রসাদ পেয়েছিল, দেড় হাজারের উপর টাকা খরচ হয়েছে।

আমাদের কোথাও যাওয়া স্থির হয় নাই। অভয় মহারাজের শরীর মন খারাপ। আমারও সেইরূপ। অধিক আর কি লিখিব। নমস্কার জানিবেন ও চেনাশুনা সকলকে জানাবেন। আপনার শরীর এখন কেমন? পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের তত ভাল নয়। বিনোদ মহারাজের চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ইতি

আপনাদের অনন্ত চৈতন্য

(পরে স্বামী কালেশানন্দ)

(স্বামী সুবোধানন্দ স্মৃতি সঞ্চয়ন, দ্বিতীয় ভাগ। সঙ্কলক ঃ শ্রীঅবনীমোহন গুপ্ত)

দ্বিতীয় পর্ব

(১)

দুটি দেববালক

স্বামী জ্ঞানদানন্দ

[বেলুড় মঠ] "একদিন দুপুরে ঠাকুরের অন্নপ্রসাদ থালায় সাজিয়ে মহাপুরুষজীর ঘরে নেয়া হয়েছে। আমিও ঠাকুরের ফল-মিষ্টি প্রসাদ প্রত্যহ তাঁর জন্য যেমন নিয়ে যাই নিয়ে গেছি। গিয়ে দেখি মহাপুরুষজী সবেমাত্র খেতে বসেছেন। তাঁর ঘরের সামনে দিয়ে ঐ সময় খোকা মহারাজ স্নান করে নিজ ঘরে ফিরলেন। তা দেখে আমায় খোকা মহারাজকে ডাকতে বললেন। তিনি ঘরে আসতেই মহাপুরুষ মহারাজ নিজে খেতে খেতে ভাল ভাল প্রসাদ তুলে খোকা মহারাজের হাতে দিলেন। আর তিনিও হাঁটু গেড়ে পাঁচ বছরের বালকটির মতো আনন্দ করে তা বসে বসে খাচ্ছেন। ঐ দৃশ্য আমার মনে এক দিব্যানন্দের দোলা এনে দিয়েছিল—যেন দুটি দেববালক নিজেদের বয়স ও পদমর্যাদা ভুলে সেই অতীত দিনের শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে বসেছেন।"

(২)

সামান্য সেবা

স্বামী অনুপমানন্দ

"একদিন [বেলুড়] মঠে রাত্রিতে আছি। প্রিয় মহারাজ আমায় ডেকে বললেন—'তুই গা হাত পা টিপতে পারিস?' আমি জানি বলাতে তিনি পূজ্যপাদ খোকা মহারাজের (স্বামী সুবোধানন্দের) খাটের কাছে আমাকে নিয়ে গিয়ে বললেন—'মহারাজের গা হাত পা একটু টিপে দে।' পা টিপতে গিয়ে

দেখি পায়ের গুলি ও উরু বেশ শক্ত। ...আমারও তখন শরীর বেশ সবল ছিল। আমার টেপাতে তিনি আরাম বোধ করতে লাগলেন। সে দিন খোকা মহারাজের সামান্য সেবা করতে পেরে নিজেকে কৃতার্থ মনে করলাম।”

(৩)

সরল দিব্যহাসি

স্বামী অপূর্বানন্দ

[বেলুড় মঠ] দুপুরে মহাপুরুষজী বিশ্রাম করছিলেন—সাধু মহারাজরাও। আমি চুপচাপ বসেছিলাম মহাপুরুষজী যে বারান্দাটিতে বসেছিলেন সেখানে, শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরের দিকে মুখ করে। বেশ ভাল লাগছিল। আড়াইটার পর পূজনীয় খোকা মহারাজ উপর থেকে নেমে এলেন, হাতে একটি ছোট ঝুড়ি ও দড়ি। একা বসে আছি দেখে তিনি একগাল হেসে বললেন—“তুমি এখানে বসে আছ! এসতো একটু আমার সঙ্গে। বাগানে কিছু কলম বাঁধবো—তুমিও শিখে নিতে পারবে।” তাঁর হাত থেকে ঐ ঝুড়িটি নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চললাম। তিনি পাশের বাগানে ঢুকে জামরুল, আম, বাতাবিলেবু প্রভৃতি গাছের সরু সরু ডালে কলম বাঁধতে লাগলেন। নানা কথার মাধ্যমে তিনি ঐ কাজটি শেখাচ্ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন অন্তরঙ্গ পার্ষদের অত ঘনিষ্ঠ পরিচয় ও অন্তরঙ্গ সঙ্গ আমার ক্ষুদ্র জীবনে বিশেষ প্রেরণার উৎসস্বরূপ হয়েছিল। কাজমাত্রকেই বড় করে দেখা—এটি শিখেছিলাম পূজনীয় খোকা মহারাজকে সব কাজ শ্রদ্ধা ও প্রীতির সঙ্গে করতে দেখে। তিনি এমন সরল ও সহজভাবে কথাবার্তা বলছিলেন যে, তাঁর সেই বালকোচিত সারল্য আমার অন্তরকে মুগ্ধ ও দ্রবীভূত করে। তাঁর নিরভিমান সাদাসিধে অনাড়ম্বর জীবন দেখে কিছুতেই বোঝা যেত না যে, তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন সন্ন্যাসী পার্ষদ। তাঁর দাঁত ছিল না। কৃত্রিম দাঁতও তিনি ব্যবহার করতেন না—মুখখানি ছেলেমানুষের

মতো সুন্দর ও পবিত্রতাপূর্ণ। তিনি খুব হাসতেন। ঐ সরল দিব্য হাসি তাঁর অন্তরের আনন্দ প্রকাশ করতো। তিনি বয়স্ক প্রবীণ এবং বহু সম্মানিত পদে অধিষ্ঠিত অথচ নিজের হাতে ওসব কাজ করছিলেন আনন্দে ও স্বেচ্ছায়—এটি আমার বিশেষ বিস্ময়ের কারণ হয়েছিল। প্রায় দেড়-দু ঘণ্টা তিনি বাগানে কাজ করলেন—অনেকগুলি কলম বাঁধলেন—আরো আরো কাজ পর্যবেক্ষণ করলেন।

(৪)

হুবহু খোকাটি

স্বামী তারকেশ্বরানন্দ

পূজ্যপাদ আচার্য খোকা মহারাজ [স্বামী সুবোধানন্দ] যুগাবতার শ্রীশ্রীঠাকুর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিশেষ কৃপা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে এর চেয়ে আর কিছু বড় কথা আছে কিনা আমার জানা নেই।

তাঁর সম্বন্ধে কিছু লেখা এবং ঠিক ঠিক ভাব প্রকাশ করা অতীব দুরূহ। যতই তাঁকে দেখেছি ও তাঁর সম্বন্ধে চিন্তা করেছি ততই এ কথা দৃঢ়বদ্ধ হয়েছে। কেন? তাঁর নামেই এ কথার যথার্থ প্রতীয়মান। ঐ যে ষষ্ঠিপর খোকাটি একেবারে হুবহু খোকাটির ভিতর সেই বৃদ্ধ, অতিবৃদ্ধ বাস করতেন, তাহা অতি নিপুণ ব্যক্তিরও বুদ্ধিগ্রাহ্য হতো না। খোকা তো খোকা। একেবারে খোকা, ঠিক ঠিক বালক ভাব। পরমহংসের যে বালক ভাব তাও নয়, ঠিক স্বাভাবিক বালক ভাব। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। প্রভুর অদ্ভুত লীলায় অদ্ভুত ঐশ্বর্য! প্রভুর ভাব তিনিই বুঝেন, তাঁর ঐশ্বর্য তিনিই বুঝেন। মানবীয় মন-বুদ্ধিতে ভগবৎ ঐশ্বর্য ধারণা হয় কি? খোকা মহারাজ শ্রীশ্রীপ্রভুর বালক ভাবে একেবারে খোকা। তাই তিনি স্বয়ং নাম দিয়েছিলেন 'খোকা'। প্রায়ই দেখা যায় ভক্তরা

তাঁদের ইষ্টকে অতি সঙ্গোপনে হৃদয় কন্দরে লুক্কাইত রাখেন, যেন কেহ কোন রকমে টের না পায়। শ্রীশ্রীঠাকুরের অপরাপর অন্তরঙ্গ শিষ্যমণ্ডলীর জীবন যাহারা দেখেছেন, তাহারা ইহা জানেন। তাঁদের মধ্যে আবার স্বামীজী, শরৎ মহারাজ ও মাস্টার মহাশয় এ বিষয়ে অগ্রণী ছিলেন বলে শুনেছি ও দেখেছি। তথাপি দেখেছি...এত চাপা সত্ত্বেও উদ্দীপক কারণ হলেই দেখা যেত তাঁরা প্রভুর প্রসঙ্গ আরম্ভ করেছেন।

আত্মারাম মহাপুরুষদের ইষ্ট-বিনা তৃষ্ণাত্যাগ হওয়ায়—তাঁদের হৃদয়ে ইষ্ট-বিনা আর কোন জিনিস না থাকায়, তাঁরা যখনই ঢেকুর তোলেন ঐ ইষ্টেরই ঢেকুর। আশ্চর্যের বিষয় আমাদের এই বৃদ্ধ খোকাটি কিন্তু বড় সহজে আঁচড় দিলেও তাঁর মণিকোঠার সন্ধান দিতেন না। পর্যবেক্ষণ করে, বিচার করে, ব্যাপার দেখে মনে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ উপস্থিত হতো। কেহ কেহ একেবারে সাধারণ লোক ঠাউরে বসতেন। শুনে সন্দেহ বেড়ে যেত। হবারই কথা, কাঁচা মন, তখন কি এটি বুঝি যে এটি প্রভুর বালক ভাব! মনে হতো হাঁ, খোকা নাম বালক ভাব বটে, কিন্তু বালকের মধ্যেও জ্ঞানের ঐশ্বর্য প্রকাশ কিছু না কিছু থাকবেই। তখন কে বুঝতো যে এবার শ্রীশ্রীপ্রভুর ঐশ্বর্যহীন লীলা। তখন কি বুঝতাম যে, যে বালককে প্রথম দর্শনেই শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁহার অনুচর বলে চিনতে পেরেছিলেন এবং দ্বিতীয় দর্শনের দিন দক্ষিণেশ্বরে শিবমন্দিরের সিঁড়ির উপর বসিয়ে যার জিহ্বাগ্রে স্বহস্তে অঙ্গুলি দ্বারা ইষ্টমন্ত্র লিখে দিয়ে এবং বক্ষাদি স্পর্শে যার হৃদ্‌গ্রন্থি এককালে ছিন্ন করে দিয়ে তৎকালেই ভাবসমাধিস্থ করেছিলেন, সে বালক সাধারণ নয়, প্রভুর লীলার সহায়ক! শুনা যায় ঐ দিন খোকা মহারাজের সঙ্গে আর একটি বালক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপালাভ করেছিলেন কিন্তু তাঁর ক্ষেত্র তাদৃশ উর্বর না থাকায় তৎকালে কোন আধ্যাত্মিক অনুভূতি প্রকাশ পায়নি; পরে তিনি ধর্মজীবন লাভ করেছিলেন।

মানুষের ক্ষুদ্র মন বুদ্ধি। ক্ষুদ্র বা মলিন হলেও সে সকল বিষয় যাচাই করে নিতে চায়। যাচাই করা ভাল, কিন্তু সেরকম গিরিশ ঘোষের মতো পাঁচ সিকা পাঁচ আনা বুদ্ধি তো চাই। মহাপুরুষদের বুঝা, তাঁদের জীবনের গভীর

আধ্যাত্মিকতা উপলব্ধি করা আমাদের মতো ছটাকে বুদ্ধিতে কুলায় না। তদুপরি সহজ সরল ভাব বুঝা যে কিরূপ শক্ত ব্যাপার তার দৃষ্টান্ত পূজ্যপাদ খোকা মহারাজের জীবন এবং শ্রীশ্রীমায়ের জীবন যতই অনুধ্যান করি কুল কিনারা পাওয়া যায় না। যেন সহজ হয়েই আরও জটিল। বাউল বলেন—"সহজ না হলে সহজকে যায় না চেনা।" অতি সত্য কথা। আমরা পেঁচালো হয়ে সহজকে কিরূপে বুঝব? প্রভুর এবার সহজভাব ততোধিক সহজ জননী আমার। অদ্ভুত সহজ ঠিক যেন গৃহস্থ বাড়ির সাধারণ মেয়েটি। ঐশ্বর্যের লেশ নেই। অথচ ষড়ৈশ্বর্য যাঁর পদতলে, যিনি কটাক্ষে জগদ্ব্যাপার করছেন—তিনি সাধ করে ঘর নিকুচ্ছেন, বাসন ধুচ্ছেন। আবার ঠিক পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের মতো পরিধানে মলিন বস্ত্র, হাতে দুখানি রুলি। একেবারে সহজ। তাই বাবুরাম মহারাজ মায়ের সেই সহজভাব লক্ষ্য করে বলেছিলেন—"ঠাকুরের বরং বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, তাঁর ভাবাবেশ সমাধি এসব আমরা জন্মে দেখেছি—কত দেখেছে। কিন্তু মার—তাঁর বিদ্যার ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত। এ কি মহাশক্তি!" ভক্ত সাধক গেয়েছেন—"গুপ্ত অবতারে সুগুপ্তা জননী অতি সত্য কথা।" তাই বলছিলাম যেমন সহজ মা আমার তেমনি সহজ তাঁর খোকা।

একদিন উদ্বোধনে শ্রীশ্রীমা স্ত্রী-ভক্ত পরিবেষ্টিতা হয়ে নিজ কক্ষে বসে আছেন, এমন সময় পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ হঠাৎ মাতৃসমীপে উপস্থিত। গিয়েই মাকে প্রণাম করে একেবারে বালকের মতো খাপছাড়া প্রশ্ন—"মা, কেমন করে লোককে দীক্ষাদি দিব?" মাও তার স্বভাব চিনতেন, হেসে বললেন, "ঐ দেখ অত বড় ছেলের কেমন ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন। কেন, ঠাকুরের নাম দেবে!" পরে মাকে প্রণামানন্তর নিচে নেমে এলেন। শুনেছি ইতঃপূর্বে শ্রীশ্রীমা খোকা মহারাজকে লোকশিক্ষার্থে আদেশ করেছিলেন, তাই পরে হঠাৎ এরূপ প্রশ্ন।

এবারের লীলায় সহজভাব একেবারে আগাগোড়া, কারো কারো জীবনে কিঞ্চিৎ বিদ্যার ঐশ্বর্যের প্রকাশ, কারো বা তাহাও নেই। লীলানায়কের কি অভিপ্রায়—কলির জীব অল্পবুদ্ধি, সহজে লীলা করলে সহজে বুঝতে পারবে?

ফল কিন্তু অনেক স্থলে উল্টো দেখা যাচ্ছে; সহজ হয়েই ধাঁধাঁ বেশি লাগিয়েছেন। আমাদের মতো তথাকথিত বুদ্ধিমানেরা এই সহজদের গভীরতা বুঝতে না পেরে অবিশ্বাস করে বসেন। অল্পবুদ্ধি সেয়ানের দল। তারা মোটেই বুঝে না এই সরল সহজদের গভীরতা। তাই বলছিলাম সহজ হয়ে আরও কঠিন হয়েছেন। "বাউলের দল এল, গেল কেও চিনলে না," মুষ্টিমেয় সৌভাগ্যবান ভিন্ন। যখন লীলা প্রায় শেষ, হাট ভেঙে গিয়েছে, তখন যতসব পণ্ডিত মূর্খের দল চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে।

কি দেখছো? এস যদি সহজকে চিনবে, সহজদের সম্বন্ধে যদি কিছু লিখতে হয়, যদি তাঁদের প্রচার করবার বাসনা থাকে, তবে নিজেকে সহজ হতে হবে। সেজন্য চাই গভীর সাধনা। 'বুড়ি' না ছুঁলে 'চোর' থাকে। আর চোরের কথা কি কেউ বিশ্বাস করে ভাই? এক কান দিয়ে শুনবে, আর এক কান দিয়ে বের করে দেবে। যদি 'বুড়ি' ছুঁয়ে শুদ্ধ নিষ্পাপ হতে পার, তখন কিছু লিখো। না হলে নিছক ঘটনাবলীর সন্নিবেশ অথবা দু-চারটে অসাধারণ ঘটনার উল্লেখ মাত্র করে ইতিকর্তব্যতা শেষ করতে হবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী পাকা হাতে ঢের লেখা হয়েছে, কিন্তু জগৎ—সে ঠিক গজেন্দ্রগমনে নিজ গতিতে চলেছে। ও যে কুকুরের লেজ! ওকে যতক্ষণ টেনে ধরে রাখা যায় ততক্ষণই সোজা থাকে—ছেড়ে দিলেই বক্রাকৃতি! নিজমূর্তি! আর যাঁর জগৎ তিনি একে সোজা করবার জন্য মধ্যে মধ্যে নিজে আসেন এবং উপযুক্ত লোক সঙ্গে করে আনেন। তাঁরা ভিন্ন কার সাধ্য যে একে সোজা করা দূরে থাক একটুখানি শিক্ষা দেয়? একটুও বেশি বলছি না—বিচার করে দেখবেন। আম খেতে এসেছি, আম খাওয়াই ভাল, চেঁচামেচি করলে শেষে পেট ভরবে না।

তবে কি এইসব মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা হবে না? নিশ্চিত হবে, হওয়া উচিত এবং কল্যাণকর সন্দেহ নাই। কিন্তু মাদৃশ অজ্ঞ লোকের দ্বারা নয়। যোগ্য ব্যক্তি এই মহৎ জীবনী আলোচনা করলে বড়ই ভাল লোকে অনেক শিখতে পারে।

আর এক কথা। বনে[১] এসেছি নিছক বনমালীর চিন্তার জন্য। যখন ব্রজে যাব এবং যদি প্রেরণা পাই তখন ব্রজবালকগণের বিষয়ে কিছু লেখার কথা চিন্তা করা যাবে।

(৫)

তাঁর কাছে একটুও ভয় হতো না

স্বামী সদাত্মানন্দ

খোকা মহারাজ যখন ভুবনেশ্বরে ছিলেন তখন জঙ্গলে বেড়াতে যেতেন; জঙ্গলে একরকম কাঁটা গাছে ফল হয়, তাহা ছেলেমানুষের মতো তুলে নিজে খেতেন এবং আমাদেরও দিতেন। একটা গাছের ঝোপের ভিতর গিয়ে ঝুপ করে বসে পড়তেন আর ছোট ছোট পাখির দল সশব্দে বাহির হয়ে যেত। প্রায় রোজই এরূপ করতেন।

পুরী হতে ভুবনেশ্বর আসছেন—সেই দুপুর রৌদ্রে কোন কুলি নেই বা গাড়ি নেই, নিজেই বিছানাপত্র নিয়ে স্টেশন হতে চলে আসতেন। তিনি যে শ্রীশ্রীঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ, এ কথা কাহাকেও ভাবতেই দিতেন না। আমরা মহাপুরুষ মহারাজ, শরৎ মহারাজ এঁদের ভয় করতুম। কিন্তু খোকা মহারাজ আমাদের সঙ্গে এরূপ মিশতেন যে আমাদের তাঁর কাছে একটুও ভয় হতো না। সময় সময় বলতেন—এসো মণীন্দ্র পাঞ্জা ধরি—দেখি কার পাঞ্জায় কত জোর।

আহারাদি আমাদের সঙ্গে বসে করতেন। শুইবার বিছানাপত্র বিশেষ ছিল না, অধিকাংশ দিন দেখতুম মাথার নিচে হাত দিয়ে শুতেন। বেলুড় মঠেও দেখেছি নিজে কাস্তে কোদাল নিয়ে কাজ করতেন। চলাফেরা এত সাদাসিধে

(১) লেখক স্বামী তারকেশ্বরানন্দজী এই সময়ে হিমালয়ে তপস্যারত ছিলেন। স্বামী পরব্রহ্মানন্দকে লিখিত তাঁহার একখানি পত্রের নকল হইতে এই প্রবন্ধ সঙ্কলিত।

ভাবে করতেন, কাহারো ধরবার বা জানবার সাধ্য ছিল না যে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ। ভালবাসাও কি কম? অসুখ করেছে—দিনের ভিতর দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করতেন—কেমন আছ, কি খাবে?

একদিন আমরা খেতে বসেছি, মঠের একজন সাধু সম্বন্ধে আমরা কথা তুলেছি। খোকা মহারাজও আমাদের সঙ্গে বসেছেন। তিনি প্রথম শুনে গেলেন। কতক্ষণ পরে বললেন—"তোমরা তার নিন্দা চর্চা করছো, তোমাদের যদি ঐরূপ অবস্থা হয়, তাহলে অন্যেও তোমাদের ঐরূপ বলতে পারে। অতএব কাহারো নিন্দা চর্চা করিও না।"

(৬)

এরপর কেবল আনন্দ

বিজয় গোপাল

আমি একজন ডিসপেপটিক রোগী—পেটরোগা। কখন কেমন থাকি, খোকা মহারাজ সর্বদা জিজ্ঞেস করতেন। ভুবনেশ্বর, কাশী, পুরী ইত্যাদি স্থানে তাঁর সঙ্গে দেখা ও একসঙ্গে অনেক দিন থাকা হয়। আমায় খুব ভালবাসতেন। আমার যাতে শারীরিক ও মানসিক কোন অসুবিধা না হয়, সে ব্যাপারে তাঁর খুব লক্ষ্য ছিল। সাধন ভজন সম্বন্ধে বলতেন—"একমাত্র ঠাকুরের চিন্তা করলেই মন শুদ্ধ পবিত্র ও স্থির হয়। কেউ আর তাঁকে মন দিয়ে ডাকছে না, কিরূপে মন স্থির হবে।"

তিনি যখন ধ্যান করতেন, দেখতুম শেষরাত্রে বিছানায় বসে আছেন। তাঁর কাছে অনেকক্ষণ বসে থাকলে একটুও ভয় হতো না। কিন্তু রাখাল মহারাজ বা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে ভয় হতো।

দেখতুম অপরের যাতে কোন অসুবিধা না হয় এজন্য তিনি সর্বদা

এরূপভাবে থাকতেন যেন তাঁর নিজের কোনই অসুবিধা নেই, তাঁর নিজের অসুবিধা কাহাকেও জানতেই দিতেন না। খুব সাদাসিধেভাবে থাকতেন। কাশীতে যখন তাঁর আমাশয়, বললেন—"আমি বললেই এখনই সেবাশ্রম হতে লোক পাই এবং ভাল বন্দোবস্তও হয়। তা কেন বলতে যাব, তাদের কত কাজ।"

কুসুমের কথা আমাকেও বলেছিলেন। বলেছিলেন, "এরূপ ভক্তি-ভালবাসা থাকলে ভগবান আপনার হন।"[১] একদিন সীতাপতি মহারাজ[২] জিজ্ঞেস করেন—"মহারাজ, স্বামীজী [বিবেকানন্দ] বড় না ত্রৈলঙ্গস্বামী বড়?" খোকা মহারাজ তখন কাশীতে। তিনি বলেন—"Trailanga swami is the greatest among men, but swamiji is Siva Himself, ত্রৈলঙ্গস্বামী মনুষ্য মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু স্বামীজী স্বয়ং শিব।" ঠাকুরের কাছে কেহ স্বামীজী সম্বন্ধে একটু মিথ্যা বললে বা তাঁর নিন্দা করলে ঠাকুর সেখানে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিতে বলতেন। বলতেন, "এখানে শিবনিন্দা হয়েছে, একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে দে।"

একদিন আমি খোকা মহারাজকে হাওয়া করছি, এমন সময় মনে হলো এঁরা অর্থাৎ ঠাকুরের অন্তরঙ্গগণ দেহান্তে কোথায় যাবেন? অমনি আমার দিকে

---

১ কুসুমের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে এই ঃ রাঁচিতে কুসুমনাম্নী কোন ভদ্রমহিলা খোকা মহারাজের নিকট দীক্ষা প্রাপ্ত হন। কুসুমের মৃত্যুর দিন, রাত্রে পাড়ার মুখুজ্জে মহাশয় ও তাঁর স্ত্রী (উভয়েই শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত) স্বপ্নে দেখেন খোকা মহারাজ কুসুমের হাত ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন।

খোকা মহারাজ এরপর যখন রাঁচিতে আসেন তখন তাঁকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন যে তিনি এ বিষয়ে কিছু জানেন না, যদি ঠাকুর দয়া করে জানিয়ে দেন তবে বলবেন।

এরপর কাশীধামে খোকা মহারাজের শরীর অসুস্থ হয়। রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায় ভাবছিলেন—মৃত্যুর পর লোক কোথায় যায়—এই তো কুসুম, সে দিন মারা গেল, সেই বা এখন কোথায়? এইরূপ ভাবার পর একটু তন্দ্রার মতো হয়। তখন দেখেন একটি ছোট মেয়ে এসে তাঁকে বাতাস করছে। সে-ই কুসুম। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তাও হয়। তাতে তিনি জানতে পারেন যে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেবই খোকা মহারাজের রূপ ধরে এসে কুসুমকে তার মৃত্যুর দিন হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। (বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'উদ্বোধন' ১৩৩১, মাঘ সংখ্যা দ্রঃ —সঙ্কলক)

২ স্বামী রাঘবানন্দ

পাশ ফিরে বললেন, "এরপর কেবল আনন্দ—আনন্দধাম—সেখানে আর কিছুই নেই।"

শেষ জন্ম সম্বন্ধে তিনি আমাকে এইরূপ বলেছিলেন, "ঠাকুরের ভাব নিয়ে কামকাঞ্চন ত্যাগ করে, ভগবান লাভই মনুষ্য জন্মের উদ্দেশ্য করে যে সাধন-ভজন করবে তারই শেষ জন্ম।"

(৭)

আমি খোকা

স্বামী রাঘবেশ্বরানন্দ

একদিন সকাল বেলা বেলুড় মঠে গিয়ে দেখি খোকা মহারাজ পায়চারি করছেন। হঠাৎ আমাকে দেখে হেসে উঠলেন। আমি সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করলাম। বাড়ির সকলকার কথা জিজ্ঞেস করে আমাকে বললেন—"চল মঠে শাকের বাগান দেখে আসি।" আমি মহারাজের পিছু পিছু চলতে লাগলাম। শাকের মাঠে ঢুকে নিস্তব্ধ হয়ে দাঁড়ালেন। প্রায় দশ মিনিট এই অবস্থায় ছিলেন। এতক্ষণ দাঁড়ানো অবস্থায় দেখে আমি একটু বিরক্ত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম—কখনো কখনো শিশুর মতো হাসছেন আবার কখনো কখনো গম্ভীর হচ্ছেন। প্রায় দশ মিনিট পরে আমাকে বললেন—"দেখ এখানটায় পূর্বে খুব বন ছিল। আমি আর স্বামীজী [বিবেকানন্দ] একদিন বন ভেঙে এই পর্যন্ত এসেছিলাম। এখানটায় এলেই স্বামীজীর কথা মনে হয়।" প্রায় আধঘণ্টা বেড়ানোর পর আমরা তাঁর ঘরে এলাম।

আমাকে তামাক সাজতে বললেন, তামাক সেজে দিলাম।

শুয়ে শুয়ে তামাক টানতে লাগলেন, আর আমার সঙ্গে পাঁচ বছরের শিশুর মতো কথা বলতে লাগলেন।

একদিন মেসে [Mess] আমার খুব জ্বর হয়। মনের অবস্থা খুব খারাপ। খোকা মহারাজকে চিন্তা করছি। মনে হচ্ছিল বোধ হয় তাঁর প্রসাদ পেলে জ্বর সেরে যাবে। চিন্তা করতে একটু তন্দ্রার মতো এলো। সেই অবস্থায় মিনিট দশ পরে শুনতে পেলাম কে যেন বলছে—"নরেনবাবু কে? তিনি কোন্ ঘরে থাকেন?" এই বলতে বলতে একজন সন্ন্যাসী প্রসাদ হাতে আমার ঘরে এসে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনার নাম নরেনবাবু?" আমি বললাম, "হাঁ।" "দেখছি আপনি খুব অসুস্থ, নিন খোকা মহারাজ আপনাকে প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, কোনো ভয় নেই।" এই কথা বলে সন্ন্যাসীটি চলে গেলেন। আমি সেই অবস্থায় প্রসাদ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। মহারাজকে স্বপ্নে দেখলাম।

প্রায় এক ঘণ্টা পরে ঘুম ভাঙলো। উঠে বসলাম। শরীরের অবস্থা খুব ভাল বোধ করতে লাগলাম। মনে হলো আমার কোন অসুখ হয়নি।

মহারাজ জামতাড়া থেকে অসুস্থ হয়ে কলকাতায় বাগবাজারে উদ্বোধন কার্যালয়ে এসেছেন। আমি দর্শন করতে বাগবাজারে গেলাম। তাঁর ঘরে গিয়ে দেখি যেন তাঁর হাড় কখানা বিছানায় পড়ে আছে। মনে মনে ভাবছি—এ যাত্রায় বুঝি আর টিকবেন না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলেন। বললেন—"কি নরেন, আমাকে চিনতে পাচ্ছ—আমি খোকা। দেখিসনি ছোট খোকারা না হাঁটতে পারে, না বসতে পারে, সর্বদাই তাদের শুয়ে থাকতে হয়।" এইরূপ অনেকক্ষণ শিশুর ন্যায় ঠাট্টা তামাশা করতে লাগলেন। তখনকার সেই দৃশ্য দেখে কে বলবে যে তিনি অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছেন।

প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমাকে বললেন—"দেখ, একটি মায়ের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব। মেয়েটির বেশ ভক্তি বিশ্বাস আছে। তার একটি মাত্র ছেলে ছিল। ছেলেটি মারা গিয়েছে, খুব শোক পেয়েছে, সর্বদাই ছেলেটির জন্য কান্নাকাটি করে, তুমি মাঝে মাঝে তার খোঁজ-খবর নিয়ো।"

(৮)

আমি তোকে দীক্ষা দিব

স্বামী ঋষিকেশানন্দ

বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠে বহু পূর্ব হতেই যাতায়াত ছিল। সেখানে অনেক সাধুদের সহিত পরিচয় থাকায় ১৯২৫ খ্রিঃ জানুয়ারি কি ফেব্রুয়ারি মাসে, যখন ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলের হোস্টেলে থাকা হয়, সে সময়ে আমি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করি। এই [ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন] আশ্রমের সাধুদের মধ্যে একজন আমার ভাই ছিলেন বলে এই আশ্রম আমার কাছে ঘনিষ্ঠ হতে ঘনিষ্ঠতর হয়ে উঠলো।

পরীক্ষার পর প্রত্যহ বিকালে আশ্রমে যেতাম। এই সময় আমাদের হোস্টেল বন্ধ হওয়ায় জগন্নাথ-কলেজ হোস্টেলে গিয়ে থাকলাম। আশ্রমে প্রত্যহই সাধুদের সঙ্গে আলাপাদি হতো। সন্ধ্যার পর হোস্টেলে ফিরতে রাত আটটা নয়টা হয়ে যেত।

একদিন সন্ধ্যার সময়ে আশ্রমে বেড়াচ্ছিলাম, এমন সময় আশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিশ্বরঞ্জন মহারাজ [স্বামী হরিহরানন্দ] পুকুর ঘাটের চাতাল হতে আমায় ডাকলেন। তিনি ঘাটের চাতালের একদিকের বেঞ্চে বসে অপর দিকের বেঞ্চে বসা একটি বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর সঙ্গে কথাবার্তা বলছিলেন। আমি সেখানে যেতে তিনি সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসীটিকে দেখিয়ে তাঁকে প্রণাম করতে বললেন। প্রণাম করতেই তিনি সাধুটিকে আমার পরিচয় বললেন, "মহারাজ, এই ছেলেটি সু—মহারাজের ভাই, এবার ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল থেকে পরীক্ষা দিয়েছে।" তারপর বৃদ্ধ সাধুটির কথা আমায় বললেন—'ইনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন সাক্ষাৎ শিষ্য।"

সাধুটি তখন আমার নাম-ধাম প্রভৃতি জিজ্ঞেস করে, কেমন পরীক্ষা দিয়েছি

তারও খোঁজ নিলেন। একটি বিষয় খারাপ হয়েছে বলায় তিনি বললেন—“ও কিছুই নয়, তুই পাশ করবি।”

মনে মনে ভাবলাম—কি জানি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্য যখন, কথা সত্যিই হবে। পরে ওখানে থেকেই পরীক্ষা পাশের সংবাদ জানতে পেরে খুব আনন্দ হলো। সঙ্গে সঙ্গে সাধুটির প্রতি শ্রদ্ধাও বেড়ে গেল। তাঁকে এই প্রথম দেখি এবং এই খোকা মহারাজের সহিত আমার প্রথম পরিচয়।

‘শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য’ শুনে একটু আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলাম। কারণ ১৯২০।২১ সালে যখন বেলুড় মঠে যেতাম তখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের মধ্যে রাখাল মহারাজকে মাত্র দেখেছিলাম। তাঁর অন্য কোন শিষ্য জীবিত ছিলেন কিনা তা জানতাম না এবং কখনো খোঁজও করিনি। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের শেষের দিকে বসুমতী পত্রিকায়—‘বেলুড় মঠের চূড়া খসিল’ শিরোনামায় রাখাল মহারাজের দেহত্যাগের সংবাদ জেনে ভেবেছিলাম—শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ শিষ্যটিও বুঝি গত হলেন। সেই থেকেই ধারণা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের আর কোন শিষ্য জীবিত নেই। তাই হঠাৎ ইনি একজন শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য শুনে আশ্চর্যান্বিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম।

পড়াশুনার চাপ না থাকাতে ক্রমশ সকালে বিকালে দুবেলাই আশ্রমে যেতে আরম্ভ করলাম। সেখানে গিয়ে কোন স্বামীজীর সঙ্গে কোন ক্লাসে [পাঠচক্রে] যাওয়া, গানে যোগ দেওয়া, ধর্মবিষয়ক বই পড়া অথবা কোন স্বামীজীর সহিত সদালাপ করে কাল কাটাতে লাগলাম। কখনো কখনো উক্ত বৃদ্ধ সাধুটির কাছেও যেতাম—তাঁর কাছে বেশিরভাগ প্রণাম করতে যেতাম। ঐ সময়ে তিনি নানা বিষয়ক কথা বলতেন।

ছেলেবেলা থেকে আমি মা কালীর ভক্ত ছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণও মায়ের সাধক ছিলেন বলে তাঁকে খুব ভাল লাগতো ও ভক্তি করতাম। তবে মা কালীকে যে চক্ষে দেখতাম সে চক্ষে কখনো দেখিনি।

দীক্ষাদি নেবার কথা কখনো উঠলে বা কেহ কখনো বললে বলতাম—“সময় হলে গুরু নিজেই এসে দিবেন।” সেজন্য আমি কখনো আগ্রহান্বিত

হইনি। ধ্রুব প্রহ্লাদ ও অন্যান্য বহু ভক্ত-সাধকের জীবনী দেখিয়ে আমার যুক্তি খাড়া করতাম এবং আমার ঐ প্রকার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল।

এইভাবে কিছু দিন কাটলো। একদিন সকালে আশ্রমে গেছি, বৃদ্ধ সাধুটি আমাকে ডেকে পাঠালেন। সে দিনটি গুরুবার [বৃহস্পতিবার]। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করলাম। তিনি আমাকে তাঁর খাটের উপরই বসতে বললেন। আমাকে সঙ্কোচ করতে দেখে তিনি পুনরায় বসতে বললেন এবং তাঁর আদেশ অনুযায়ী সেই খাটেই বসলাম। তখন তিনি সস্নেহে বিশেষভাবে অনেকগুলি প্রশ্ন করলেন। তার কয়েকটি মাত্র প্রশ্নোত্তর এখানে দিলাম ঃ

প্রশ্ন—তুই কোন্ দেবতা মানিস?

উঃ—মা কালী আমি ভালবাসি ও তাঁকেই মানি। অন্য দেব-দেবীকেও ভক্তি করি—তবে মা-ই আমার প্রাণের জিনিস।

—তাঁর বিষয় কি ভাবিস বলতো?

—মায়ের নাম জপ করি তাঁর রূপ ধ্যান করি।

—ধ্যানে কি দেখিস?

—জ্যোতির মধ্যে সেই রূপ দেখি, কখনো কখনো শুধু জ্যোতি দেখতে থাকি। কখনো ঐ জ্যোতি দেখতে দেখতে নিজেকে ভুলে গিয়েছি। বেশি ধ্যানেতে নিজেকে ভুলে গিয়ে কখনো ভোর হয়ে গেছে; জেগে অন্যে দেখতে পাবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি উঠে বেড়াতে গেছি।

—তুই কি দীক্ষা নিয়েছিস?

—দীক্ষা আবার কি নেবো? মায়ের নাম জপ করি। এমনি করতে করতে যখন সময় হবে গুরু নিজেই এসে দীক্ষা দিবেন। প্রহ্লাদ ধ্রুব প্রভৃতি কত ভক্তকে নারদ নিজেই এসে দীক্ষা দিয়েছেন। আমিও কখনো কারো কাছে যাব না এবং যখন তিনি নিজেই আসবেন তখন দীক্ষা নেবো।

এই বিষয়ে নানারূপ কথাবার্তা হবার পর তিনি আরও কাছে টেনে নিলেন ও আমার হাত ধরে বললেন—"আমি তোকে দীক্ষা দিব।" তখন আমার আর

কথা বলবার শক্তি নেই, শুধু হতভম্ব হয়ে বসে রহিলাম। তখন তিনি তাঁর কাছে বসিয়ে সেই খাটের উপরই দীক্ষা দিলেন। পরে দীক্ষা বিষয়ক বহু উপদেশ দেন। তাঁর কাছে প্রায় সমস্ত সকালটাই কেটে গেল। দুপুরে তিনি আমাকে আশ্রমেই প্রসাদ পেতে বলেন। আমি প্রসাদ পাব স্বীকার করলে পর ছেড়ে দিলেন।

ইতঃপূর্বে আমি যদিও আশ্রমে যাতায়াত করতাম কখনও ঠাকুরের ফল-প্রসাদ ছাড়া গ্রহণ করতাম না, কারণ 'প্রসাদ' বলিতে দেখিতাম কোন প্রকার দোকানের মিষ্টি। উহাই বোধ হয় ঠাকুরকে নিবেদন করা হতো। আমি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্তি-রহস্য পড়বার পর—'দোকানের খাবার খাব না' বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এবং সেই প্রতিজ্ঞাই কয়েক বছর পর্যন্ত ছিল। আশ্রমেও কতবার সাধুদের অনুরোধেও দোকানের মিষ্টি খাই নাই।

পরে স্নানাদি করে ঠাকুরঘরে গেলাম। ঠাকুরঘর থেকে ফিরে খেতে যাই। খেতে বসে দেখি সম্মুখে বিরাট থালায় ভাত ও কতকগুলি বাটিভরা তরিতরকারি ও পায়েস উপস্থিত। সাধুরা বললেন—'ইহা প্রসাদ, খাও, খোকা মহারাজ এই থালায় খেয়ে তোমার জন্য সমস্ত রেখে গেছেন।" সাধুদের স্নেহের ও ভালবাসার প্রসাদ পেয়ে আশ্রমেই বিশ্রাম করি।

তিনটার সময় আবার আমার ডাক পড়লো। আমি তাঁর ঘরে গেলাম। প্রথমে তাঁর সঙ্গে নানাপ্রকার কথা হলো। তিনি আমায় একটি কাজ করতে বললেন—"পারিস?" আমি ইতস্তত করাতে তিনি বললেন—"আচ্ছা থাক।" তিনি কয়েকটি প্রশ্ন করেন, আমি উত্তর দিই। পরে বললেন—"আজ থেকে আমি তোর জীবনের ভার নিলুম।"

তাঁর সঙ্গে কথাবার্তার পর সন্ধ্যারতি দেখে হোস্টেলে চলে যাই।

পরদিন থেকে আশ্রমে গিয়ে তাঁর সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে আলাপ করতাম। এই প্রকারে তাঁহার সহিত আমার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয়ে উঠলো। ক্রমে তাঁর অযাচিত ভালবাসা বিশেষ করে অনুভব করতে লাগলাম।

কিছুদিন পরে তিনি ঢাকা হতে সোনারগাঁও নামক একটি আশ্রমে চলে যান।

ঢাকায় আমাকে প্রত্যহ দুবেলাই রোদে দু-তিন মাইল পথ হেঁটে মঠে যাতায়াত করতে দেখে মঠের সাধুরা বাড়ি না যাওয়া পর্যন্ত আশ্রমেই থাকতে বলেন। আমি অস্বীকার করি। পরে বিশেষ ভাবে পুনঃ পুনঃ বলাতে আমার জিনিসপত্র হোস্টেলে রেখে আশ্রমেই এসে বসবাস করতে থাকি। এখানে আসাতে সাধুসঙ্গ ও মহারাজের উপদেশ মতো সকাল সন্ধ্যা ও রাতদুপুরে উঠে বিশেষভাবে ধ্যান-জপ করবার সুবিধা পেলাম। রাত্রে অতিরিক্ত মশার তাড়নায় কখনো কখনো কম্বলে সমস্ত শরীর ঢেকে পুকুরের ঘাটে বসে কাল কাটাতাম। দিন পনের পরে কলকাতা যেতে চাহিলে সাধুরা আরো কিছুদিন থাকতে অনুরোধ করেন ও লাঙলবন্ধ স্নান-মেলা দেখে যেতে বলেন। সেবারের স্নান-মেলায় নাকি বহু বৎসর পর একটি পূর্ণ যোগ হয়েছিল। অতএব আশ্রম থেকে স্বামীজীদের সঙ্গে লাঙলবন্ধে অষ্টমী-স্নান যোগে যাই। মেলা থেকে ধীরেন মহারাজ [স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ] ও অন্যান্য সাধুদের সঙ্গে সোনারগাঁ আশ্রমে বেড়াতে যাই। সেখানে ['প্রেমানন্দ স্মৃতি' মন্দিরে] একদিন একরাত্রি ছিলাম। এই আশ্রমে পরমপূজ্য খোকা মহারাজের সহিত দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়। তারপর মেলা শেষ হবার পূর্বেই আমি ঢাকা এসে সঙ্গীদের সাথে কলকাতা রওনা হই।

(৯)

ভগবানের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা

স্বামী কালেশানন্দ

সবেমাত্র গ্রাম ছেড়ে নারায়ণগঞ্জে এসেছি, এসে ভাইদের কাছে থাকি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত পড়ে জেনেছিলাম যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেহরক্ষা করেছেন [১৮৮৬ খ্রিঃ]। ভেবেছিলাম 'কথামৃতে' নরেন্দ্র [বিবেকানন্দ] প্রভৃতি যাঁদের ঠাকুর অন্তরঙ্গ বলে নির্দেশ করতেন তাঁরা সবাই বেঁচে আছেন। তাঁদের দেখবার জন্য একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা মনে জাগতো। কিন্তু পাড়াগেঁয়ে ছেলে, মনে ভয়

হতো কি করে সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখি। তখন বেলুড় মঠের বিষয়ে কিছু জানতাম না—'কথামৃতে' শুধু বরাহনগর মঠের উল্লেখ দেখেছিলাম। 'কথামৃত' প্রথম ভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ তখন কিনে পড়েছিলাম।

পরে দৈনিক 'বসুমতী'-তে পড়ি—শ্রীশ্রীমা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ইঁহারা পর পর দেহরক্ষা[১] করেছেন। তখন মনে বড় দুঃখ হলো—আমি হতভাগ্য, তাই তাঁদের শ্রীচরণ দর্শন ভাগ্যে ঘটলো না।

দূর থেকে বাবুরাম মহারাজকে যেন ঘোড়ারগাড়িতে বসা অবস্থায় দেখেছিলাম। [ইহা অবশ্য ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দের পূর্বের কথা][২] আর দূর থেকে দেখেছিলাম স্বামী শিবানন্দজী ও স্বামী অভেদানন্দজী মহারাজদ্বয়কে—যখন নারায়ণগঞ্জে একটি জনসভায় তাঁদের অভিনন্দন দেওয়া হয়।

খোকা মহারাজকেও প্রথম দর্শন করি নারায়ণগঞ্জে। সে বছর [১৯২৪ খ্রিঃ] তিনি সোনার-গাঁয়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের মন্দির [প্রেমানন্দ স্মৃতি-মন্দির] প্রতিষ্ঠার জন্য পূর্ববঙ্গে এসেছিলেন। দ্বিতীয় দর্শনও নারায়ণগঞ্জেই হয়। এই দুইবার অল্পক্ষণের জন্য তাঁহাকে দেখি। কোন কথাবার্তা হয়নি।

তৃতীয়বার তাঁকে দেখি ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর কি নভেম্বর মাসে। তখন আমি নারায়ণগঞ্জে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের কোন অসুস্থ সেবকের বদলি হিসাবে জুলাই মাস হতে আশ্রমেই থেকে একটি স্কুলে কতকগুলি ছেলেকে পড়াতাম। পড়িয়ে যা পেতাম (১৮ টাকা) তা সেই অসুস্থ সেবককেই দিতাম।

খোকা মহারাজ শ্যামাপূজার পরদিন বেলুড় মঠ থেকে রওনা হয়ে এসেছিলেন। আমি তাঁর আসার দুদিন পরে কৃপাপ্রার্থী হয়ে আমার নিবেদন জানাই। তাতে তিনি বলেন—"কাল হবে।"

---

১ এঁদের দেহরক্ষার কাল ঃ শ্রীশ্রীমা—জুলাই ১৯২০ খ্রিঃ
স্বামী ব্রহ্মানন্দ—এপ্রিল ১৯২২ খ্রিঃ
স্বামী তুরীয়ানন্দ—জুলাই ১৯২২ খ্রিঃ

২ শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দের দেহত্যাগ ১৯১৮ খ্রিঃ।

আমি নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে আসবার পর থেকেই দেখতাম—সাধুরা ও অন্যান্য বাহিরের ছেলেরা ঠাকুরঘরে বসে ধ্যান জপাদি করেন। তা দেখে আমারও ইচ্ছা হলো যে আমিও ঐরূপ করি। কিন্তু দীক্ষা তো হয়নি, তাই মাঝে মাঝে প্রার্থনা করতাম—"হে ঠাকুর তুমি আমায় জানিয়ে দাও আমি কি জপ করি, আমায় কৃপা কর।" এরূপ একটা আকুল প্রার্থনা তখন সর্বদা মনে প্রবল ছিল। একদিন রাত্রে স্বপ্ন দেখি—ঠাকুর এসে বলছেন, "তুই এই মন্ত্র জপ কর।" পরদিন ঘুম থেকে উঠে স্বপ্নের কথা ভেবে মনে খুব একটা আনন্দ অনুভব করতে লাগলাম। সেই দিন থেকে ঠাকুরঘরে গিয়ে সেই মন্ত্র জপ করতাম। ইতঃপূর্বে আমি কখনো ঠাকুরঘরে একদিনও যাইনি। স্বপ্নের কথাও কাউকে বলিনি।

যা হোক, তিনি এলেন তাঁর কাছে দীক্ষার জন্য নিবেদনও জানালাম কিন্তু স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের কথা তাঁকে বলিনি। ভাবলাম তিনি যা দিবেন তা যদি স্বপ্নে পাওয়া মন্ত্রের সঙ্গে মিলে যায় তবেই তাঁকে বলবো, নতুবা নয়।

পরদিন স্নানাদি করে কিছু ফুল ও ফল নিয়ে দীক্ষার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। দীক্ষা হবে বলে তখন বুক আনন্দে দুড়দুড় করছিল। তিনি আগে ঠাকুরঘরে গিয়ে পূজাদি করলেন। তারপর একজনকে ডাকলেন—(সে দিন আমরা দুজন দীক্ষা প্রার্থী ছিলাম।) অপর দীক্ষার্থী আগে ভিতরে গেলেন। তাঁর দীক্ষা হয়ে গেলে আমি গেলাম। ঘরে ঢুকে দেখি তাঁর বুক মুখ চোখ লাল। আমি প্রথমে ঠাকুর প্রণাম করে উঠলে তিনি আমাকে একটি নির্দিষ্ট আসনে বসতে বললেন। তিনি আমাকে যেরূপ করতে বললেন ও দেখিয়ে দিলেন আমি সেইরূপ করলাম। পরে তিনি দীক্ষা-মন্ত্র বললেন ও আমাকে সেইরূপ উচ্চারণ করতে বললেন। আমি তাঁর আদেশ অনুযায়ী সকল করলাম। পরে তাঁর হাতে ফল দিয়ে ও পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তাঁকে ও ঠাকুরকে বারবার প্রণাম করলাম। পরে বাইরে এলাম। স্বপ্ন লব্ধ মন্ত্রের সঙ্গে তাঁর প্রদত্ত মন্ত্রের ঐক্য দেখে যে কী আনন্দ অনুভব করেছিলাম, তা বলবার নয়।

পরে তাঁকে এক সময়ে স্বপ্নলব্ধ মন্ত্রের কথা বলায় তিনি বলেছিলেন—

"ঠাকুরের খুব দয়া তোমার উপর। তবুও একজনের কাছে শুনে নিতে হয়। তাতে বিশ্বাস আরও বাড়ে।" আরও দু-একটি কথা ঐ সম্বন্ধে বলে দিলেন।

এবারে যখন তিনি নারায়ণগঞ্জে আসেন তাঁর সঙ্গে দুটো তুলোর কম্বল, একটা বালিশ, একটি মোটা খদ্দরের চাদর একটি বেতের ঝুড়িতে ছিল। আর ছিল কাপড়-জামা ও সামান্য কয়েকটি জিনিস, পায়ের চটিজুতো। এখনও চোখে ভাসে তাঁর সাদাসিধে ভাবে চলাফেরার ছবি। একটা ফতুয়া গায়ে, একটা পাতলা চাদর পৈতার মতো কাঁধে ফেলে তখন তিনি চলাফেরা করতেন। বেলুড় মঠেও তিনি এরূপ করতেন; দেখলে কেউ মনে করতে পারতো না যে ইনি শ্রীশ্রীঠাকুরেরই একজন অন্তরঙ্গ। তিনি বলতেন—"নিচে যখন যাই তখন [বাইরের লোক] কেউ কাছেও আসে না। উপরে এসে চেয়ারে বসে তামাক খেতে দেখলেই সেই লোকই প্রণাম করে আর ভাবে মস্ত বড় সাধু।" এত নিরভিমানী ছিলেন তিনি!

খাওয়া-দাওয়া সম্বন্ধেও তেমনি সাদাসিধে ভাব—আশ্রমের মুষ্টিভিক্ষার চাল, মসুর ডাল, মাছ ও একটু সিদ্ধ—তাই দিয়েই আনন্দে খেয়ে উঠতেন। রাত্রে রুটি ডাল দুধ ও একটু তরকারি। ডাল তাঁর প্রিয় ছিল মনে হয়। নারায়ণগঞ্জ আশ্রমে যতদিন ছিলেন আমরা তাঁকে এক বাটি ডাল দিতাম। তাই খেয়ে চক্রবর্তীকে [ব্রহ্মচারী চিৎচৈতন্যকে] বলতেন, "আমার ডাল ভাতই বেশ ভাল।" চক্রবর্তীর সঙ্গে বেশ রঙ্গরস হতো। তামাক খাওয়া হলে বলতেন—"চক্রবর্তী এই নাও।" কলকেটা হাতে তুলে দিতেন। না হয় বলতেন—"ওই দিকে লোক আছে, নিয়ে যাও।" তিনি জানতেন চক্রবর্তী তামাক খায়।

আশ্রিতদের শারীরিক ও মানসিক উন্নতির দিকে তাঁর বিশেষ লক্ষ্য ছিল। মনে পড়ে তিনি আমাকে আমার যখন যা দরকার কিনে আনতে বলতেন। একদিন বললেন—"তোমার কি চাই?" আমি বললাম—"কি আর চাই—যার জন্য এখানে আসা তাই চাই।" তিনি বললেন—"তা কি পাও নাই?" আমার তখন মনে হলো যেন আমার প্রাপ্তব্য সবই পেয়েছি। বাস্তবিক তাঁর কাছে থাকার সময় মনে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ সর্বদাই অনুভব করতাম।

তিনি বললেন—"উহা তো আছেই তবু বিছানাপত্র কাপড়-জামা কিছু দরকার আছে কিনা?" ভাবলাম—এঁদের কাছে যা চাইবার তা না চেয়ে সামান্য জিনিস কি চাহিব। তিনি দু-তিনবার জিজ্ঞাসা করাতে আমার সে সময়কার দরকারি একটি জিনিসের কথা বললাম। তিনি তাহা তো কিনাইয়া দিলেনই, আর দু-তিনটি জিনিস অন্যকে দিয়ে আনিয়ে দিলেন।

পূর্ববঙ্গে তাঁর বেশিরভাগ শিষ্যই গরিব, তাদের মধ্যে কিছু অনুন্নত জাতির শিষ্যও ছিল। তিনি তাদের সমধিক স্নেহ করতেন। ঢাকা জেলার লতবদী গ্রামে তিনি অনেককে (প্রায় পঞ্চাশ জন) কৃপা করেছিলেন। তাঁকে যাতে তারা নির্ভয়ে আপনার বলে ভাবতে পারে এরূপ ব্যবহারই তিনি তাদের সঙ্গে করতেন। একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ করছি ঃ

একদিন ঐরূপ কয়েকজন শিষ্য তাঁকে দর্শন করতে ঢাকা গিয়েছে, তারা নিচে মেঝেতে বিছানো সতরঞ্জির উপর বসে কথাবার্তা বলছেন—তিনি ছিলেন তক্তপোশের উপরে। এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক এলেন। তারা উঁকি দিয়ে দেখলেন ঘরের মেঝেতে সেই লোকেরা বসে আছে, আর মহারাজ তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। মেঝেতে বসবার মতো আরও স্থান ছিল। খোকা মহারাজ ভদ্রলোকদের দেখেই মেঝেতে বসা লোকদের বললেন—"তোরা খাটের উপর উঠে আয়।" তারা খাটের উপর বসতে ইতস্তত করছে দেখে তিনি একটু জোরের সহিত বললেন—"আমি বলছি, আর তোরা কথা শুনছিস না? তোরা না উঠে বসলে ওরা ঘরে আসতে পারছেন না—ওরা তোদের সঙ্গে বসবেন না।" তখন তারা মহারাজের পাশে খাটে উঠে বসে এবং বাহিরের ভদ্র ব্যক্তিরা ঘরে ঢুকে মেঝেয় বসেন। এই ঘটনাটি আমি খোকা মহারাজের নিজমুখে শুনেছিলাম। এই রূপেই তিনি তাঁর আশ্রিতদের সহিত সস্নেহ ব্যবহার করতেন।

শোকার্তকে সান্ত্বনা দানে ও তার শোকাপনোদনে তাঁর অসাধারণ ক্ষমতা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। একবার তাঁর কোন আশ্রিত ভক্তের উপার্জনক্ষম পুত্র কলেরা রোগে মারা যায়। সেই ভক্ত-পরিবারের সকলেই প্রাণে বিষম আঘাত

পান। মৃত ছেলেটির বড় বোন শোক সম্বরণ করতে না পেরে বাড়িতে খোকা মহারাজের নিত্যপূজিত যে পটখানি ছিল তাহা আছাড় দিয়ে ফেলে দেয়। তারপর তার এমন একটা অস্বাভাবিক অবস্থা হয় যে সে অবস্থা পাঁচ-ছয় দিন চেষ্টা করেও কেউ দূর করতে পারেনি। সকলের মনে ভয় হলো বুঝি বা মেয়েটি পাগলই হয়ে যাবে। খোকা মহারাজ তখন বিলনীয়া কি চাঁদপুরে ছিলেন। কয়দিন পরেই নারায়ণগঞ্জ এলেন এবং সেই দিন বিকেলেই সেই ভক্তটির বাড়ি গেলেন। তাঁকে দেখেই সেই ভক্ত পরিবারের সকলের শোক আবার উথলে উঠলো। ছেলের মা একখানি চেয়ারে মহারাজকে বসিয়ে দিয়েই, তাঁর পা দুখানি ধরে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদেন আর বলেন—"বাবা কেন আমি শান্তি পাচ্ছি না, কেন তার জন্য দুঃখ হয়।" মহারাজ তার মাথায় হাত বুলিয়ে এবং নানারূপ সান্ত্বনা বাক্যে তাকে শান্ত করে দিলেন। খানিক পরে দেখা গেল তিনি যে এত বড় পুত্রশোক পেয়েছিলেন তার চিহ্নমাত্রও চোখে মুখে নেই।

সে বাড়িতে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে মহারাজ চললেন সেই মৃত ছেলের ভগ্নির বাড়ি। সঙ্গে সেই ছেলের পিতা ও আমি। সে বাড়িতে গিয়ে দেখি সেই মৃত ছেলের ভগ্নি আলুথালু বেশে জানালার ধারে বসে আছেন। মহারাজ তার কাছে যেতেই তিনি বলে উঠলেন—"কেন এসেছ, যাও চলে যাও।" আর মহারাজের দিকে কটমটিয়ে একদৃষ্টিতে দেখতে লাগলেন। মহারাজ তাকে তক্তপোশের উপর বসালেন—তার বাবাকেও বসালেন—নিজেও বসলেন। আমি বাহিরের ঘরে গিয়ে বসলাম। তারপর কি হলো আমি জানি না। কিছুক্ষণ পরে কি কারণে আমাকে ডাকা হলে আমি ভিতরের ঘরে গিয়ে দেখি, সেই মৃত ছেলের শোকার্তা বড় বোন মাথায় কাপড় দিয়েছেন—আর কাঁদছেন। জানা গেল এ কয়দিন তিনি কারো সঙ্গে কথা বলতেন না, কাঁদতেন না, অঙ্গসংস্কারাদির দিকে লক্ষ্য ছিল না, কাহাকেও দেখে ঘোমটা দিতেন না।

মহারাজ সে দিন একঘণ্টার বেশি সময় সে বাড়িতে ছিলেন। পরে সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময় আশ্রমে ফেরেন। সে বাড়ি থেকে ফেরবার পূর্বে আর একবার আমাকে অন্দরে যেতে হয়েছিল। তখন দেখি সেই স্ত্রীলোকটি একেবারে

শান্ত—যেন ইতঃপূর্বে কিছুই হয়নি। বেশ শান্ত স্বাভাবিকভাবে মহারাজের সহিত কথা বলে তাঁকে এগিয়ে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে গেলেন।

১৯২৬ খ্রিস্টাব্দে খোকা মহারাজের সঙ্গে আমি কলকাতা আসি। আমার অনেক দেখাশুনার ইচ্ছা ছিল, তিনি নিজে সঙ্গে নিয়ে আমাকে অনেক স্থান দেখিয়েছিলেন। যদি নিজে যেতে না পারতেন, অন্য কাউকে বলে দিতেন শ্রীঠাকুরের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়ে আনতে। তাঁর শরীর তখন খুব ভাল ছিল না আর সে সময়ে আমি তাঁর কাছে আট দিন মাত্র ছিলাম। আমার ইচ্ছা ছিল তাঁর কাছে থাকি ও তাঁর একটু-আধটু সেবা করি। শেষাশেষি সে বাসনাও তাঁর কৃপায় পূর্ণ হয়েছিল।

তিনি মাঝে মাঝে আমাকে জিজ্ঞেস করতেন—"কামারপুকুর জয়রামবাটী যাবে?" "পুরীতে মঠ-প্রতিষ্ঠা হচ্ছে, যাবে?" একজন কাশী যাচ্ছিলেন শুনে বললেন—"কাশী যাবে?" কেহ কেহ কেদার বদরী যাচ্ছিলেন শুনে বললেন—"কেদার বদরী যাবে?" আমি প্রতিবারেই বলেছিলাম—"এখন কোথাও যাব না মহারাজ, আপনার শরীর ভাল হোক, তারপর যাব।" কিন্তু তাঁর দেহ থাকতে আর কোথাও যাওয়া হলো না। তাঁর দেহরক্ষার পর অবশ্য তাঁর কৃপায় সেইসব স্থানে যাওয়া হয়েছিল।

নারায়ণগঞ্জে অনেকে তাঁর কৃপালাভ করে। অনেকগুলি মহিলা তাঁর নিকট প্রতিদিন বিকেলে আসতেন ও রাত আটটা-নয়টা পর্যন্ত থাকতেন। তাঁরা এলেই তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী—এঁদের কথা বলে নানা উপদেশ দিতেন। কেউ জিজ্ঞেস করলে নিজ জীবনের কথাও কিছু কিছু বলতেন। আবার নানারূপ হাসি-তামাশার গল্প বলে তাদের হাসাতেন। তারাও নিঃসঙ্কোচে বেশ জোরে হাসতেন। তিনি তাদের মন খুব উঁচুতে তুলে দিতেন বলেই তারা ওরূপ জোরে হাসতেন, নতুবা পাশে একঘর লোক, তারা তা বেশ জানতেন—কখনো ওরূপ হাসতে পারতেন না। তাঁর কাছে এসে তারা আনন্দে বাড়ি যাবার কথা ভুলেই যেতেন—মনে করিয়ে না দিলে ওঠবার নামটি করতেন না। এমনি নির্মল তাঁর ভালবাসা ছিল।

তাঁর ছেলেমানুষের মতো স্বভাব আমি তাঁর দেহরক্ষার পূর্ব পর্যন্ত দেখেছি। নারায়রগঞ্জে যেসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আসতো তাদের সঙ্গে এমন ব্যবহার করতেন যে তারা মনে করতো তিনি তাদেরই একজন। তারা নিঃসঙ্কোচে তাঁর সাথে খেলার সাথির মতো ব্যবহার করতো—আমরা দেখে অবাক হয়ে যেতাম।

নির্দোষ ফষ্টিনষ্টি করতে ও সকলকে হাসাতে তিনি খুব দক্ষ ছিলেন। বেলুড় মঠে থাকতে প্রায়ই নিচে বেড়িয়ে এসে ইজিচেয়ারে বসেই বলতেন—"আর কি, একটা 'ফায়ার' করে দাও।" আমি তামাক সেজে দিতাম। একদিন তামাক খেতে খেতে বলছেন—"আচ্ছা খুব শীতের সময় গঙ্গায় ডুবে মাছ ধরে এসে খুব কড়া এক ছিলিম তামাক খেলে কিরকম হয়?" বলছেন আর হাসছেন আর আমার মুখের দিকে তাকাচ্ছেন। বর্ষাকালে জেলেরা গঙ্গায় ইলিশ মাছ ধরতে আসে। একদিন বেলুড় মঠের ওপর তলার গঙ্গার ধারের বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছেন, আমি পাশে দাঁড়িয়ে আছি। বললেন—"দেখ জেলেটি এক হাতে তামাক খাচ্ছে, পায়ে দাঁড়, আর এক হাতে জালের সুতো ও দড়ি। ওর সমস্ত মনটা কিন্তু ঐ হাতের সুতোর ওপর পড়ে আছে—সুতো নড়লেই জাল টেনে তুলবে। সেইরকম মনটা ভগবানের পাদপদ্মে ফেলে রাখবে—জপ-ধ্যান সব সময়েই করতে হয়।" একদিন বিষ্ণুপুরাণ পড়ছিলেন—আমাকে ডেকে নিয়ে সেই পুরাণ থেকে একটি স্থান আমায় পড়তে বললেন। আমি পড়লাম—"চলিতে খাইতে বসিতে উঠিতে যে কোন কাজ করিতে করিতে সদা সর্বক্ষণ তাঁর নাম জপ করিতে হয়।" বললেন—"ঠাকুর যে নারদীয় ভক্তির কথা বলতেন, সে এই—সদা সর্বক্ষণ তাঁর নাম জপ করবে।" ধ্যানের কথায় বলতেন—"আগে গুরুকে চিন্তা করে, পরে ইষ্টকে।" জপের সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত আমাকে অধ্যাত্ম রামায়ণ থেকে দেখিয়েছিলেন। একটা কাক—কি নাম মনে নেই[১]—তৃষ্ণায় কাতর কিন্তু জল পান করতে পারছে না। পাছে জল পান করতে গেলে রাম-নাম বন্ধ হয়। শেষের দিকে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত

১ ভুষণ্ডী

থেকে আরম্ভ করে শিবপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, দেবীভাগবত, স্কন্দপুরাণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ প্রভৃতি অনেকগুলি পুরাণ পড়ে শেষ করেছিলেন। ঐগুলিতে যেখানে ভক্তির কথা অথবা সাধকদের প্রয়োজনীয় কথা থাকতো আমাকে ডেকে দেখাতেন। সময় সময় বলতেন—"কি নিয়ে থাকবো, ঠাকুর দেবতার কথা পড়া ও সেই নিয়ে থাকা ভাল; মন আর এদিক ওদিক যায় না।"

তাঁকে একজন ভক্ত জিজ্ঞেস করে—"আপনার কাছে যারা আসে তাদের কি ঠাকুর গ্রহণ করবেন?" তিনি উত্তর করেন—"গ্রহণ না করলে আমি তোদের নেব কেন? ঠাকুর ও মা বলেছেন, তাই তোদের নিচ্ছি, নতুবা কখনো নিতুম না।"

একদিন একটি ছেলে এসে বলে—"আমরা তো জপ-ধ্যান করতে পারি না মন-প্রাণ দিয়ে ঠাকুরকে ডাকতে পারি না—ঠাকুর কি আমাদের কোন উপায় করবেন?" মহারাজ বলেন—"তিনি উপায় না করলে তিনি না চাইলে এখানে এলি কি করে? আর এত ব্যাকুলতাই বা কেন? এই তো দেখছিস আজ মঠে কত লোক এসেছে (সে দিন রবিবার ছিল) কই তারা তো এখানে তোর মতো আসেনি বা কিছু জিজ্ঞাসা করে না। তারা এলো, মঠ দেখলো, বাগান দেখলো, আবার চলে গেল। কে তাঁকে তোর মতো চায়? তুই চাস বলেই এখানে এসেছিস।"

"ঠাকুরকে কি দেখতে পাবো?" প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলেছিলেন—"যে যাকে ভালবাসে সে যদি দেখা নাও দেয় তবু তাকে ভালবাসতে ছাড়ে না। তাঁকে ডেকে যাও, তিনি দেখা না দিলেও ডাকতে ছাড়বে না। তবে ষোলআনা মন দিয়ে ডাকলে তিনি আর থাকতে পারেন না, দেখা দেবেনই দেবেন।"

—"ষোলআনা মন দিয়ে ডাকতে পারছি কই? আর পাকা বিশ্বাসও তো হচ্ছে না।"

—"পাকা বিশ্বাস হলে আর বাকি কি রইলো?"

শরীর রক্ষার পূর্ব পর্যন্ত তাঁকে দেখেছি—যখন চলতে পারতেন রোজ ভোরে উঠে শৌচাদি সেরে গঙ্গায় যেতেন। গঙ্গা স্পর্শ করে ঠাকুরঘরে গিয়ে প্রণাম করে—শ্রীশ্রীমায়ের মন্দিরে, স্বামীজীর মন্দিরে ও মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) মন্দিরে প্রণাম করে ঘরে আসতেন।

অসুখ বেড়ে যাওয়ায় তাঁকে বেলুড় মঠের লাইব্রেরি বাড়ির[১] ওপরের একটি ঘরে রাখা হয়। সেখানে এসেও সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে জানালা দিয়ে মঠ-বাড়ির দিকে শ্রীশ্রীমায়ের মন্দির, স্বামীজীর মন্দির ও মহারাজের মন্দিরের দিকে ও গঙ্গার উদ্দেশে হাত জোড় করে প্রণাম করতেন।

যখন চলাফেরা একেবারে বন্ধ হলো, তাঁর ঘরে ঠাকুরের যে পট ছিল তাঁর দিকে জোড়হাতে সকালে সন্ধ্যায় ও রাত্রে শয়নের সময় প্রণাম করতেন।

গুরুভাইদের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি ভালবাসা ছিল। স্বামীজীর কথায় বলতেন—"কত রাত তাঁকে দেখেছি চোখে ঘুম নেই, ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আর কার সঙ্গে যেন কথা কইছেন। আমি মাঝে মাঝে দোর গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াতুম আমায় দেখে বলতেন—'খোকা ভাই এক গ্লাস জল দে, একটু তামাক দে।' এই রকম সব বলতেন। কতদিন তাঁর বিছানায় শুতে বলতেন। দু-এক দিন শুয়েছিও। একদিন বলেন—'এর পর তো কেউ আমায় কিছু দেবে না—তুই যা খাস আমাকে তাই দিস।' "

রাজা মহারাজ [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] সম্বন্ধেও অনেক কথা বলতেন। একদিন ভোরে মন্দিরাদিতে প্রণাম করে ওপরে এসে ইজিচেয়ারে বসেছেন। আমি তামাক দিতেই বললেন—"এখনো মহারাজ মঠের সব দেখছেন।" তখন তাঁর মুখ কেমন গম্ভীর, চোখ মুখ লাল।

কাজকর্ম সম্বন্ধে বলতেন—"কোন কাজ আধাআধি করা ভাল নয়।" আমি একদিন একটা কাজ করতে গিয়ে খানিকটা করে অন্য কি একটা কাজ করতে যাই। তিনি তা লক্ষ্য করেছিলেন। আমি ফিরে এলে বললেন—"Things

১ এখন (১৯৭৭) সেখানে বেলুড় মঠের মিশন অফিস।

done by half are never done right." আবার কোন জিনিস যা প্রয়োজনে আসতে পারে—নষ্ট হতে দিতেন না। বলতেন "যাকে রাখ সেই রাখে।" একদিন তাঁর ঘরে কি একটা প্যাকেট এসেছিল। সেটি অনেকগুলি সরু দড়ি দিয়ে বাঁধা ছিল আমি খুলে অপ্রয়োজনীয় কাগজ ও দড়ি ফেলে দিতে যাচ্ছি দেখে তিনি বললেন—"না না, দড়িটা ফেলো না, গুটিয়ে রেখে দাও—যাকে রাখ সেই রাখে"—দরকারে লাগবে।

একদিন একজন ভক্ত এলেন, তার মশারি খাটাবার দড়ি নেই দেখে আমাকে বললেন—"কেন, অনেক দিন আগে যে দড়িটা রেখেছিলে তাই দাও না।" আমি ভেবে অবাক হলাম—আমি রেখেছি আমার মনে নেই—তিনি তো বেশ মনে রেখেছেন!

দুজনে একটা বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় তৃতীয় ব্যক্তি এসে জিজ্ঞাসিত না হয়ে যদি কোন কথা বলতো, তিনি ভারী বিরক্ত হতেন—বলতেন, "তোমাকে তো জিজ্ঞাসা করিনি, তুমি কেন কথা বলছো?" আমি নিজেও সেজন্য তাঁর কাছে বকুনি খেয়েছি।

মঠের সকল বস্তুটিকেই তিনি ভালবাসার চক্ষে দেখতেন। সকলের স্বাস্থ্য কেমন আছে জিজ্ঞেস করতেন, গরুগুলোকে আদর করতেন। গাছের কলম বাঁধা, বাগান দেখা ইত্যাদি তিনি করতেন। যে সময়ের কথা বলছি, তখন তাঁর শরীর ভাল নয়, স্বাস্থ্য অনেকটা ভেঙে গিয়েছে। একদিন আমাকে নিয়ে তিনি কয়েকটি গাছে কলম বেঁধেছিলেন। পরে যথাসময়ে সেগুলি কাটিয়ে মঠে রোপণ করান এবং ভুবনেশ্বরে ও লক্ষ্ণৌয়ে রোপণের জন্য পাঠান। আমি যখন পরে ঐ দুই জায়গায় যাই তখন দেখি সেইসব কলমের গাছ অনেক বড় হয়েছে।

তিনি মঠের প্রায় সকলের সহিত সমভাবে মিশতেন, তাঁর কাছে কারো ভয়ের কারণ কিছু ছিল না। তিনি বলতেন—"কারু কাছে কিছু চাহিও না, লোকের কাছে চাইতে গেলেই ছোট হতে হয়—ওতে মনের স্বাধীনতা নষ্ট হয়।"

একদিন তাঁকে বলেছিলাম—"অমুক আমার সঙ্গে কথা বলে না।" তাতে

তিনি বলেন—"বেশ তো—কথা নাই বা বললে। তাতে আর কি হয়েছে? মানুষের ভালবাসা আর কতক্ষণ? নিজের স্বার্থসিদ্ধি না হলেই অমন হয়। ভগবানের ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা তাঁকে ভালবাসলে আর কোন ভয় থাকে না।"

সময় সময় তিনি এই কথাগুলি বলতেন ঃ

"রাখে কৃষ্ণ মারে কে?"

"যে করে আমার আশ, তার করি আমি সর্বনাশ।

তবুও না ছাড়ে আশ, তার হই আমি দাসের দাস ॥"

"গুরু মেহেরবান তো চেলা পহ্‌লোয়ান।"

"পূর্ব দিকে যত এগুবে পশ্চিম দিক তত পেছনে পড়বে।"

"যাহা কাম তাহা নাই রাম।"

"যখন যেভাবে মাগো রাখিবে আমায়, সেই সে মঙ্গল মা, যদি না ভুলি তোমায়।"

আরাত্রিকের সময় ঠাকুর-মন্দিরে যখন গাওয়া হতো—

"জ্যোতির জ্যোতি উজল হৃদি কন্দর
তুমি তম ভঞ্জন হার।"

তিনিও তখন (রোগশয্যায় শায়িত অবস্থায়) ঐ অংশটি দুই-তিনবার গাহিতেন।

(১০)

অসীম কৃপা

প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়

১৯১৫ খ্রিঃ আমরা খোকা মহারাজকে প্রথম রাঁচিতে আমাদের মধ্যে পাই। সেবার তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব উপলক্ষে রাঁচি এসেছিলেন। এর আগে

১৯১৩ খ্রিঃ স্বামী প্রেমানন্দ ও ১৯১৪ খ্রিঃ মহাপুরুষ মহারাজ রাঁচিতে ঐ উৎসব উপলক্ষে পদার্পণ করেছিলেন।

১৯১৩ সনে স্বামী প্রেমানন্দজীর আগমনে রাঁচির উপর দিয়ে প্রেমের হিল্লোল প্রবাহিত হলো। সে কী অদ্ভুত ভজন-সঙ্গীত ও ভাবময় নৃত্য! প্রেমানন্দজী আখর দিলেন—'প্রেমতরঙ্গের জন্য ভঙ্গ দিল গো।' অমনি সমবেত জনতার মধ্যে উৎসাহের বিদ্যুৎ প্রবাহ। এদিকে স্বামী প্রেমানন্দও একেবারে মেতে গিয়েছেন—দরদর ঘাম ঝরছে তবুও পুনঃ পুনঃ হুঙ্কার দিয়ে দ্বিগুণ জোরে নৃত্য করছেন, সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

পূজনীয় খোকা মহারাজ যখন আসেন তখনও এরূপ আনন্দের প্রবাহ। তাঁর কথা কতই না মনে পড়ছে—কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা লিখি।

আমরা তাঁর উপর ভালবাসার অত্যাচারই কি কম করেছি? রোজ এ বাড়ি ও বাড়ি করে তাঁকে অনেক বাড়িতেই খেতে হতো। সবাই খাওয়াবে—'না' বললেই মুখ ভার। একদিন, পয়লা বৈশাখ, এমন হলো যে বহু বাড়িতেই তাঁকে ভরপেট খেতে হলো। তার পর বোতল বোতল সোডা ওয়াটার দিয়ে সমাপ্তি। আমরা বিশেষ ভাবিত। একান্তে জিজ্ঞেস করলাম—"মহারাজ এত যে খেলেন, অসুখ করবে না তো?" তিনি হেসে বললেন—"ও কি আমি খেয়েছি—সব ঠাকুর ও মাকে নিবেদন করে দিয়েছি, দেখবেন কোন অসুখ করবে না।"

আবার কম খাওয়া বা না খেয়ে থাকার দৃষ্টান্তও আছে। একদিন আমার মেয়ে ননী (খোকা মহারাজ নাম দিয়েছিলেন মহামায়ী) খেতে দিয়েছে। মহারাজ নানা অছিলায় নাড়াচাড়া করছেন—আর বসে আছেন, মোটেই খাচ্ছেন না। আমি এসে দেখি মহামায়া ভাত তরকারি সব মেখে তাঁর মুখে তুলে দিচ্ছে আর অভিমানী ছেলেকে মা যেমন জোর করে খাইয়ে দেয় ঠিক তেমনি করে খাইয়ে দিচ্ছে। দেখে ভাবলাম—সত্যই খোকা। যাকে অপরে খোকার মতো দেখে ও তার সঙ্গে খোকার ন্যায় ব্যবহার করে সেই তো প্রকৃত খোকা। নইলে বুড়ো বয়সেও অনেকের ছেলেবেলাকার 'খোকা' নাম থেকে যায়।

একদিন নতুন গুড় এনে দেখাচ্ছি—অমনি এক টুকরো মুখে দিয়ে গিলে

ফেললেন। সময়ে অসময়ে মিষ্টি খাবার স্বভাবটিও ছিল তার ঠিক খোকাটির মতো।

মাঝে মাঝে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের কার কোন অংশে জন্ম ইত্যাদি নিয়ে জল্পনা করতাম। খোকা মহারাজকে জিজ্ঞাসা করায় বলেছিলেন—"খোকার অংশে জন্ম আর কি?" এমনি করে তিনি এসব প্রশ্ন হেসে উড়িয়ে দিতেন।

একদিন একটি স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলেছিলেন ঃ তিনি যেন ময়ূরে চড়ে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বতর লোকে উঠে যাচ্ছেন। দুধারে চতুর্মুখ, চতুর্ভুজ, দশভুজা ইত্যাদি নানা রূপধারী দেবদেবী রয়েছেন। তাঁদের ছাড়িয়ে তিনি আরও ঊর্ধ্বে উঠে গেলেন—একেবারে ঠাকুরের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলেন; স্থির করলেন আর পৃথিবীতে ফিরবেন না, ঠাকুর ও মার কাছেই থাকবেন। তখন ঠাকুর বললেন—"তুই তো বড় ব্যস্তবাগীশ—যা এখনো পৃথিবীতে তোর কাজ বাকি আছে।" আমরা শুনে বললুম—"তবে তো মহারাজ আমাদের প্রশ্নের জবাব পেলুম, ঠিক করে বলুন তো আপনার কার্তিকের অংশে জন্ম কি না।" মহারাজ হেসে বললেন—"সে আপনারা বলছেন—আমি কি জানি, কি বলবো।"

আমি একদিন তর্পণ করবার সময় এক চতুর্ভুজ জ্যোতির্ময় মূর্তি দর্শন করি। বিস্মিত হয়ে চোখে জলের ছিটে দিয়ে সামনের দিকে আবার তাকালাম, তখনও দেখি সেই মূর্তি। ক্রমে মনকে সংযত করে তর্পণ শেষ করলাম। পরে পাশের (ইন্দুবাবুর) বাড়ি গেলাম খোকা মহারাজকে ঘটনাটি বলতে। গিয়ে দেখি তিনি দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর দেওয়ালের দিকে মুখ করে বিশ্রাম করছেন। নিদ্রাভঙ্গের ভয়ে পা টিপে টিপে চলে আসবো ভাবছি—এমন সময় মহারাজ বললেন—"যা দেখেছেন সব সত্যি, আরও কত কি দেখবেন এ আর কি?" শুনে আমি স্তম্ভিত হইলাম।

একদিন খোকা মহারাজ তাঁর এক দর্শনের কথা আমাকে বলেছিলেন—গঙ্গার ওপর দিয়ে তিনি যেন হেঁটে যাচ্ছেন, কাশীর গঙ্গা। প্রায় মাঝ গঙ্গায়

পৌঁছে দেখেন এক উজ্জ্বল গৌরবর্ণা স্ত্রী-মূর্তির বুকের ওপর তিনি দাঁড়িয়ে। সেই স্ত্রী-মূর্তি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন—"কে, খোকা? মাই খাবি আয়! এই বলে বড় বড় মাই দুটি বের করে দিলেন। খোকা মহারাজও পেট ভরে মাই খেলেন। স্ত্রী-মূর্তি আবার জিজ্ঞেস করলেন—"কিরে, পেট ভরেছে? তবে এখন যা। আমরা আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলাম—"কে সেই স্ত্রী-মূর্তি, মহারাজ?" খোকা মহারাজ অপূর্ব হাসি হেসে বললেন—"কে আর—মা গঙ্গা।"

পূজনীয় খোকা মহারাজকে দেখেছি দীক্ষাদি দিতে হলে শ্রীশ্রীঠাকুরের অনুমতি নিয়ে তবে তাঁর নিজ মতামত প্রকাশ করতেন। পাটনার ধী—বাবু আমাকে এক চিরকুট পাঠিয়ে জানালেন—তার মায়ের দীক্ষা নেবার ইচ্ছা। শুনে মহারাজ কিছুক্ষণ মৌন থেকে বললেন—"অমুক দিন সকালে তাকে প্রস্তুত থাকতে বলবেন—তখন হবে।"

দীক্ষা সম্বন্ধে আর একটি ঘটনা—খোকা মহারাজ তখন রাঁচিতে ইন্দুবাবুর বাড়ি আছেন। একদিন দুপুরবেলা বিশ্রামান্তে হঠাৎ জানালেন তখনই তিনি দেওঘর যাবেন। কোন কারণ প্রকাশ করলেন না—যাবেন তো যাবেনই।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে তখন আমার ছেলে বাদল পড়তো। সেখানে গিয়ে তাকে ডাকিয়ে এনে বললেন—"তোর দীক্ষা হবে।"

আবার দীক্ষা দিয়ে তাঁকে অসহ্য যন্ত্রণা পেতেও দেখেছি। কাশীতে একজন মহিলাকে দীক্ষা দেবার পর দেখলুম তাঁর চোখ-মুখ লাল, যেন অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করায় বললেন—"দেখুন দীক্ষা দিলেই শিষ্যের ইহ-পারলৌকিক সমস্ত ভোগ গ্রহণ করতে হয়। কি করবো ওঁরা (শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমা) পাঠিয়ে দেন, না দিয়ে পারি না। আর লোক জানে আমরা শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তান। আমরা না দিলে যাবেই বা কোথায়? এর জন্যই তো ঠাকুরের আসা।"

পাটনাতে আমার দুইটি সন্তান পরপর কলেরায় মারা যায়। আমার স্ত্রী অত্যন্ত শোকাকুলা হয়ে পড়ে। তার সান্ত্বনার জন্য আমরা তাকে কাশী নিয়ে যাই। পূজনীয় খোকা মহারাজ তখন কাশীতেই ছিলেন এবং তিনিই কাশী থেকে

এই দুর্ঘটনা শুনে আমায় কাশী যেতে লিখেছিলেন—কাশীতে আমাদের থাকার বন্দোবস্তও তিনিই করে দিয়েছিলেন। রোজ দুপুরবেলা এসে আমার স্ত্রীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গে কথাবার্তা বলতেন এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় থাকতেন, তাকে মাঝে মাঝে বেড়াতে নিয়ে যেতেন। সময় এমনি সৎপ্রসঙ্গে ভরে রাখতেন যে আমার স্ত্রী একটুও অবসর পেতেন না মৃত সন্তানদের কথা স্মরণ করতে। কিছু দিনের মধ্যে এমনি করে ফেললেন যেন তার কোন দুঃখই নেই। এই প্রসঙ্গে তিনি আমায় বলেছিলেন—"দেখুন দুঃখ করে কি করবেন? এই দুঃখ আপনি অসহ্য বলে মনে করছেন, কিন্তু আপনার স্ত্রীটি যদি যান সেও তো আপনাকে সহ্য করতে হবে। ঠাকুর বলতেন, 'তারে বাড়া তারে বাড়া আছে' অর্থাৎ এগিয়ে দেখ, দেখবে এর চাইতে কত বড় বড় দুঃখ-কষ্ট মানুষকে সহ্য করতে হয়। দুঃখ সহ্য করবার ক্ষমতা মানুষ দুঃখের সঙ্গে সঙ্গে বাড়াতে পারে।"

এছাড়া অন্যান্য কথায়ও মাঝে মাঝে এমন ইঙ্গিত করতেন যার অর্থ আমার স্ত্রীও শীঘ্রই মারা যাবেন। সত্য সত্য আমার স্ত্রী আর ক-মাসের মধ্যেই মারা গেলেন। তখন আমি আগেকার ইঙ্গিতের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় তিনি বললেন—"আমি জানতাম উনি শীঘ্রই শরীর ত্যাগ করবেন, তাই আপনাকে পূর্ব থেকেই সাহস দিয়েছি।"

কষ্ট সহ্য করবার ক্ষমতা হরি মহারাজের (স্বামী তুরীয়ানন্দের) অদ্ভুত ছিল। কাশী সেবাশ্রমে তাঁর শরীরে ছয়টা অস্ত্রোপচার (Operation) হয়। ডাক্তার কাঞ্জিলাল প্রভৃতি সাত-আট জন বড় বড় ডাক্তার উপস্থিত। স্বামী সারদানন্দ এবং খোকা মহারাজও উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তারদের যন্ত্রাদি সমস্ত ঠিকঠাক। হরি মহারাজ বললেন—"কি, এখন হবে না কি?" শরৎ মহারাজ বললেন—"হাঁ।" হরি মহারাজ, "একটু অপেক্ষা কর" বলে, সনৎকে ডেকে তাঁকে বসিয়ে দিতে বললেন। বসে স্থির হয়ে মনকে শরীর থেকে উঠিয়ে নিয়ে ধ্যানস্থ হলেন। দু-মিনিট যায়, তিন মিনিট যায়—হরি মহারাজ সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। তখন শরৎ মহারাজের ইঙ্গিতে ডাক্তারেরা অপারেশান আরম্ভ করলেন। একে একে ছয়টা অপারেশান হয়ে গেল। তখনো হরি মহারাজ স্থির—নিস্পন্দ!

সমাধি ভাঙে না দেখে শরৎ মহারাজ হরি মহারাজের বুকে ও পিঠে মৃদু চাপ দিয়ে ওপর দিক থেকে নিচের দিকে হাত বুলাতে লাগলেন আর মৃদুস্বরে কি যেন বলতে লাগলেন। খোকা মহারাজও হরি মহারাজের গলা ধরে ঐরূপ কানের কাছে আস্তে আস্তে কি যেন উচ্চারণ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে হরি মহারাজের বাহ্য চেতনা ফিরে এল। ব্যথিত হয়ে বললেন—"কি? হয়ে গেল?" তারপর শরৎ মহারাজ ও খোকা মহারাজের দিকে চেয়ে বললেন—"একবার মনে করলাম দি শরীরটা ছেড়ে—আবার শরৎ এসে পড়লো—তাই টেনে রেখে দিলে, যেতে দিলে না।" খোকা মহারাজ বললেন—"শরীর ছাড়বো বললেই হলো? ঠাকুর কি আপনাকে বলেননি, এখনো অনেক কাজ বাকি আছে?" হরি মহারাজ বললেন—"হাঁ ভাই, ঠিক!" এ সমস্ত সময়েই আমি ঘরে ছিলাম। পরে খোকা মহারাজের নিকট বিস্ময় প্রকাশ করাতে তিনি বললেন—"হাঁ, মনকে খুব উঁচুতে নিয়ে গেলে ওসব (যন্ত্রণা) কিছুই বোধ হয় না।"

খোকা মহারাজের অসীম কৃপার কথা বলে এই স্মৃতি শেষ করি। আমি বিবাহিত, স্ত্রী তখনো বেঁচে আছে, তথাপি খোকা মহারাজ আমায় একদিন তাঁর ব্যবহৃত একখানা গেরুয়া কাপড় ও চাদর আমাকে দিয়ে বললেন—"যখন সন্ধ্যাহ্নিক করবেন তখন এগুলি পরে করবেন—পরে যখন ইচ্ছা হবে তখন সব সময়ই পরতে পারেন।" কী অসীম তাঁর কৃপা।

(১১)

আমি জেনেছি, খাঁটি বুঝেছি

সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ

কথাপ্রসঙ্গে খোকা মহারাজ একদিন বলেছিলেন—"ঠাকুরকে বলেছিলাম জপ-ধ্যান বেশি কিছু করতে পারবো না—আপনার নিকট এসেছি। ঠাকুর বলেছিলেন—'আচ্ছা।' কিন্তু পরে আমাকে দিয়ে খুব খাটিয়ে নিয়েছিলেন।"

(অর্থাৎ খুব জপ-ধ্যান করতে হয়েছিল।) মহারাজ যখন চুপ করে বসে থাকতেন অথবা যখন তামাক খেতেন তখন লক্ষ্য করতাম, তিনি তন্ময় হয়ে আছেন। এ সম্বন্ধে একবার জিজ্ঞাসা করাতে বলেছিলেন, "ধ্যান-জপে মন নিমগ্ন হয়, অভ্যাস কর তোমাদেরও হবে।"

তাঁর বুক রক্তাভ ছিল—এ বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। তিনি বললেন, "খুব ধ্যান-জপ করলে বুক লাল হয়।"

কাশীধামে অবস্থান কালে চন্দ্রগ্রহণের পরে গঙ্গায় স্নান করেছিলেন। আমাদের বলেছিলেন—"স্নান করে আবার তোমাদের নাম করে তিনবার ডুব দিলাম।" ইহা হতে বুঝতে পারা যায় তাঁহার আশ্রিতদের প্রতি কত কৃপা দয়া। সর্বদাই বলতেন—"তোমাদের ভক্তি বিশ্বাস লাভের জন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি।"

তিনি বলতেন—"ঠাকুরের তিরোধানের পর যখন দেশে দেশে হেঁটে বেড়াতাম তখন একখানা কৌপীন ও কমণ্ডলু ছাড়া সঙ্গে কিছুই রাখতুম না, মনে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যখন যাহা দরকার ঠাকুর দেবেন। শরীরের উপর দিয়ে বৃষ্টিপাত হয়ে যেত, ভিজে কৌপীন গায়ে শুকাইত, অন্য একখানা কৌপীন ছিল না যে বদলাই। পায়ে হেঁটে চলতে চলতে পায়ের চামড়া পুরু হয়ে কড়া পড়ে গিয়েছিল। রাত্রে খোলা মাঠে হাত মাথায় দিয়ে শুয়ে থাকতুম।" পরে যখন বালিশে শুতেন তখনো হাত মাথার নিচে দিয়ে শুতেন। এরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হেসে বলেছিলেন—"বহু দিনের অভ্যাস।"

একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন—"এখন দেখ মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি, মিশি, কিন্তু আমি পূর্বে মেয়েদের সহিত কথা কওয়া দূরে থাক, অন্য দিক দিয়ে চলে যেতাম। স্বামীজী [বিবেকানন্দ] উহা লক্ষ্য করে আমাকে বলেন—'খোকা, মেয়েরা ঠাকুরের কথা শুনতে আসে, তুমি বলবে, তাদের সঙ্গে মিশবে—এরা জগদম্বার রূপ।' এর পর থেকে মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্তা বলি।"

খোকা মহারাজের দয়ার পরিসীমা ছিল না। কত দরিদ্র আশ্রিতকে তিনি দান করতেন।

খোকা মহারাজ জোর করে বলেছিলেন—"যারা ঠাকুরের আশ্রয়ে এসেছে তাদের এই শেষ জন্ম। ছোট নৌকো, একটা কলাগাছও টেনে নিতে পারে না, কিন্তু একখানা জাহাজ আন্ধি বোট বড় বড় নৌকো এবং আরো কত কিছু টেনে নিয়ে যেতে পারে।"

একদিন বলেছিলেন, "আমি জেনেছি, খাঁটি বুঝেছি—কালী শিব কৃষ্ণ রাম—সবই ঠাকুর।"

আমরা লক্ষ্য করতাম, খোকা মহারাজ যখন যেখানেই থাকুন না, সর্বদাই মনের আনন্দে থাকতেন।

যখন জামতাড়ায় আমাশয় রোগে আক্রান্ত—একবার দেখতে গিয়েছিলাম। মহারাজ সহাস্য বদনে বললেন—"যিনি এই শরীর দিয়েছেন, তিনিই এরূপ অবস্থা করেছেন, যেমন উনুনে কাঠ জ্বালিয়ে দাও খুব দাউ দাউ করে জ্বলবে, আর কাঠ টেনে নাও সব ঠাণ্ডা। এই অসুখে ঠাকুর অনেক কিছু শিখালেন—উনুনে ভাত হচ্ছে অনেক।"

(১২)

মেয়েরা জগদম্বার অংশস্বরূপা

শ্রীমতী সুরবালা ঘোষ

খোকা মহারাজ শিশুর মতো সরল, স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ এবং ফুলের মতো নির্মল ছিলেন। তাঁর কথা আমরা লেখাপড়া জানি না, কি লিখবো। আমরা রাঁচিতে তাঁর কাছে দীক্ষা পেয়েছিলাম। তাঁর অপার স্নেহ ভালবাসা আশীর্বাদ পেয়ে আমরা ধন্য হয়ে গিয়েছি। দীক্ষার পর বলেছিলেন—তোমাদের সুবিধা মতো শ্রীশ্রীমাকে একবার দেখে এসো। আমাদের সে সুবিধা হয়নি।

দীক্ষার পর বলেছিলেন—"মায়ী, আনন্দ পেলে তো?" আমি বলেছিলাম—"হাঁ মহারাজ।"

সর্বদা ধ্যান-জপ করতে বলতেন। বলতেন—ঠাকুরের বিষয় যত ভাববে ততই ঠাকুরকে বেশি জানতে পারবে। বলতেন—তোমরা সব মেয়েরা বাজে আলোচনা একসঙ্গে বসে কর—তো। তা না করে ঠাকুরের একখানা বই পড়ে সে সকল কথা আলোচনা করতে তো পার—মন উন্নত হয়।

তাঁকে একদিন বলেছিলাম—"ঠাকুরকে দেখতে বা বুঝতে পারছি না।" তিনি বলেছিলেন—"অমনি অমনি কি বুঝা যায়? তোমরা কিছু কর না, ভাবনা চিন্তা কর না—ঠাকুরকে খুব ভাববে চিন্তা করবে। যতই ভাববে চিন্তা করবে ততই ঠাকুরের বিষয় বুঝতে পারবে এবং আনন্দ পাবে। বিশ্বাস চাই, ভক্তি চাই—তুমি আমি যেমন বসে গল্প করছি, সেই রকম ঠাকুরের সহিত কথা বলা যায় এবং দেখা যায়। কেন দর্শন পাবে না? মনে জোর চাই।"

যখন নারায়ণগঞ্জে ছিলেন—শরীর খুব অসুস্থ—একদিন রাত্রে ঠাকুর দর্শন দিয়ে তাঁর কাছে শুয়ে গল্প করেন, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। খোকা মহারাজ বলেন, "আর কতদিন আপনাকে ছেড়ে থাকবো?" ঠাকুর বলেন—"এখন 'যাব' কিরে? আর কিছুদিন থাক, তুই বড় ব্যস্তবাগীশ—আসবিই তো, ব্যস্ত কেন?"

খোকা মহারাজ ছোটবেলায় ভূতের ভয় করতেন, একা শুতে পারতেন না—কাছে তাঁর ঠাকুরমা শুতেন। তিনি বলেছেন, এ কথা ঠাকুরকে বলায় ঠাকুর তাঁর কপালে ভ্রূর মাঝখানে ডান হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ দিয়ে দেন। সেই থেকে মহারাজ কপালে আলো দেখতে পেতেন এবং ভূতের ভয় চলে যায়। কিছুদিন পর ঠাকুর জিজ্ঞেস করেন—"কিরে তোর ভূতের ভয় এখন আর নেই তো?" তিনি বলেন—"না।" ঠাকুর আবার তাঁর ডান হাতের বুড়ো আঙুলের টিপ [কপালে] দেন। পরে মহারাজ আর ঐ আলো দেখতে পেতেন না।

খোকা মহারাজ অনেক তীর্থ হেঁটেই করেছেন। বদরীকাশ্রমে দু-তিনবার গিয়েছিলেন। কোথায় একবার গিয়েছিলেন—সেখানে চারিদিকে জঙ্গল—নীরব স্থান—এক কালীমন্দির আছে। রাত হলে মহারাজ মাথার নিচে হাত দিয়ে গাছের তলায় শুয়ে পড়েন। অনেক রাত্রে একজন স্ত্রীলোক মহারাজকে

ডাকছেন—"ওঠ ওঠ, দেখছিস না কত সাপের গর্ত—তুই শুয়ে আছিস বলে এরা বের হয়ে আহার অন্বেষণ করতে পারছে না। ঐ কালী মন্দিরে যা।"

একবার কোথায় খুব অসুখ হয়েছিল। খোকা মহারাজ রাগ করে বলেন—"ঠাকুর, তোমার নাম নিয়ে আমার এই দুর্দশা—একটা লোক নেই যে একটু জল দেয়।" ঠাকুর দর্শন দিয়ে বলেন—"তোর কি চাই—লোকজন, টাকাকড়ি?" তার পরদিন লোকজন, টাকাকড়ি সব পেলেন।

নিজের বাড়িতে থাকতে রাতে যখন শুতেন তখন বাতি নিবিয়ে সমস্ত বিছানা ফেলে দিয়ে শুধু কম্বলের ওপর শুতেন, মাথার নিচে হাত দিয়ে। আবার সকালে বিছানা পেতে রাখতেন।

পায়ের তলা হেঁটে হেঁটে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। বলতেন—"কত হেঁটেছি তার কি সংখ্যা আছে?" তিনি শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ করতে বলতেন—এইরূপ জপের নাম 'অজপা' বলতেন। প্রায় সর্বদাই মায়ের নাম, ব্রহ্মময়ীর নাম বলতেন। আমি বলেছিলাম—"জপ-তপ অত করতে পারবো না।" তাতে তিনি বলেন—"সকালে সন্ধ্যায় ঠাকুরের নাম করো, স্মরণ মনন করতে হয়।"

খোকা মহারাজ পূর্বে মেয়েদের সঙ্গে মিশতেন না, মেয়েদের দেখলে অন্যদিকে চলে যেতেন। স্বামীজী [বিবেকানন্দ] ইহা লক্ষ্য করে মেয়েদের উপদেশ দিতে বলায়, তবে মেয়েদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন। স্বামীজী বলেছিলেন—"আমরা যদি উপদেশ না দি, মেয়েরা কোথায় যাবে? মেয়েরা জগদম্বার অংশস্বরূপা।"

খোকা মহারাজ মেয়েদের শ্রীশ্রীমার আদর্শ মতো চলতে বলতেন।

সর্বদা "ঠাকুরের উপর ভক্তি-বিশ্বাস হউক"—এই বলতেন।

(১৩)

সবাইকে উঠাতে হবে

জিতেন্দ্রমোহন চৌধুরী

শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ হবার পর ঠাকুর একদিন খোকা মহারাজকে বলেছিলেন—“আমি তোদের বাড়ি গেছি।” খোকা মহারাজ বলেন—“আমি তো আপনাকে দেখিনি।” শ্রীশ্রীঠাকুর বলেন—“তুই তখনো জন্মাসনি।”

ঠাকুর খোকা মহারাজকে মাস্টার মহাশয়ের কাছে যেতে বলতেন। খোকা মহারাজ বলেছিলেন—“আমি অন্য কাহারো কাছে যাব না—আপনার কাছেই উপদেশ নেব।” ঠাকুর বলেন—“সে এখানকার কথাই বলবে। মনে কর কোন লোক সমুদ্র হতে রত্ন এনেছে, আর তাই বিলাচ্ছে।”

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ ছাপা হওয়ার পর উহা পাঠ করেই ঠাকুরের নিকট যাবার প্রবল ইচ্ছা হয়।

অনেক সময় দুপুরের রৌদ্রে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঠাকুরের নিকট এসে পৌঁছতেন। এসেই ঠাকুরকে বাতাস করতেন—আশ্চর্যের বিষয় এতেই খোকা মহারাজের শ্রান্তি দূর হতো।

শ্রীশ্রীঠাকুরের অদর্শনের পর খোকা মহারাজ যখন ঘুরে বেড়াতেন তখন লোকালয়ে প্রায়ই থাকতেন না—মাঠে, গাছতলায়, রাত্রিযাপন করতেন ভূমিশয্যায়; হাতের ওপর মাথা রেখে শয়ন করতেন।

রাখাল মহারাজের সঙ্গে খোকা মহারাজ যখন বৃন্দাবনে ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ও তখন সেখানে ছিলেন। তাঁদের পরস্পর দেখাশুনা হতো। রাখাল মহারাজ সে সময়ে রাত্রির শেষভাগে উঠে সমস্ত সময় কঠোর ধ্যান-তপস্যায় কাটাতেন। খোকা মহারাজ রাখাল মহারাজকে বলেছিলেন—“ঠাকুর আপনাকে এত ভালবাসতেন—আপনার এত কঠোর [তপস্যা] করবার প্রয়োজন কি?” রাখাল মহারাজ তদুত্তরে বলেন—“দেখ খোকা, যদি হাতে

হাতে দেবার জিনিস হতো, ঠাকুর আমাকে দিতেন। নিজে সাধন না করলে হবার নয়।”

খোকা মহারাজ গল্পচ্ছলে অনেক সময় বলতেন—“শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলেছিলেন—‘যদি দ্বিভুজ কিংবা চতুর্ভুজ মূর্তি দেখতে চাও, দেখাতে পারি, কিন্তু যদি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করতে চাও তাহলে তপস্যা করতে হবে।’”

খোকা মহারাজ বলতেন—“ভগবান বিচারের ক্ষমতা দিয়েছেন, ভাল-মন্দ বিচার করে কাজ করবে।” কখনো কখনো বলতেন—“আমি ছাতা ধরে রেখেছি, আর বলছি ছাতা আমায় ছাড়ে না।” (অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আমরা অনেক বিষয়ে জড়িত হচ্ছি কিন্তু মনে মনে ভাবছি বন্ধন কাটাবার আমাদের কোনই উপায় নেই।)

খোকা মহারাজ দুর্ভিক্ষ ত্রাণের কাজে গিয়েছিলেন (সম্ভবত উড়িষ্যায়)। সামান্য কিছু খেয়ে সমস্ত দিন গুরুতর পরিশ্রম করতেন। জেলার ম্যাজিস্ট্রেট কাজ দেখে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। কলকাতা থেকে কাপড় ইত্যাদি ত্রাণকার্যের জন্য পাঠানো হতো। পথে কতক কাপড় চুরি হয়। অনেকে রেল কোম্পানির নিকট থেকে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে বলে; কিন্তু তিনি মকদ্দমা করার পক্ষপাতী ছিলেন না ।

যখন মাদ্রাজ অঞ্চলে ছিলেন, শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব উপলক্ষে অস্পৃশ্য লোকদের খাওয়ানো হতো। উচ্চবংশীয়েরা প্রথম প্রথম তাদের পরিবেশন করতে আপত্তি করতো। মহারাজ বলেছিলেন—“আমরা নিজেরাই পরিবেশন করতে আরম্ভ করাতে উচ্চবংশীয় ভক্তরাও যোগদান করতো।” মাদ্রাজে অনেক মেয়ে-ভক্তদের সঙ্গেও খোকা মহারাজের পরিচয় হয়।

গয়াতে একবার ফল্গু নদী পার হবার সময় জল ক্রমশ খোকা মহারাজের গলা পর্যন্ত এল এবং আশঙ্কা হলো যে ডুবে যাবেন—বাঁচবার আশা নেই। তিনি মনে করলেন—ঠাকুরকে একবার ডেকেনি। হঠাৎ দেখতে পেলেন কে যেন ধাক্কা দিয়ে অপর পারে এনেছে।

কেদার বদরীর পথে একবার তিনি গৌরীকুণ্ডে মেয়েদের খাইয়েছিলেন।

একটি বৃদ্ধার সঙ্গে কতকগুলি মেয়ে [তীর্থ করতে] যাচ্ছিল, তাঁরা সকলেই সুশ্রী, তাহাদের ভিতর একটিকে বোধ হলো যেন সাক্ষাৎ উমা। খোকা মহারাজ পাহাড়ে ফল কিনে তাঁদের খাইয়েছিলেন।

পরিব্রাজক অবস্থায় পথে কোন স্থানে এক মুচিকে জুতো সেলাই করতে দেন, মুচি ভিতরে গেলে তার মেয়ে এসে হাসি-তামাসা করতে থাকে। খোকা মহারাজ তাকে ধমক দেওয়াতে সে চলে যায়।

খোকা মহারাজ যখন আলমোড়া ছিলেন, লালা বদ্রী শার বৃদ্ধামাতা ভিন্ন আর কোন স্ত্রীলোককে কাছে আসিতে দিতেন না। স্বামী বিবেকানন্দ একবার খোকা মহারাজকে বলেছিলেন—"স্ত্রীলোককে এত ভয় করিস কেন, তুই যে খোকা—স্ত্রী-পুরুষ অভেদ। তোকে দিয়ে ঠাকুর মেয়েদের ভিতর অনেক কাজ করিয়ে নেবেন।"

কোন স্ত্রী-ভক্ত অশুচি অবস্থায় খোকা মহারাজকে পাদস্পর্শ করে প্রণাম করতে কুণ্ঠিত হওয়াতে তিনি বলেছিলেন—"মানুষ হয়ে মানুষকে ঘৃণা?"

দেবদেবী দর্শন সম্বন্ধে খোকা মহারাজ ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন; ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন—"দেখা যায়—মাইরি দেখা যায়।",

ঠাকুর একবার বলেছিলেন—"খোকা, ন্যাংটো হতে পারিস?" খোকা মহারাজ বলেছিলেন—"আপনার কাছে আর লজ্জা কি?" এই বলে কাপড় খুলে ফেললেন। ঠাকুর যেন তাঁর কাম-ভাব নিয়ে গেলেন।

খোকা মহারাজ বলেছিলেন—"জগন্নাথের মন্দিরের ছবি বাহ্যজগতের চিত্র—ভিতরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ।" জগন্নাথদেবের মূর্তি সম্বন্ধে তিনি বলেন—"কারিগর আপন ইষ্টমূর্তি ধ্যান করতে করতে সমাধিমগ্ন হলো—মূর্তি যে পর্যন্ত গড়েছিল সেইভাবেই আছে।" জগন্নাথ মূর্তি সম্বন্ধে ইহাই তাঁহার মনে হয়েছিল।

আলমোড়ায় একবার স্বপ্নে দেখেছিলেন—স্বামীজী (বিবেকানন্দ) বলছেন—"খোকা ঐ পাহাড়গুলো ভেঙেচুরে সমান করে ফেলতে হবে।" খোকা মহারাজ ভাবছেন—এর অর্থ কি? স্বামীজী বললেন—"সবাইকে উঠাতে হবে—ছোট বড় ভেদ দূর করতে হবে।"

খোকা মহারাজ পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে ঘুরে অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে 'ডায়াবেটিস' অত্যন্ত বেড়ে যায়। তখন তিনি নারায়ণগঞ্জে। কলকাতার যে কোন ডাক্তারের অভিজ্ঞতা ওখানকার ডাক্তারদের চেয়ে বেশি—সেইজন্য তিনি কলকাতায় আসবেন স্থির করেন। রাত্রে শুয়ে আছেন, অসহ্য যন্ত্রণা—ঠাকুর এসে তার পিঠে ঠেস দিয়ে শুলেন এবং অনেক কথাবার্তা বললেন। খোকা মহারাজ বললেন—"আমাকে নিয়ে চলুন।" ঠাকুর বললেন—"যাবিই তো, ব্যস্ত হচ্ছিস কেন—কাজ আছে—আরো কিছুদিন থাকতে হবে।"[১]

---

১ শ্রীশ্রীখোকা মহারাজের একখানি পত্রের প্রতিলিপি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি। Math Belur 21.3.26

প্রিয় জিতেনবাবু—

আপনার পত্র পাইয়া আনন্দিত ও সুখী হইলাম।

পূর্বাপেক্ষা আমার শরীর ভাল, এখন দুবেলা ভাত খাই। ডায়াবেটিস, আমাশা হইয়াছিল, তাহাও সারিয়াছে, শারীরিক দুর্বলতা আছে। ডাক্তার বলিয়াছে আর একবার ইউরিন পরীক্ষা করিতে হইবে। আলু, ডাল ও মিষ্টি জিনিস খাই না। শ্রীভুবনেশ্বর মঠ হইতে সেখানে থাকিবার জন্য তাহারা ডাকিয়াছে। আমার অসুখের কারণ অতিরিক্ত পরিশ্রম হইয়াছে এমন কি একটু বেড়াইবার সময় পাইতাম না, স্নান আহার ও রাত্রি নিদ্রা সেই সময় বিশ্রাম; সকাল হইতে রাত্র ১০।১১ পর্যন্ত লোকের সহিত কথাবার্তা, কখনো শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে পুস্তক পড়িয়ে শুনানো, মেয়ে পুরুষ সমানভাবে দলে দলে অনেকে আসিত। এখন অনেক জায়গায় পুরুষরা ধর্ম সম্বন্ধে চর্চা ও কেলাস করে; মেয়েদের অনেকেই ওই রূপ কেলাস করে, সেখানে পুরুষদের যাওয়া নিষেধ, ঘরের হোক কি বাহিরের হোক। সময় সময় পত্র পাই জায়গায় জায়গায় শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয়, মা-র বিষয় ও স্বামীজীর বিষয় আলোচনা খুব হইতেছে। আন্তরিক ভালবাসা ও শুভেচ্ছা আপনারা জানিবেন, সকলকে জানাবেন। আপনি নিত্য শ্রীউমাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানজল খাওয়াইবেন। রাঁচিতে শ্রীরাইকিশোরীবাবুর ছেলের কিরকম অসুখ হইয়াছিল, ডাক্তার ও অন্য সকলে তার জীবনের আশা ছেড়ে দিয়েছিল। শেষে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্নানজল রোজ একটু একটু খাওয়াইয়াছিল, এখন সে ছেলে জগন্নাথ কলেজের প্রফেসার। যখন ঢাকায় ছিলাম মণির সহিত প্রায় দেখা হইত।

মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী
শ্রীসুবোধানন্দ

"Babu Jitendra mohan chowdhuri Gardanibag
Road no. 30--House no. 9, P. O. Patna."

মাস্টার মহাশয়ের বড় ছেলের অপারেশন করা হয়। খোকা মহারাজ সে সময়ে ওদের বাড়ি গিয়েছিলেন। মাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী কান্নাকাটি করতে লাগিলেন। খোকা মহারাজ অভয় দিয়ে বললেন—"ভয় নেই, ঠাকুরের প্রসাদি ফল দাও, শীঘ্র ভাল হবে।"

খোকা মহারাজ প্রথম প্রথম যখন ঠাকুরের কাছে যেতেন, মা বাবাকে বলেছিলেন—"একহাজার টাকা পেলে জাপান গিয়ে ব্যবসা করব।" পরে যখন তাঁরা টাকা দিতে চেয়েছিলেন, তখন বললেন—"আমার এখন আর টাকার দরকার নেই।"

সাধু হবার পর পুত্র বাড়ি এলে, তিনি যেসব খাবার ভালবাসতেন, পিতা ঝুড়ি ভরে আনিয়ে দিতেন।

প্রায় সতের বৎসর [১৯১৪-১৫] পূর্বে স্বামী অম্বিকানন্দ (নীরোদ মহারাজ)-কে নিয়ে যে বছর খোকা মহারাজ রাঁচি আসেন দলবল নিয়ে রাঁচি-জগন্নাথ বাড়ি যান। সেখানে ভক্তদের নিয়ে ফটো তোলা হয়। সে সময়ে খুব আনন্দে দিন কাটতো। পরের বছরও খোকা মহারাজ রাঁচি উৎসবের সময় আসেন—গৌরী মাও সে বছর এসেছিলেন। খোকা মহারাজ জুন মাস পর্যন্ত রাঁচিতে ছিলেন। হিনুতে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়দিন শ্রীশচন্দ্র ঘটকের বাসার নিকট এক খালি বাসায় ছিলেন। হিনুর রাজেন মুখার্জি, সুরেন্দ্র সরকার, উমাচরণ সেন, উপেনদা ও আমাদের বাসায় নিজে বলে এক এক দিন ভিক্ষা নিতেন। এক এক বাসায় সন্ধ্যার পর সরকার ও রাজেনদার গান হতো। কীর্তনের পরে খোকা মহারাজ রাত্রিতে কোন কোন দিন সেই বাসায়ই রাত্রিতে থাকতেন। পরে ডুরেণ্ডায় ইন্দুবাবুর বাসায় বিশ্রামের জন্য প্রায় জুন মাস পর্যন্ত ছিলেন। সে সময় তাঁকে নিয়ে মহাআনন্দে দিন কাটতো। অফিস হতে এসে রাত প্রায় নয়টা পর্যন্ত মহারাজের নিকট থাকা যেত। সকালবেলায় তাঁর কাছে যাওয়াই ছিল আমাদের কাজ। সকলেরই বয়স অল্প ছিল—সংসারের ঝঞ্ঝাট বিশেষ ছিল না। মহারাজ গল্পচ্ছলে শ্রীশ্রীঠাকুরের ও শ্রীশ্রীমায়ের বিষয়ে অনেক কথা বলতেন। দুপুরবেলা তাঁর কাছে গিয়ে মেয়েরা নানারূপ গল্প

শুনতেন। কোন মেয়ে ভক্ত 'একা কি করে আসি' বলাতে খোকা মহারাজ বলেছিলেন—"তোমরা এতটুকু আসতে ভয় পাও, শ্রীশ্রীমা হেঁটে জয়রামবাটী হতে দক্ষিণেশ্বর গিয়েছিলেন। তোমরা মার দেশে মার কাছে গিয়েছ, তাঁর মুখের কথা শুনেছ, তোমাদের ভয় কি?"

খোকা মহারাজ কখনো ডুরেণ্ডায় কখনো হিনুতে দিনেরবেলায় ভিক্ষা নিতেন। দুপুরবেলায় খুব গরম বোধ করতেন, বলতেন—"পরদাগুলো ভিজিয়ে দাও গরম কম লাগবে।" বিকেলে ঠাণ্ডা পড়লে বেড়াতে যেতেন। পুরী ভুবনেশ্বর গিয়ে বর্ষার সময় ছিলেন; পুনরায় ডিসেম্বর মাসে রাঁচি আসেন। প্রথমত হিনুতে ঘটকের বাসায় ছিলেন। নিজেই একদিন বললেন—"চল সকলে মিলে মোরাবাদি পাহাড়ে গিয়ে পিকনিক করা যাক।" হিনু ও ডুরেণ্ডা থেকে 'পুসপুস' করে সকলের যাওয়া হয়। সে দিন তিনি হিনুতে আমাদের বাসাতেই ভিক্ষা নিয়েছিলেন। পূর্বরাত্রে আমাদের বাসাতেই ছিলেন, আমাদের সঙ্গেই মোরাবাদি যান। ডুরেণ্ডা থেকে ইন্দুবাবু সপরিবারে জিনিসপত্র নিয়ে পূর্বেই গিয়েছিলেন। মহারাজ বলতেন—"তোমরা চায়ের বন্দোবস্ত কর—আমি তোমাদের কাশ্মীরী চা করে খাওয়াচ্ছি।" মহারাজ নিজ হাতে চা করে মেয়েদের দেখালেন—এলাচ লবঙ্গ দারুচিনি আদা কিসমিস বাদাম পেস্তা এইসব দিয়ে চা তৈরি হলো।

একবার হিনুতে আমাদের বাসার সকলেরই ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়। খোকা মহারাজ জানতেন না। খুব বেশি জ্বর শরীর বেদনা ইত্যাদি হয়েছিল। ডুরেণ্ডা থেকে এসেই বললেন—"তোমাদের এত অসুখ আমি খবর পাইনি।" বিছানায় উঠে বসলেন এবং লেপের ওপর দিয়ে গা হাত পা টিপে দিতে লাগলেন। 'পায়ে হাত দিবেন না' বলাতে বললেন—"পা-টা কি শরীরের অংশ নয়? এমন অসুখ হয়ে একলা পড়ে আছ, কেউ দেখবার নেই, আমি একটু শরীর টিপে দিলে কী দোষ হবে? আমি কি তোমাদের কেউ নই?" স্টোভে (Stove) গরম করে পথ্য খাওয়ালেন। এরূপ আপনার ভেবে তিনি আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতেন।

রাজেনদার বাসায় শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি পূজা হয়। সেই বৎসর রাজেনদার

একটি মেয়ে হয়—খোকা মহারাজ নাম রেখেছিলেন—বিন্ধ্যবাসিনী। ইন্দুবাবুর বাসায় মহারাজ একবার মহালয়া অমাবস্যার রাত্রিতে কালীপূজা করেন। একবার পাটনাতে প্রফুল্লদার বাসাতেও ভোগরাগ হয়। উৎসবাদিতে মহারাজ নিজে পূজা করতেন।

কাশীতে খোকা মহারাজ নিজে আমাদিগকে সঙ্গে নিয়ে লাটু মহারাজের নিকট যান।

তিনি অনেক সময় বলতেন—"তোমরা ঠাকুরের সন্তান ও মায়ের কৃপা পেয়েছ—তোমাদের ভাবনা কী?" নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত, স্বামী ব্রহ্মানন্দের, স্বামী বিবেকানন্দের, স্বামী শিবানন্দের দৃষ্টান্ত গল্পচ্ছলে মেয়েদের নিকট অনেক সময় বলতেন।

(১৪)

সরল-নিরহঙ্কার-মধুর

ধীরেন্দ্র কুমার গুহ

আমার এক দাদা (জ্যেষ্ঠতাত-পুত্র) সুখময় গুহ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্ত-জননী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। দাদার এক আত্মীয় শ্রীনগেন্দ্রনাথ সরকার (পরে স্বামী সহজানন্দ) আমাদের গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বিষয়ক গ্রন্থাদি নিয়ে যান এবং গ্রামের লাইব্রেরিতে উপহার দেন। সেই লাইব্রেরিতে 'উদ্বোধন' মাসিক পত্রও লওয়া হইত। এইসবের মাধ্যমে শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামী বিবেকানন্দের বিষয় জানিতে পারি এবং মনে মনে তাঁদের চরণে আত্মসমর্পণ করি। এই নগেন্দ্রনাথই আমাদের রাজনৈতিক ও ধর্মজীবনের প্রথম পথপ্রদর্শক।

১৯১৪ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় পড়িতে আসি এবং একদিন রবিবারে দাদার সঙ্গে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর কলকাতার নিবাসস্থল 'উদ্বোধন' অফিসে যাই ও শ্রীশ্রীমার শ্রীচরণ স্পর্শ করিবার সৌভাগ্য লাভ করি।

পরে যখন কর্মসূত্রে রাঁচি যাই, গিয়েই দেখি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিরাট জন্মোৎসবের আয়োজন।

সে সময়ে রাঁচিতে 'বিহার-উড়িষ্যা' সরকারের সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিস ছিল। উক্ত দুই অফিসে শ্রীশ্রীমায়ের অনেক মন্ত্রশিষ্য কাজ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে ইন্দুভূষণ সেন, প্রফুল্ল কুমার গাঙ্গুলি প্রভৃতি ছিলেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষে কলকাতা থেকে স্বামী সুবোধানন্দ ও গৌরী মা এসেছেন—সঙ্গে একজন ব্রহ্মচারী। শ্রীশ্রীঠাকুরের এইসব একান্ত আপনার জনদের দর্শন লাভ করে মনে যে কী আনন্দ হয়েছিল তাহা বলিবার নয়।

দরিদ্র নারায়ণ সেবাই সেই উৎসবের প্রধান অঙ্গ ছিল। একদিন এক বিরাট সভা হলো, সভাপতি স্বামী সুবোধানন্দজী বা খোকা মহারাজ। শুরুতেই খোকা মহারাজ বললেন—"শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা আজ আপনাদের গৌরী মা শোনাবেন।" গৌরী মা জোর বক্তৃতা দিলেন।

খোকা মহারাজ সহজে কাহারো নিকট ধরা দিতেন না, যেন তিনি নিজে কিছুই জানেন না—একেবারে খোকাটি। উৎসব হয়ে গেল, খোকা মহারাজ আরও কিছুদিন রাঁচিতে থেকে গেলেন ইন্দুবাবুর বাসায়। আমরা সন্ধ্যার সময় ইন্দুবাবুর বাসায় সব একত্রিত হতাম আর মহারাজের মুখে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতাম। মাঝে মাঝে সকলে মিলে ভজন-গানও হতো।

খোকা মহারাজের সহিত আমার প্রথম যেদিন আলাপ হয় সেদিন তিনি আমাকে একখানা পুরানো পুস্তক পড়তে দেন—বইখানার নাম ভুলে গেছি। তাতে কেবল ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর খোকা মহারাজকে সেই বইখানা পড়তে দিয়েছিলেন।

আমি তখন আঠারো উনিশ বছরের যুবক, স্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল। আমি খোকা মহারাজের হাত পা ও শরীর টিপে দিতাম। তিনি বলতেন—"যত জোরে পার টেপো।" তাছাড়া আমি মহারাজকে তামাক সেজে দিতাম। তিনি

আমাকে কি করে তাওয়াসহ কলকে সাজিতে হয় শিখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর কাছে গেলে কোনরূপ সঙ্কোচ বোধ হতো না—অনেকটা বন্ধুর মতই ব্যবহার করতেন। তাঁহার সারল্য ও নিরহঙ্কার ভাব এত মধুর ছিল যে তাহাতে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত। আমি তাঁহাকে কোনদিন তত্ত্বকথা জিজ্ঞেস করিনি। তাঁহাকে দেখে ও তাঁহার কথা শুনে আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতাম। তিনিও কোন দিন আমাকে উপদেশ ছলে কোন কিছু বলেননি।

রাঁচির কয়েকটি ভক্ত শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর নিকট দীক্ষা নিতে যাবেন। তাঁহারা খোকা মহারাজের সম্মুখেই আমাকেও সঙ্গে নেবার জন্য টানাটানি করছিলেন। আমি তাঁদের বললাম—আমার এরূপ দেখাদেখি দীক্ষা নেওয়া পছন্দ হয় না। ভক্তরা আমার আপত্তি বা যুক্তি কিছুই শুনবেন না—আমাকে সঙ্গে নেবেনই। তখন মহারাজ তাদের ধমক দিয়ে বললেন—"কেন ওকে বিরক্ত করছো।" তখন ভক্তরা নিরস্ত হন।

অতঃপর ১৯৩১ সালে আমার কর্মস্থল পাটনায় সেখানে গর্দানীবাগে রাখালচন্দ্র ঘোষের বাসায় খোকা মহারাজকে পুনরায় দেখি। আমার মা ইতঃপূর্বেই রাঁচিতে থাকাকালীন খোকা মহারাজের দর্শন লাভ করেছিলেন। মা এবার পাটনায় আমাকে বললেন—"আমি খোকা মহারাজের নিকট দীক্ষা নিব, তুই মহারাজের নিকট গিয়ে সব ঠিকঠাক করে আয়।" আমি রাখালবাবুর বাসায় গিয়ে মহারাজের সঙ্গে দেখা করি।

খোকা মহারাজ অল্প দিন পূর্বেই রক্তামাশায় রোগে মরণাপন্ন হয়েছিলেন। আমি গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন—"এবার থেকে গেলাম।" আমি বললাম—"কিরকম মহারাজ?" তিনি বললেন—"এবারকার অসুখের সময় মিহিজামে ঠাকুর একদিন স্বপ্নে দেখা দিলেন—তখন আমি খুব ভুগছিলাম—মরো মরো। আমি ঠাকুরকে বললাম—"এবার আমায় নিয়ে চলুন।" ঠাকুর বললেন—"তুই বড় ব্যস্তবাগীশ, এখন থাক, তোর আরও কাজ আছে।"

কথাবার্তার পর আমি ধীরে ধীরে আমার মায়ের দীক্ষার প্রস্তাব করাতে মহারাজ বললেন—"বেশ, সেই সঙ্গে তোমারও দীক্ষা হবে।" দীক্ষা হবে শুনে

শ্রীযুক্ত শশাঙ্কবাবু ও তাঁহার স্ত্রী আমাকে ধরলেন—যাতে এই সঙ্গে তাঁদেরও দীক্ষা হয়। আমি তাঁদের কথাও মহারাজকে বলি। তিনি রাজি হন। দীক্ষার দিন স্থির হলো। শশাঙ্কবাবু, তাঁহার স্ত্রী এবং আমার মা ও আমি একত্রে দীক্ষা নিলাম। এরপর আমাদের অফিসের বড়বাবু জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি সস্ত্রীক খোকা মহারাজের কাছে দীক্ষা নেন।

আমাকে কর্মোপলক্ষে পুনরায় রাঁচি যাইতে হয়। এবার দেখিলাম 'স্বামি-শিষ্য সংবাদ' প্রণেতা শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় রাঁচিতে পোস্টমাস্টার হয়ে এসেছেন। সে সময়ে হয় আমাদের পাড়ায়, না হয় শরৎবাবুর বাসায় প্রায়ই আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামীজীর বিষয় আলোচনা হতো। শরৎবাবুর স্ত্রী খোকা মহারাজের শিষ্যা ছিলেন। শরৎবাবু আমাদিগকে বলেছিলেন—"খোকা মহারাজের ভাব সব গুপ্ত। তাঁর ভিতর খুব তেজ আছে। একবার একটা স্থানে খোকা মহারাজ আছেন, একটা ভূত প্রায়ই তাঁকে বলতো—"অমুক জায়গায় অনেক গুপ্তধন পোঁতা আছে, তুমি নাও এবং সৎকাজে ব্যয় কর।" শেষে খোকা মহারাজ অতিষ্ঠ হয়ে সেই নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে প্রস্রাব করে ঐ স্থান চিরকালের মতো ত্যাগ করেন।

পূর্বেই বলেছি পূজ্যপাদ খোকা মহারাজকে দেখে ও তাঁহার কথা শুনে আনন্দে ভরপুর হয়ে যেতাম। তাঁহার সারল্য ও নিরহঙ্কার ভাব এত মধুর ছিল যে তাহাতে সকলে মুগ্ধ হয়ে যেত।

(১৫)

সমাধিস্থ

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী

স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের সঙ্গে আমার বিশেষ আলাপ ছিল। তিনি প্রায়ই আমাকে চিঠিপত্র দিতেন। ঐ সকল চিঠি এখন আর খুঁজে পাই না।

তিনি আমাকে ছোট সহোদরের ন্যায় জানতেন। বালেশ্বরে একমাস, পুরুলিয়ায় দুইবারে প্রায় দুইমাস, রাঁচিতে আমার বাসায় প্রায় পঁচিশ দিন, ব্যারাকপুরে সাত-আট দিন ছিলেন। ঐ সময়ে তাঁহার মুখে তাঁর নিজ বিষয়ে যে যে কথা শুনেছি তাই এখানে কিছু কিছু লিখছি ঃ

(১) ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কাছে প্রথম যে দিন যান সেই দিন সহপাঠী ক্ষীরোদ মিত্র সঙ্গে ছিলেন, আড়িয়াদহ ঘুরে দক্ষিণেশ্বরে যান—বামে একটি শৃগাল দেখেছিলেন—ইহা গমন বিষয়ে শুভচিহ্ন। ঠাকুরের কাছে যেতেই একেবারে তিনি ডেকে নিজের তক্তপোশে বসান এবং বলেন—"তুই কি শঙ্কর ঘোষের বাড়ি জন্মেছিস?" খোকা মহারাজ বলেন—"আপনি কি করে জানলেন?" ঠাকুর বলেন—"তুই জন্মাবার বিশ বছর আগে মা আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।"

পরের দিন [ক্ষীরোদ-সহ] আবার গেলে শ্রীশ্রীঠাকুর উভয়ের জিবে কি লিখে দিতেই খোকা মহারাজ সমাধিস্থ হন এবং নানা লোক দর্শন করেন। এরূপ দর্শনের কথা শুনে ঠাকুর নাকি বলেছিলেন—"তাহলে ঠিকই হয়েছে।" ঠাকুর খোকা মহারাজকে একটি মন্ত্র বলে দেন। ঐ মন্ত্র জপ করে খোকা মহারাজ প্রথম দিন শয়নঘরে দু-তিনটা গোখরো সাপ দেখে ভয় পেয়ে গিয়ে পরে ঐ কথা ঠাকুরকে বলেন। ঠাকুর বলেন—"তাহলে ঠিক মন্ত্রই হয়েছে, ছাড়বিনি।" খোকা মহারাজ ঐ দিন থেকে ঠাকুরমার বিছানায় না শুয়ে ভিন্ন বিছানায় একই ঘরে শুতেন এবং অল্পক্ষণ জপের পরেই নানারূপ বিভূতি দেখতেন।

(২) ভূতের ভয়ের কথা ঠিক। ঠাকুর খোকা মহারাজের ভ্রূর মধ্যে টিপে দেন। দিতেই তিনি জ্যোতি দর্শন করেন এবং ভূতের ভয় চলে যায়। তিন বৎসর ঐ আলো দেখে পথ চলতেন। পরে ঠাকুর নিভিয়ে দেন।

(৩) বৃন্দাবনে রাখাল মহারাজের সঙ্গে অবস্থান কালে কলকাতায় বলরামবাবুর মৃত্যু হয়। খোকা মহারাজ তাঁর সূক্ষ্ম দেহ ঐ রাত্রেই দর্শন পান। রাখাল মহারাজ তখন জ্বরে ভুগছেন—প্রায় ১০৩° জ্বর। খোকা মহারাজের

সঙ্গে বলরামবাবুর কথোপকথন শুনে রাখাল মহারাজ পরদিন খোকা মহারাজকে বলেন—"তুই কি বলরামবাবুর সঙ্গে কথা কইছিলি?" খোকা মহারাজ 'হাঁ' বলেন। রাখাল মহারাজ বলেন—"আমিও ঘুমের ঘোরে ঐরূপ শুনলাম—বোধ হয় কাল রাত্রে বলরামবাবু দেহ রেখেছেন।" ঐরূপ কথাবার্তা হতে হতেই কলকাতা থেকে তারে বলরামবাবুর মৃত্যু সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছায়।

(৪) বদরিকাশ্রম থেকে নিচে নামবার কালে খোকা মহারাজ ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক নাগা সন্ন্যাসীদের মঠে অতিথি হন। মঠের সাধুরা তাঁকে খুব যত্ন করে। তিনি এক রাত্রি তথায় বাস করেন। রাত্রি বারোটার পর একজন নাগা সাধু জোড়হাত করে বলে—"মহারাজ, আপনি ভয় পাবেন না—আমি বিদেহী আত্মা, এই মঠের প্রতিষ্ঠাতা। আজ থেকে দেড়শ বৎসর পূর্বে আমার মৃত্যু হয়, কিন্তু কোন বিশেষ পাপে আমার ঊর্ধ্বলোকে যাবার গতি রুদ্ধ হয়ে আছে। আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।" খোকা মহারাজ শুনে বলেন—"আপনার যা বলবার আছে বলুন।" ঐ প্রেতশরীরী বলে—"জয়পুরের রাজার টাকায় এই মঠ তৈরি হয়। মঠের জন্য টাকা ব্যয় করেও এক ঘড়া মোহর উদ্বৃত্ত থাকে। এই মঠ থেকে কিছু উত্তরে একটা পিপুল গাছের নিকট কচুবনের নিচে ঐ ঘড়াটা পুতে রেখেছিলাম। আপনি ঐ টাকা নিয়ে কোন সৎকার্যে দান করুন—তাহলেই আমি মুক্ত হয়ে যাব।" খোকা মহারাজ বলেন—"আচ্ছা ভেবে দেখা যাবে।" রাত্রে শুয়ে শুয়ে খোকা মহারাজ ভাবলেন—শ্রীশ্রীঠাকুরই তাকে ঐরূপ টাকার প্রলোভন দেখাচ্ছেন। ভোরে উঠেই উত্তর দিকে গিয়ে একটা পিপুল গাছের ধারে এক কচুবন দেখতে পান। ঐ কচুবনে—গিয়ে পায়খানা করে তাড়াতাড়ি সেই মঠ থেকে সরে পড়েন।

(৫) কোন বটগাছের মূলে সাপের গর্তের মুখে রাত্রে শোওয়ার কথাও ঠিক। তবে ঘটনাটি আমার অন্যরূপ জানা। রাত প্রায় একটার সময় কোন পাহাড়ি বুড়ি এসে বলে—"বাবা, এখান থেকে উঠে গিয়ে নিকটস্থ পুলিস-ফাঁড়িতে রাত্রি যাপন কর। আমার ছেলেরা খেলতে পারছে না।" খোকা মহারাজ অগত্যা অন্ধকার রাত্রে কিয়দ্দূরে গিয়েই পুলিশের ফাঁড়ি দেখতে পান

এবং পুলিশদের যত্নে ঐ রাত্রি তথায় যাপন করেন। পরদিন প্রাতে গিয়ে ঐ বটগাছের তলায় চার-পাঁচটা ফণাধর সাপ খেলা করছে দেখতে পান।

(৬) কোঠারেশ্বরীর গল্পও খোকা মহারাজের মুখে শুনেছি। তিনি কোঠারে ঐ দেবীর দর্শন পান এবং তাঁকে পান দোক্তা দেন।

(৭) কোঠারে অবস্থানকালে তিনি সতীশের প্রেতশরীর দেখতে পান। রামকৃষ্ণবাবুদের বৈঠকখানায় সন্ধ্যায় বসে আছেন—হঠাৎ দেখেন সতীশ দাঁড়িয়ে। সে খোকা মহারাজকে করজোড়ে বলছে—"আপনি একবার আমাদের বাড়ি গিয়ে মা-বাপকে একটু সান্ত্বনা দিয়ে তাদের কৃপা করুন। আমি বেশ সুখেই আছি।" পরদিন খোকা মহারাজ সতীশদের বাড়ি গিয়ে তাদের সান্ত্বনা দিতে তারা সুস্থ হয়। এরূপ আরও অলৌকিক ঘটনা জানি।

একদিন স্বামী বিবেকানন্দকে খোকা মহারাজের অলৌকিক দর্শনাদির কথা বলায় স্বামীজী বলেছিলেন—"ঐসব কিছু নয়—ঐসব দেখলেই যে spiritually (আধ্যাত্মিকতায়) খুব বড় হয়েছে তা বুঝতে হবে না। তবে ওরা milestone on the way (ধর্ম-পথে অগ্রগতির দূরত্ব জ্ঞাপক শিলা)।

ধর্মরাজ্যের ওসব ভেলকিবাজি মাত্র। কে কতটা সংযমী, ধ্যানপরায়ণ, ত্যাগী ও বৈরাগ্যবান—এই হচ্ছে ও রাজ্যের উন্নতির চিহ্ন। তা না হলে কতগুলি ভূতপ্রেত কি অলৌকিক প্রত্যক্ষ হলো বলে ইতি দিয়ে বসে থাকলে ঐখানেই সব শেষ হয়ে গেল।"

(১৬)

তুই এখানকার

তুলসীদাস মুখোপাধ্যায়

[স্বামী সুবোধানন্দ—ভক্তদের খোকা মহারাজ—১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে রাঁচি থেকে পুরুলিয়া হয়ে দেওঘর যান। সেই সময়ে পুরুলিয়ার পোস্টমাস্টার

শরৎচন্দ্র চক্রবর্তীর কোয়ার্টারে কিছুদিন ছিলেন। তথায় অনেকে তাঁহার নিকট ধর্মপ্রসঙ্গ শুনিতে ও সৎসঙ্গ করিতে সমবেত হইতেন। সে সময়ে কথাপ্রসঙ্গে তিনি নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার বিষয়ও কিছু কিছু বলিতেন। তুলসীদাস মুখোপাধ্যায় নিজ ডায়েরিতে সেই সকল কথা যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই প্রতিলিপি অবলম্বনে এই সঙ্কলন। সঙ্কলক ঃ অবনীমোহন গুপ্ত]

১৬ ডিসেম্বর ১৯২৮

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে প্রথম দর্শন সম্বন্ধে পূজনীয় খোকা মহারাজ শরৎবাবুকে যেমন বলেছিলেন—আমরা শরৎবাবুর কাছে যতটা শুনেছি—তাহা লিখিয়া রাখিতেছি। খোকা মহারাজ যখন প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট যান তাঁর বয়স ছিল পনেরো ষোল বৎসর—গোঁফ দাড়ি ওঠেনি। একদিন তাঁর মা ও বাবা গল্প করছিলেন—দক্ষিণেশ্বরে একজন খুব ভাল সাধু থাকেন, তাঁকে একদিন দেখতে যাবেন। খোকা মহারাজ (তখন সুবোধ) গোপনে শুনতে পেয়ে—তার পরদিন স্কুল পালিয়ে ক্ষীরোদ বলে একজন বন্ধুর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির। সুবোধ রাস্তায় ক্ষীরোদকে বলে রেখেছিলেন—পরমহংসমশায় যদি কোন কথা জিজ্ঞেস করেন ক্ষীরোদ যেন উত্তর দেয়।

পরমহংসদেব যে ছোট ঘরটিতে থাকতেন ক্ষীরোদ সেই ঘরের ভিতর গেল। সুবোধ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রহিলেন। ঠাকুর তার দেশের পাড়াগেঁয়ে ভাষায় জিজ্ঞেস করলেন—"আপনারা কোথা থেকে আসচো?" ক্ষীরোদ উত্তর করিল—"কলকাতা থেকে।"

সুবোধ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিলেন দেখে ঠাকুর তাকে ডেকে বললেন—"এগিয়ে কাছে এস না।" সুবোধ একটু এগিয়ে ঘরের ভিতর গেলে ঠাকুর আবার বললেন—"আরও এগিয়ে এস না গো।" আর একটু এগিয়ে যেতেই ঠাকুর খপ করে তার হাতটা ধরে টেনে নিয়ে একেবারে তাঁর বিছানায় বসালেন। তারপর তার হাতখানা যেন ওজন করতে লাগলেন। বললেন—"তুই এখানকার, তুই যে এখানে আসবি তা মা আমাকে তুই জন্মাবার বিশ বছর আগে দেখিয়ে দিয়েছেন।" ঠাকুরের এই কথা শুনে সুবোধ অবাক হয়ে গেলেন।

বাড়ি ফিরে আসবার সময় ঠাকুর তাহাকে আবার মঙ্গলবারে আসিতে বলিলেন।

তারপরের মঙ্গলবারেই[১] সুবোধ আবার শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে গিয়ে উপস্থিত। ঠাকুর তখন তাঁর ঘরে একলাটি ছিলেন। তিনি দক্ষিণের বারান্দার সিঁড়িতে সুবোধকে বসিয়ে তার জিভ টেনে ধরে একটা কি লিখে দিলেন। তাতে সুবোধ বেহুঁশ হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর তাকে ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন ও তার বুকে হাত বুলুতে লাগলেন।

বাড়ি ফিরিবার পরেও সুবোধের সেই আচ্ছন্ন ভাবটা তিন-চার দিন ছিল।

শরৎবাবুর নিকট খোকা মহারাজ গল্প করেছিলেন—তিনি একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন—"আপনি মন্ত্রটন্ত্র লোককে বলে দেন?" ঠাকুর বলেছিলেন—"এখানে মন্ত্রটন্ত্র হয় না। তবে তোর জন্ম-জন্মান্তরের এই মন্ত্র ছিল—এইটে তুই জপ করিস।"

খোকা মহারাজ তাঁর ঠাকুরমার ঘরে শুতেন। সে দিন দক্ষিণেশ্বর থেকে ফিরে এসে রাত্রে মশারির ভিতর বসে যেই ঠাকুরের বলা মন্ত্রটি জপ করছেন—অমনি একটা প্রকাণ্ড গোখরো সাপ এসে ফোঁস ফোঁস করে মশারির চারিদিকে বেড়াতে লাগলো। তিনি তো ভয়েই অস্থির। জপ বন্ধ করে দিলেন। তারপর দিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে বললেন—"মশায়, কাল যে মন্ত্রটি আমায় বলে দিয়েছিলেন সেটা আর আমার জপ করা হবে না।" ঠাকুর বললেন—"কেন রে?" খোকা মহারাজ পূর্ব রাত্রের ঘটনাটি বলায় ঠাকুর বললেন—"ঠিক হয়েছে, ঐটেই তুই জপ কর, ভয় করিসনি। আর আজ থেকে আলাদা শুবি।" খোকা মহারাজ বাড়ি গিয়ে সে দিন রাত্রে আলাদা শোবার বন্দোবস্ত করে—মশারি বেশ করে গুঁজে দিয়ে—বিছানায় বসে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন। খানিক বাদেই আবার সেই সাপ ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো—মশারির চালের ওপর বেড়াতে লাগলো—মশারিটা দুলতে লাগলো।

বেলুড়ে যেখানে এখন স্বামী বিবেকানন্দের মন্দির সেখানে বেলতলায়

---

১ দ্বিতীয়বার যাওয়া নিয়ে মতান্তর আছে। কেউ কেউ বলেন পরের শনিবার।

একদিন খোকা মহারাজ জপ করছিলেন। জ্যোৎস্না রাত। জপ করতে করতে দেখলেন—একটা সাপ গঙ্গা থেকে উঠে এলো, তার তিনটা মাথা—সাদা ধবধবে। সাপটা গঙ্গা থেকে বরাবর তাঁর দিকে এলো। তাঁর কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে খানিক পরে আবার চলে গেল।

শরৎবাবুর কাছে খোকা মহারাজ গল্প করছিলেন—"হেঁটে হেঁটে যখন এখানে ওখানে বেড়াচ্ছি তখন একদিন রাত্রে একটা জঙ্গলের মধ্যে গাছতলায় আশ্রয় নিয়েছি; গভীর রাতে সেই গাছতলায় বসে আছি, এমন সময় দেখতে পেলাম একজন স্ত্রীলোক আমার সামনে এসেছে, তার চোখ দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরুচ্ছে। আমায় বললে—"বাবা, এখান থেকে সরে যা, আমার ছেলেরা বেরুতে পাচ্ছে না।" আমি বললাম—"এত রাতে আমি যাই কোথা?" সে বললে—"ঐ জঙ্গলের ভিতর একটা ফাঁড়ি ঘর আছে, সেখানকার লোকেরা তোকে যত্ন করে রাখবে।" এই কথা শুনে সেই গাছতলা থেকে ফাঁড়ি ঘরের দিকে গেলাম। সেখানকার লোকেরা যত্ন করে রাখলে, খাবার-টাবার দিলে। সকালে উঠে মনে করলাম আচ্ছা কাল যেখানটায় আশ্রয় নেওয়া গিছলো দেখা যাক সেই জায়গাটা; গিয়ে দেখি তিন-চারটা সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মহারাজ একদিন বেড়াতে যাবার সময় আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন—"দেখ না এখন কত পরবশ, লাঠি না হলে এক পা চলবার যো নেই, পাছে টলে পড়ে যাই। কিন্তু যখন হিমালয়ে ছিলুম তখন মনের কি জোরই ছিল; কাউকে ভ্রূক্ষেপ করতুম না, পাহাড় থেকে নামবার সময় দৌড়ে নামতুম। যদি দেখতুম পথটা অনেক ঘুরে ঘুরে গেছে, অথচ দেখতে পাচ্ছি এই চড়াইটা যদি পাহাড়ের গায়ের ওপর দিয়ে উঠতে পারা যায় তাহলে অনেকটা রাস্তা কমে যায়, সে সময়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দুটো রাখবার মতো স্থান পেলে ঘাস ধরে পট করে উঠে পড়তুম, একবার ভাবতুম না, যদি আঙুল দুটো ফসকে যায় বা ঘাস-লতাগুলো ছিঁড়ে যায়, তাহলে দু-তিন মাইল নিচে খাতের মধ্যে পড়ে যাব।"

তিনি কত রাত গাছতলায় কাটিয়েছেন। বৈরাগ্যের তীব্র তাড়নে কলকাতা

থেকে বিন্ধ্যাচল পর্যন্ত একাকী পদব্রজে ভ্রমণ করেছেন। সে সময় কেহ ডাকিলেও কারো বাড়ি যেতেন না।

যখন কোঠারে থাকতেন, সে সময়ে শহর থেকে কিছুদূরে জঙ্গলের মধ্যে কোঠারেশ্বরী দেবীর মন্দিরে যান। সেখানে বসে জপ করতে করতে দেখতে পান দুটো প্রকাণ্ড গোখরো সাপ তাঁর পাশ দিয়ে যাচ্ছে। তিনি কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে জপ করতে থাকেন। মনে মনে ভাবলেন—জীবনটা তো একদিন যাবেই, তা না হয় এইখানেই যাক—আমি তো এদের কিছু করিনি। সাপ দুটো কিন্তু বরাবর তাঁর পাশে এসে তাঁর দুদিকে ফণা তুলে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো—এইভাবে কিছুক্ষণ থেকে চলে গেল।

ওইখানে বসে জপ করতে করতে—তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ পান। তিনি বলেছিলেন—"আমি বসে জপ করছি, এমন সময় একটি বুড়ি এসে—ঠিক আমার ঠাকুরমার মতো বুড়ি—আমায় বললে—"তুই এখানে কেন এসেছিস?" আমি বললুম—"আমাকে এখানে তুই আনলি কেন, আমি তো শহরে বেশ ছিলুম! আচ্ছা যদি এসেছিস তো আমাকে একটু হাওয়া করে দে।" মা তাঁকে বাতাস করতে লাগলেন, আর বললেন—"কাল্ আমাকে পান দোক্তা দিবি।" পরদিন তিনি শহর থেকে দেবীকে পান দোক্তা এনে দিয়েছিলেন।

তিনি বলতেন—ভগবানের ওপর নির্ভরতা ভক্তি-বিশ্বাস থাকলে তিনিই সব করেন। একবার কনখলের ওধারে তাঁর খুব অসুখ হয়। একাকী এক মহন্তের আশ্রমে আছেন—একেলা পড়ে—রোগযন্ত্রণায় ও পিপাসায় অস্থির—এমন কেউ নেই যে কমণ্ডলু থেকে একটু জল দেয়। অগত্যা নিজে উঠে যেমনি জল নিতে যাবেন অমনি পড়ে গেলেন। মনে মনে অভিমান ভরে শ্রীশ্রীঠাকুরের উদ্দেশে বললেন—"এই জঙ্গলে নিয়ে এসে এই কষ্ট দেওয়া!" এইরকম ভাবতে যাই একটু তন্দ্রা এসেছে—দেখতে পেলেন ঠাকুর এসে তার গায়ে মাথায় হাত বুলুতে লাগলেন আর বললেন, "শালা, এই তোর বিশ্বাস? এক মুহূর্তও কি তোদের ছেড়ে আমি থাকতে পারি? তোদের সঙ্গে সঙ্গেই তো সর্বদা আছি। কালই লোক আসবে, টাকাকড়ি আসবে—ইচ্ছা হলে একটা চাকর রেখে দিতে পারবি।"

মহারাজ সেই অবস্থায় ঠাকুরকে বলতে লাগলেন—"না আমি কিছুই চাই না, তোমার পাদপদ্মে যেন বিশ্বাস থাকে এই চাই। না না টাকাকড়ি লোকজন কিছুই চাই না।"

এক ব্রহ্মচারী এলো, তাঁর সেবা করতে। তার নাম তিনকড়ি, শান্তিপুরের কাছে কোন গ্রামে তার বাড়ি ছিল। সে গায়ত্রীর পুরশ্চরণ করতে হিমালয়ে গিয়েছিল। সে এসে মহারাজকে বলে—"আমাকে আপনার সেবা করবার অনুমতি দিতে হবে। গতরাত্রে দেবী আমাকে স্বপ্নে বলেছেন—'অমুক জায়গায় অমুক সাধু (খোকা মহারাজ নাম) অসুস্থ হয়ে পড়ে আছে—সে যতদিন না সুস্থ হয় তুই তার সেবা করবি।'"

মহারাজ তাকে বললেন—"কিছু দরকার নেই—যা করেন ঠাকুর।" তিনি কিছুতেই তিনকড়িকে থাকতে দিলেন না। সে অগত্যা ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে গেল। সেই রাত্রেই মহারাজ আবার ঠাকুরকে দেখেন, ঠাকুর তাকে বলেন—"ওকে (তিনকড়িকে) রাখলি না কেন? ও আবার আসবে, ওকে কাছে রেখে দিবি।"

রাত দুটো হবে—এমন সময় ব্রহ্মচারী (তিনকড়ি) আবার এসে বললে—"মহারাজ, আমি শুতে পারছি না, আমাকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। দয়া করে আপনি আমাকে স্থান দিন।"

মহারাজ মনে মনে ভাবলেন—"একটু দেখে নিতে হবে, সহজে থাকতে দিচ্ছি না।" তিনি তিনকড়িকে বললেন—"মা যে তোমাকে আদেশ দিয়েছেন তার নিশানা কিছু আছে? যেমন আমি তোমার গায়ে চিমটি কাটলে একটা দাগ হবে, সেইরকম মা যে তোমাকে আদেশ দিয়েছেন তার নিশানা কিছু আছে?" সে বলল—"মহারাজ, আপনার সঙ্গে আমার পূর্বে কোনও আলাপ ছিল না, আপনি যে এখানে অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন তাও আমি জানতুম না, আপনার নাম কি তাও আমি জানতুম না—এসব মা আমাকে স্বপ্নে বলে দিয়েছেন। দয়া করে আমাকে বিশ্বাস করুন।" এই বলে সে মহারাজের পা দুটি ধরে কাঁদতে লাগলো। তখন তিনি তাকে থাকতে দিলেন।

পরদিন ভোরে মহারাজ মহন্তকে ডেকে বললেন—"এই (তিনকড়ি) সাধু

আমার সঙ্গে থাকবেন—একে যেন রোজ ভাণ্ডারা দেওয়া হয়।" মহন্ত বললে—"এক কৌড়ি ভি নহি হৈ।" শুনেই মহারাজ লাঠিতে ভর করে উঠে দাঁড়ালেন ও বললেন—"চল তিনকড়ি, আমরা এখান থেকে ওই গঙ্গার ধারে যাই, এখানে আর থাকা হবে না।" তিনকড়ি বললে—"মহারাজ আপনি অসুস্থ—এখানে একটু আশ্রয় পাওয়া গেছে—গঙ্গার ধারে গাছতলায় আপনার কষ্ট হবে।" উত্তরে মহারাজ বললেন—"গুরু মেহেরবান তো চেলা পাহলোয়ান। চল ঐখানে দেখবে কত লোক সেবা করতে আসবে, কোন কষ্ট হবে না।" মহন্ত খোকা মহারাজের মূর্তি দেখে ভীত হয়ে বললে—"ঠার যাইয়ে মহারাজ, কোই সুরত সে মিল জায়গা।" এইরূপ কাকুতিমিনতি করায় মহারাজ সেখানেই রহিলেন। প্রায় দুই মাস এই সময়ে মহারাজকে রোগ-ভোগ করতে হয়েছিল। এই সময়ে কয়েকটি অবসরপ্রাপ্ত হাবিলদার সিপাহী প্রভৃতিও এসে সেখানে তাঁর সেবা করেছিল।

আর একবার খোকা মহারাজ যখন পায়ে হেঁটে বিন্ধ্যাচল যাচ্ছিলেন, ভাবলেন—দেখি ঠাকুর আজ কিছু জোটান কিনা। এই ভেবে গ্রাম থেকে দু-তিন মাইল দূরে এক গাছতলায় আশ্রয় নিলেন। বসে আছেন ও ঠাকুরকে স্মরণ করছেন। এমন সময় দেখেন—একজন লোক এক চাঙাড়ি খাবার ও এক লোটা জল নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত। লোকটি জিজ্ঞাসা করলে—"মহারাজ, আজ আপকো খানাপিনা হুয়া?" মহারাজ বললেন—"জলযোগ হুয়া।" "জলযোগ ক্যা?" মহারাজ বললেন—"আস্নান করেনেকো বখত দো চার অঞ্জলি পানি ঔর ক্যা?" লোকটি বললে—"আপকো খানা মৈ লায়া হুঁ।" এই বলে খাবারের চাঙাড়ি তাঁর সম্মুখে রেখে দিল। মহারাজ তা থেকে পাঁচ-ছয়খানা লুচি, কিছু মিষ্টি ও আলুর দম রেখে বললেন—"ইসমে হামারা পুরা হো যায়গা।" তারপর নিকটেই কতকগুলি রাখাল গরু চরাচ্ছে দেখে, ডেকে তাদের বসালেন ও সকলকে একটি করে পাতা দিয়ে ঐ খাবার সব খাইয়ে দিলেন। শেষে নিজের জন্য যা রেখেছিলেন তা গ্রহণ করলেন। রাখালরা আনন্দে মহারাজকে বলতে লাগলো—"মহারাজ, তু এহাঁ পর রহ যা।"

শ্রীশ্রীঠাকুর সম্পর্কে মহারাজ একদিন বলেছিলেন—"ঠাকুর যার তার খাবার খেতে পারতেন না, খাবার দেখেই বুঝতে পারতেন দাতা কি প্রকারে অর্থ উপার্জন করেছে।"

একদিন এক মারোয়াড়ি ভাল ভাল খাবার ঠাকুরকে দিয়েছিল। ঠাকুর হাত গুটিয়ে নিলেন। খাওয়া হলো না। সে মারোয়াড়ির একজন পুরানো বাঙালি কর্মচারি সেখানে ছিল। তাকে গোপনে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল সেই মারোয়াড়িটি তার বড় ভাইকে খুন করে তার বিষয় ভোগ করছে।

পূজনীয় খোকা মহারাজেরও অন্তর্দৃষ্টি খুব প্রখর ছিল, তিনি লোক দেখা মাত্রই সে কেমন লোক চিনতে পারতেন। যখন পূর্ববঙ্গে নারায়ণগঞ্জে ছিলেন সেই সময়ে একজন ধনী গৃহস্থের বাড়িতে অবস্থানকালে একদিন একটা লোক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। তাকে দেখেই মহারাজ বুঝতে পারেন লোকটা চোর। তার সঙ্গে দু-চারটা কথা বলেই তিনি তাকে বিদায় করে দিলেন। পরে উপস্থিত ভক্তদের বললেন—"লোকটাকে দেখেই মনে হলো লোকটা চোর।" উপস্থিত ভদ্রলোকেরা লোকটাকে চোর বলে জানতেন। তারা বললেন—"মহারাজ আপনি কি করে জানলেন লোকটা চোর। আমরা জানি ও এইরকম করে লোকের সঙ্গে আলাপ করে—ফাঁক পেলেই ছেলেদের গায়ের গহনা বা কিছু চুরি করে নিয়ে পালায়।"

মহারাজ যখন মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন তখন একদিন প্রাতঃকালে এক ভৈরবী এসে উপস্থিত। এসেই আশ্রমবাসী সাধুদের কাছে ভৈরবী গীতার শ্লোক ঝাড়তে থাকে। সাধুরা মনে করেছিলেন সত্য সত্যই তিনি ভৈরবী। ভৈরবী কিছুক্ষণ শ্লোক আওড়াবার পর বলে—"আমার শরীর অসুস্থ—আমি আপনাদের এখানে দিন কতক থাকবার জায়গা পাব কি?" সাধুরা তাকে প্রকৃত ভৈরবী মনে করে বলেন—"হাঁ, আমাদের অনেক ঘর নিচে খালি পড়ে আছে, আপনি একটাতে থাকতে পারেন।" মহারাজ তখন ওপরের ঘর থেকে এই কথাবার্তা শুনতে পান ও উঁকি মেরে দেখেন। তিনি নিচে নেমে এসে একজন সাধুকে বলেন—"তোমরা সাধু হয়েছ—লোক চিনতে পার না? ওই

স্ত্রীলোকটার ফিরঙ্গরোগ [সিফিলিস]। ওকে আশ্রয় দিলে আশ্রমের চাকর-বাকরগুলোর ঐ রোগ হয়ে পড়বে—ওটাকে সরিয়ে দাও।" একজন সাধু বললেন—"ও যে ভণ্ড তা আপনি কি করে জানলেন?" খোকা মহারাজ বললেন—"আচ্ছা, তোমাদের মধ্যে একজন ডাক্তার সাজো, সেজে মেয়েটাকে একটু সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কৌশলে জিজ্ঞেস কর ওর কোন রকম ব্যারাম আছে কিনা।" সেই কথা মতো সাধুদের মধ্যে একজন স্ত্রীলোকটিকে একটু আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন—"মায়ী, আমি এখানকার ডাক্তার। তোমার কোন অসুখ হয়ে থাকে তো আমায় সব খুলে বল, আমি ওষুধ দিব—সব সেরে যাবে।" এ-কথা ও-কথার পর মেয়েটি তার রোগের প্রকৃত পরিচয় দিয়ে ফেললো। তখন সাধুটি প্রকৃত রোগটি কি জেনে আশ্চর্যান্বিত হলেন ও খোকা মহারাজকে এসে বললেন—"মহারাজ আপনার কথাই সত্যি—এখন কি করা যায়?" মহারাজ বললেন—"ওকে যা হয় একটা ওষুধ দিয়ে দাও আর একটি টাকা দিয়ে বিদেয় করে দাও।"

পূজনীয় খোকা মহারাজ যার পক্ষে যেরূপ উপদেশ কল্যাণকর তাকে সেরূপ উপদেশ দিতেন। একদা কোন ভক্তের মনোভাব বুঝতে পেরে তাকে এরূপ উপদেশ দিয়েছিলেন।

"সংসারে আছ তাতে হয়েছে কি? সংসারও তাঁরই [ভগবানেরই]। তোমার ইচ্ছায় কি কিছু হয়েছে, না তোমার অনিচ্ছায় কিছু হওয়া বন্ধ হবে? কত নারী সন্তান কামনা করছে সকলেরই কি সন্তান হচ্ছে? তাঁরই ইচ্ছায় জীব জন্মগ্রহণ করছে—তিনিই পালন করবেন—তুমি কে? সন্তান জন্মাবার আগেই মায়ের বুকে যিনি স্তন্য দিয়েছেন তিনিই পালন করবেন। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন বটফল অশ্বত্থফল পাকে, সেই সময় দেখতে পাও না, পাখিদের বাচ্চা হয়। ধাড়ি পাখিটা ঠোঁটে করে সেই ফল নিয়ে গিয়ে বাচ্চাদের খাওয়ায়। দুঃখও তাঁর কৃপা বলে মনে করবে। সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় ঘুরছে। মানুষের জীবনে কখনো সুখ কখনো দুঃখ এই নিয়েই সংসারে জীব ঘুরছে। কেউ চিরদিন দুঃখে থাকে না, আবার কেউ চিরদিন সুখ ভোগ করে না। দুঃখের পিছনেও মহামায়া

আছেন বুঝবে। ছেলেবেলায় যখন আমি খুব দুষ্টুমি করতুম, তখন আমার মা একখানা কম্বল লম্বা করে (নিজেকে ঢেকে) ফেলতেন—মাকে আমি আর দেখতে পেতুম না। লম্বা কম্বলখানা দেখে ভয়ে মা মা করে কেঁদে উঠতুম। মা তখনই কম্বলখানা ফেলে দিয়ে আমায় কোলে করতেন। সেইরকম মানুষ দুঃখে পড়েও যদি কেঁদে কেঁদে তাঁকেই ডাকে, তিনি তাকে কোলে তুলে নেন।"

ছেলের ফোড়া হয়েছে, খুব পেকেছে, তখন হয়তো টিপে পুঁজটা বের করে দিলে। ছেলে কেবল যন্ত্রণাটাই বুঝলে।

তাঁরই শরণাগত হয়ে থাকতে হয়—প্রার্থনা করতে হয়—"ঠাকুর আমি যদি তোমায় ভুলে থাকি, তুমি আমায় ভুলো না।"

খোকা মহারাজ গল্প করেন—"কাশীপুরের বাগানে যখন ঠাকুর ছিলেন, একদিন তিনি আর আমি আছি, আর কেউ নেই। আমি তাঁকে বললুম—"নাক টেপাটেপি, জপ-ধ্যান, এরকম করে বসা, ওরকম করে বসা—এসব আমি কিছু করতে পারবো না—বলুন যেন শীঘ্র আমার উপলব্ধি হয়।" ঠাকুর হেসে বললেন—"ওসব কিছু করতে হবে না, সকাল সন্ধ্যায় একটু করে স্মরণ করিস তা হলেই হবে।" আমি বললুম, "মনে পড়ে তো করবো। বলুন শীঘ্র যেন উপলব্ধি হয়—নাক টেপাটেপি করতে পারবো তো আপনার কাছে আসবো কেন? আপনাকে তো অন্য কিছু মনে হয় না—সাক্ষাৎ তিনিই মনে হয়।" ঠাকুর হেসে তিনবার পিঠ বুক ঠুকে দিয়ে বললেন—"হবে, হবে, উপলব্ধি হবে। এরপর তোদের দেখে কত লোক শিখবে।"

মহারাজের হাতের লেখা খারাপ ছিল। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাহাকে একটি গান লিখিতে বলেন। হাতের লেখা ভাল হয়নি দেখে ঠাকুর তাকে খুব বকেছিলেন। তিনি ঠাকুরের বকুনি খেয়েও হাসছেন দেখে ঠাকুর বলেন—"আমি তোকে বকলুম আর তুই হাসছিস?" তিনি বলেন—"আপনার বকুনিও আমার ভাল লাগে।" এই কথা শুনে ঠাকুর তাকে জড়িয়ে ধরেন ও চুমো খান। এইরূপ ঠাকুর তাকে কতবার আদর করেছেন।

৩-২-১৯২৯ খ্রিঃ খোকা মহারাজ দেওঘর বিদ্যাপীঠ থেকে স্বামী

বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের দিন পুরুলিয়া ফিরে আসেন। পরের দিন (৪-২-১৯২৯) সন্ধ্যার ঘটনা ও কথোপকথন এইরূপ ঃ

কোন বন্ধু ৩-২-১৯২৯ তারিখে ঠাট্টাচ্ছলে ঠাকুরের নিন্দা করে। সহ্য করতে না পেরে তাহার প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করি। মন খারাপ হওয়ায় ঐ ঘটনার উল্লেখ করে মহারাজকে জিজ্ঞেস করি—সেই বন্ধুটির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব কিনা। মহারাজ বলেন—"সেও বলেছে, তুমিও তার জবাব দিয়েছ—ওসব floating account [ভেসে আসে ভেসে যায়], ওর জন্য মন খারাপ করা কেন?" তারপর এসব ক্ষেত্রে কি করতে হয় সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ঠাকুরের ধোপা ও ব্রাহ্মণের গল্পটি বলেন—"ধোপা কাপড় কেচে পুকুরের ধারে শুকুতে দিয়েছিল। ব্রাহ্মণ হরি চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক ভাবে ধোপার কাপড় মাড়িয়ে যাচ্ছিল। ধোপা ব্রাহ্মণকে গালাগাল দিয়ে মারতে আসে। হরি বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী-সহ বসেছিলেন। ব্রাহ্মণের বিপদ দেখে হরি তাকে রক্ষা করবার জন্য উঠে যান। কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে আসেন। লক্ষ্মী জিজ্ঞাসা করেন—'প্রভু, আপনি হঠাৎ উঠে গেলেন, আর কিছু দূর গিয়েই ফিরে এলেন কেন?' হরি উত্তর করলেন—'যার জন্য যাচ্ছিলাম সে নিজের ব্যাপার নিজেই করেছে আমার অপেক্ষা আর রাখলে না।' ব্রাহ্মণ ধোপার গালাগাল শুনে ধোপাকে মারবার জন্য ইট তুলেছিল। সেইজন্য ঠাকুর তাকে সাহায্য করতে না গিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন।"

"ঠাকুর বলতেন—ঠিকঠিক ভগবানের ওপর নির্ভর করে তাঁকেই স্মরণ করতে থাকলে তিনিই দুষ্টের দমন করেন, নিজেকে কিছু করতে হয় না। আর নিজে কোন প্রতিকারের উপায় করতে গেলে তিনি আর কিছু করেন না।"

এইপ্রসঙ্গে মহারাজ আর একটি গল্প বলেন—"আলমোড়ার বদ্রীশা ঠাকুরের একজন যথার্থ ভক্ত ছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন—'পৃথিবীর অনেক জায়গায় ঘুরলাম কিন্তু বদ্রীশার মতো ভক্ত দেখি নাই।' সেই বদ্রীশার বাড়িতে স্বামীজী কিছুকাল ছিলেন। স্বামীজী বিলাত ফেরত, বদ্রীশা তাঁকে বাড়িতে রেখেছিল—এইসব নিয়ে সেখানকার কয়েকজন ব্রাহ্মণ বদ্রীশার ওপর

অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে জব্দ ও অপমান করবার জন্য একটি নাটক রচনা করে বদ্রীশাকে নাটক দেখতে নিমন্ত্রণ করে। বদ্রীশা তাদের অভিপ্রায় বুঝতে না পেরে অভিনয় দেখতে যায়। অভিনয়ে একজনকে বিবেকানন্দ সাজিয়ে তার গলায় ডিমের খোলার মালা পরিয়ে দেয়া হয়েছিল। আর একজনকে শা-জী সাজানো হয়েছিল। বদ্রীশা এসব দেখেই, স্বামীজী ও তাকে অপমান করবার জন্যই যে অভিনয় করা হয়েছে তা বুঝতে পেরে কাঁদতে কাঁদতে অভিনয় গৃহ ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে আসে ও সারারাত ঠাকুরের নাম করে কাঁদতে থাকে। ঘটনার তিন চার দিনের মধ্যেই সংবাদ পাওয়া গেল—যে সাত জন লোক উদ্যোগী হয়ে সেই অভিনয়ের ব্যাপার করেছিল, হঠাৎ তাদের জ্বর হয়ে ছয় জন লোক মারা গিয়েছে, একজন বাকি ছিল তারও খুব জ্বর। এমন অবস্থায় সে বদ্রীশার বাড়ি এসে জোড় হাত করে বলতে লাগলো—'শা-জী, আমরা বুঝতে না পেরে অন্যায় করেছি—আমাকে ক্ষমা কর'—ইত্যাদি বলে কাকুতি মিনতি করতে লাগলো। বদ্রীশা উত্তরে বলেন—'আমি কি জানি, ঠাকুর সব—তিনিই সব জানেন—সব করছেন। তিনি ক্ষমা করেন তো হবে'।"

আর একবার, খোকা মহারাজ তখন বেলুড়ে, গঙ্গায় স্টিমারে করে বেড়াচ্ছেন। স্টিমারে বালির কয়েকটি যুবক বিবেকানন্দ স্বামীজীর নানারূপ কুৎসা করতে থাকে। খোকা মহারাজ তাদের কথা শুনে বলেন—"আপনারা যদি বেলুড় মঠে কেউ কিছু সাহায্য করেন, তা না হয় আজ থেকেই বন্ধ করে দিন—নিন্দা করে লাভ কি? নিন্দা করলে স্বামীজীর যে দুটো হাত—তা পড়ে যাবে না, আর প্রশংসা করলেও আরো দুটো গজাবে না।" যুবকগণ বলে তারা কেউ মঠে সাহায্য করে না। মহারাজ বলেন, "তাহলে মশায়, আপনারা অনর্থক নিন্দা করেন কেন? আপনারা সাধুদের সুখ্যাত করবেন কেন? আপনারা যে অফিসে কাজ করেন সেই অফিসের সাহেবদের খোশামুদি ও সুখ্যাত করবেন, যারা কাজের একটু এদিক ওদিক হলে বুটশুদ্ধ লাথি মেরে আপনাদের তাড়িয়ে দেবে।"

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই ঐ যুবকদলের মধ্যেই একজন বেলুড় মঠে

গিয়ে খোকা মহারাজের কাছে বলে, "মহারাজ, আমরা না বুঝতে পেরে সে দিন বড় অন্যায় করেছি। আর আপনি যা সে দিন বলেছিলেন সত্য সত্যই তা ফলে গিয়েছে। সে দিন স্টিমারে যারা ছিল তাদের মধ্যে একজনকে সাহেব লাথি মেরে অফিস থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।"

খোকা মহারাজ উত্তরে বলেন—"সে দিন আপনারা যখন আমাদের নিন্দা করেছিলেন তখন আমাদের যে দুটো হাত ছিল তা খসে পড়েনি, আর আজ আমাদের প্রশংসা করছেন বলে আজ দুটো নতুন হাত গজায়নি।"

খোকা মহারাজ কোন সময়ে শান্তিপুরে—মুখার্জির বাড়ি ছিলেন। সেই সময়ে ডাঃ লাহিড়ির সহিত আলাপ হয়। ডাক্তার একটু-আধটু কারণ পান করতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় ডাক্তার নেশার ঝোঁকে মহারাজকে যা তা বলেন। তাকে মহারাজ বলেন—"ডাক্তার কী দুবোতল ধেনো খেয়ে ওসব বলছ? নিয়ে এসো শেরি শ্যাম্পেন, দুজনে আমোদ করা যাবে।" ঘটনাচক্রে সেই রাত্রেই ডাক্তারবাবুর খুব জ্বর হয়। মহারাজ পরদিন প্রাতে ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে দেখেন ডাক্তার বৈঠকখানায় শুয়ে আছেন। তখনো ১০৪° জ্বর, যন্ত্রণায় ছটফট করছেন। মহারাজ গিয়েই ডাক্তারবাবুর বিছানায় বসে তার মাথায় গায়ে হাত বুলুতে লাগলেন। তাঁর এরূপ ব্যবহার দেখেই ডাক্তারবাবু তার ভগিনীকে ডেকে বলতে লাগলেন—"ওরে দেখে যা—এরা রাগ করবার ছেলে নয়, দেখে যা, দেখে যা কাল যাকে আমি খারাপ কথা বলেছি তিনি এসে আমার সেবা করছেন।" এই বলেই রোগ যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে ডাক্তারবাবু মহারাজের জন্য তামাক সাজতে বসলেন। মহারাজ নিষেধ করায় বললেন—"আমি এখন বেশ পারবো, আমার এখন কষ্ট বোধ হচ্ছে না।"

মহারাজ সেই ডাক্তারবাবুকে উপদেশ দেন, "ডাক্তারবাবু, ডাক্তারি করে অনেক পয়সা করেছ—এখন থেকে গরিবদের কাছে টাকা নিও না। গরিবের সেবায় জীবনটা বিলিয়ে দাও।" ডাক্তার তদবধি গরিবদের কাছ থেকে টাকা নিতেন না। গরিবের সেবায় জীবন কাটিয়েছিলেন, আর কারণ পান করাও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

মহারাজের পিতা মাতা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। ছেলে সাধু হবার পর পিতার বন্ধুগণ অনুরোধ করেন—"ছেলেটিকে ফিরিয়ে আনুন।" পিতা বলেন—"আমরা সংসারে থেকে ভগবানকে ধরতে পারলুম না, ও যদি তার জন্য চেষ্টা করে তাতে দোষ কি? ও যা করছে ঠিকই করছে, ভগবান লাভ করতে পারলে তার চেয়ে সুখের বিষয় আর কি আছে?"

আরও পূর্বে যখন সুবোধ ঠাকুরের কাছে খুব যাতায়াত করছিলেন, তখনও তাঁর পিতার বন্ধুগণ তাঁকে ঐ সম্বন্ধে সচেতন করতে উদ্যত হলে তিনি বলেছিলেন—"আমি পরমহংসদেবকে জানি, তাঁর কাছে এলে গেলে ওর কোনই অমঙ্গল হবে না। ওর ভালই হবে, ওকে কেউ বাধা দিও না।"

সাধু হবার পরে একদিন মাতৃদর্শনে গেলে তাঁর মাতা তাঁকে বলেন—"যা করছ ভাল করে কর, যা করবে প্রাণ দিয়ে করবে, যা ধরেছ শক্ত করে ধর। যেখানে থাক আশীর্বাদ করি সুখে থাক ও তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হোক।"

খোকা মহারাজ উপদেশ দিতেন—"ভগবানের কৃপা না হলে মানুষের একচুল তাঁর দিকে এগুবার যো নেই। তাঁর শরণাগত হয়ে পড়ে থাকতে হয়। আবার এমনি তাঁর খেলা যে মাঝে মাঝে তিনিই মনটা তাঁর দৈবী মায়ায় চঞ্চল করে দেন। তখনো তাঁকেই ধরে থাকতে হয়। এ সংসার তাঁর সৃষ্টি—তাঁর ইচ্ছাতেই জন্ম, তিনিই পালন করেন। মানুষের সাধ্য কি? যদি ছেলে মরেই যায়, মানুষ কি কোন উপায়ে তাকে বাঁচাতে পারে? তাঁর ইচ্ছাতেই যে মরবার সে মরবে। তিনিই মা বাপের মনে স্নেহ দিয়েছেন তাঁরই ছেলেদের লালন-পালন করবার জন্য। আবার যদি (ছোট ছেলের) মা বাপ মরে যায়, সেই স্নেহটা তিনি আবার অপর কারো মনে দিয়ে দেন; তারাই আবার পিতৃ-মাতৃহীন ছেলেকে মানুষ করে।"

খোকা মহারাজ প্রসঙ্গক্রমে বলেন—"—দত্ত কালীঘাটে রাত বারোটা একটার সময় গিয়ে দেখেন মন্দির বন্ধ। তিনি সেই সময়ে প্রাণের আবেগে গান ধরেন—'উঠ মা করুণাময়ী, খোলো মা কুটির দ্বার।' কিছুক্ষণ গান করবার পর মন্দিরের দরজা ঝনাৎ করে খুলে গেল। তিনি মাকে প্রণাম দর্শন করে

যেমন বাহিরে এলেন অমনি আবার মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। মা যাকে দেখা দেন, অনেক সময় আশ্চর্য রূপে দেখা দেন। সিমলার কালীমন্দিরে একজন দ্বারবান একদিন রাত্রে দেখতে পায়—একটি পাঁচ ছয় বছরের বালিকা, এক-গা গহনা, পা পর্যন্ত চুল এলো করে ন্যাংটা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দ্বারবান জিজ্ঞেস করলে, 'মা তুমি কাদের মেয়ে? এত রাতে কেন ঘুরে বেড়াচ্ছ?' এই বলে যেমন তাকে ধরতে যাবে অমনি বালিকা সরে গেল। এইরকম কিছুদিন এদিক ওদিক করেও দ্বারবান তাকে ধরতে পারলো না। মন্দির বড় বড় তালা দিয়ে বন্ধ—বালিকা দরজার কাছে যাবামাত্র ঝনাৎ করে কপাট খুলে গেল, আর বালিকা মন্দির মধ্যে ঢুকতেই কপাট বন্ধ হয়ে গেল। দ্বারবান অনেক দিন থেকেই সেই মন্দিরে চাকরি করছিল। তার মাইনের টাকা অনেক দিন থেকেই নেয়নি। এই ঘটনার পরদিন সে গুহবাবুদের কাছে গিয়ে বললে, 'আমার মাইনের যে টাকা আছে, বাবুরা তা জমা রেখে তার সুদ থেকে যেন মন্দিরে ছোলা ও চিনি বৈকালিক দেন; আর আমি যত দিন বাঁচবো আমি বিনা বেতনেই মন্দিরে দ্বারবান থাকবো। আমার মাইনেটাও যেন ঐরূপ বৈকালিকে খরচ হয়।'"

৬-২-১৯২৯,

খোকা মহারাজ বললেন ঃ সুখ দুঃখ তিনিই দেন। তাঁর শরণাগত হয়ে থাকতে হয়। আমি একমুঠো ভাতের জন্য সাধু হইনি। আমি বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার করতে পারতুম। বাপ মা ভাই আত্মীয়স্বজন ছেড়ে সাধু হলাম কেন—শুধু তাঁর জন্য। এমন দিন গেছে শুধু তাঁর নাম করে গাছতলায় পড়ে থেকেছি অহোরাত্র, তাঁর কৃপায় অপ্রত্যাশিতভাবে খাবার জুটে গেছে। তখন কাউকে ভ্রূক্ষেপ করতুম না, দেব-দেবী পর্যন্ত নয়। একদিন আমার পেটের অসুখ হয়েছে, একটি জঙ্গলে মহাবীরের মন্দিরের বারান্দায় শুয়ে আছি। একটু তন্দ্রা এসেছে, দেখি ঠাকুর এসে বলছেন, "এখনই মহাবীর তোর কাছে এসে ঠাণ্ডি সরবত খেতে দিতে চাইবে। ইচ্ছা হলে খেতে পারিস।" তন্দ্রা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলুম, "কৈ মহাবীর?" ঠাকুর বললেন—"ঐ আসছে।" অমনই

তন্দ্রা ভেঙে গেল। দেখলাম একজন লোক সেই জঙ্গলের মধ্যে আসছে। সে এসেই আমাকে জিজ্ঞেস করলে, "মহারাজ পিয়াস লাগা হৈ? ঠাণ্ডি পিয়োগে?"

বললুম—"কৌন জাত হৈ?" সে বললে—"মুসলমান।" বললুম, "মুসলমান কা পানি নহি পিতে হৈ।"

এখনও স্বপ্নে দেব-দেবী দর্শন হয়—তাঁরা এসে জিজ্ঞেস করেন, "কি রে, তোরা কেমন আছিস?" আমি বলি—"ভাল আছি।" কামনা-বাসনা কিছু তো নেই যে কিছু চাইব। এই তোমরা যেমন আসছো বসছো আবার বাড়ি চলে যাচ্ছ, সেইরকম দেব-দেবীর। দর্শন হলেও মনের একটা কোন পরিবর্তন হয় না। অমন কত আসে, কত যায়, তাতে আমার কি?"

তিন চার বছর পূর্বে পূর্ববঙ্গে থাকার সময় মহারাজ লক্ষ্য করেছিলেন অনেক জমিদারের ছেলে আমোদ-প্রমোদে বাজে খরচ করছে। তিনি তাদের সদুপদেশ দিয়ে সে রাস্তা থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। তারা তারপর থেকে আর বাজে খরচ না করে, প্রজাদের মঙ্গলের জন্য নলকূপ ইত্যাদি খনন ও নানাপ্রকার লোকহিতকর কাজে মন দিয়েছিল।

একদিন প্রত্যুষে বেড়াবার সময় খোকা মহারাজ শরৎবাবুকে বলেন, "দেখ দেখি কেমন সূর্য উঠেছে।" শরৎবাবু বলেন, "বেশ চমৎকার।" মহারাজ বলেন, "ও আর কি দেখছিস?" ঠাকুর যেদিন আমায় ছুঁয়ে দেন সেদিন অমন কতগুলি যে সূর্যলোক—ওর চেয়ে আরও বড় বড় সূর্যলোক পার হয়ে গিয়েছিলাম, তা আর কি বলবো। কত গ্রহ নক্ষত্র পার হয়ে স্বর্গ-মন্দাকিনীতে যখন পৌঁছলুম হাতে করে মন্দাকিনীর জল মাথায় দিলুম। দেবতারা সব ছিলেন। তাঁদের কথা সব ভাঙা ভাঙা। মুক্তোর মতো তাঁদের শরীর। তাঁরা বললেন—'এই! তুই মানুষ হয়ে এখানে কেমন করে এলি?' আমি বললাম, 'যাঁর কৃপায় তোমরা দেবতা, আমি তাঁর ছেলে।' দেবতারা হাসতে লাগলেন। তারপর ফিরে এসে শরীরের ভিতর ঢুকতে ইচ্ছা হলো না। ঠাকুর বললেন—'ঢোক।' আমি বললাম—'শরীরে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে, আর ঢুকতে ইচ্ছা হচ্ছে না।' তারপর ঠাকুর আমাকে ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে শরীরে ঢুকিয়ে দিলেন।"

ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ তাহা প্রথমত খোকা মহারাজের উপলব্ধি হয় নাই। দক্ষিণেশ্বরে সকলে যখন ঐ কথা বলাবলি করতো তখন তিনি ওসব বিশ্বাস করতেন না। বলতেন, "First see. then believe." [আগে দেখ তারপর বিশ্বাস কর]। একদিন ঐরকম কার সঙ্গে কি কথা হচ্ছে, ঠাকুর এসে বললেন—"কি রে, তোদের কি কথা হচ্ছে।" খোকা মহারাজ বললেন—"আপনাকে এঁরা ভগবান বলছেন, আমার কিন্তু বিশ্বাস হচ্ছে না।" ঠাকুর বললেন—"ঠিক তো। না দেখে কোন কথা বিশ্বাস করবিনি।" তারপর একদিন কোন ঘটনায় ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম সে কথা বুঝতে ঠাকুরকে গিয়ে ঐ কথা বলাতে তিনি হাসতে লাগলেন। ঘটনাটি যে কি সে কথা জিজ্ঞাসা করাতে খোকা মহারাজ আমাদের কথায় শুধু হাসলেন।

খোকা মহারাজ ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ির এক ঝির কাছে একটি গল্প শুনেছিলেন—

"যে করে আমার আশ আমি তার করি সর্বনাশ।
তবুও না ছাড়ে আশ শেষে হই তার দাসের দাস ॥"

গল্পটি এই ঃ

এক ব্রাহ্মণ একদিন বাজারে মাছের দোকানে গিয়ে দেখেন মেছুনি যে বাটখারা দিয়ে মাছ ওজন করছে সেটি একটি পাথর। ব্রাহ্মণ দেখেই চিনতে পারলেন, উহা যে সে পাথর নয়, একটি শালগ্রাম শিলা। ব্রাহ্মণ ঐ মেছুনির শিলাটি কিনিতে চাহেন। মেছুনি বলে—"ঠাকুর, এটি বেচলে, আমি মাছ ওজন করবো কি করে?" ব্রাহ্মণ বলেন, "তুই যা দাম চাইবি আমি তাই দিব, পাথরটি আমায় দে।" মেছুনি বললে, "আচ্ছা পাঁচ টাকা দাও তো দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ তৎক্ষণাৎ পাঁচ টাকা দিয়ে শিলাটি বাড়ি নিয়ে গেলেন ও পঞ্চগব্য দিয়ে অভিষেক করে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

সেই রাত্রে ব্রাহ্মণ স্বপ্ন দেখেন নারায়ণ তাকে বলছেন—"আমায় কেন আনলি? যেখানে ছিলাম সেখানে রেখে আয়। নইলে তোর সর্বনাশ করবো।" ব্রাহ্মণ স্বপ্নেই উত্তর দিলেন—"সর্বনাশই হোক আর যাই হোক আমি তোমায়

ছাড়বো না।" তারপর ব্রাহ্মণের একমাত্র পুত্রের অসুখ হলো ও সে মারা গেল। ঠাকুর আবার স্বপ্নে বললেন—"এখনো রেখে আয়।" ব্রাহ্মণ বললেন—"কখনো না।" তারপর এক এক করে ব্রাহ্মণের স্ত্রী কন্যা পুত্রবধূ সকলে মারা গেল। ঠাকুর আবার এসে স্বপ্নে বললেন—"এইবার তোকেও নেব।" ব্রাহ্মণ অমনি বললেন—"কবে আমি যাব ঠাকুর?" ভগবান বললেন, "অমুক মাসে অমুক তিথিতে অমুক সময়ে তুই মাথায় বাজ পড়ে মরবি।" ব্রাহ্মণ সেই দিন, সেই সময়ে মাথায় শালগ্রাম শিলাটিকে নিয়ে গঙ্গার ধারে বসে রইলেন। মেঘে দিক দিশা অন্ধকার করে এল। তুমুল বৃষ্টি ও ঘন ঘন বজ্রাঘাত হতে লাগলো। ব্রাহ্মণের মাথার কাছ পর্যন্ত বাজ আসতে লাগলো। এমন সময় নারায়ণ চতুর্ভুজ মূর্তিতে ব্রাহ্মণকে দেখা দিয়ে বললেন—"আমি এত দিন তোমার ধৈর্য পরীক্ষা করলাম, তোমার ধৈর্যে সন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার ছেলে মেয়ে কেহ মরেনি; সকলেই আমার কাছে আছে তুমিও আমার কাছে এসো। তোমার দেহান্তে আমি তোমার শ্রাদ্ধ করবো।"

খোকা মহারাজ শরৎবাবুকে বলেছিলেন যে একদিন বেলুড় মঠে কালীকীর্তন হচ্ছিল। তিনি ওপর তলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় মাঝে মাঝে বেড়াচ্ছিলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরে ছিলেন। নিচে কীর্তন খুব জমে গিয়েছে, তখন রাত প্রায় আটটা নয়টা। এমন সময় খোকা মহারাজ দেখেন একটি আট নয় বছরের মেয়ে গঙ্গার ঘাটে সিঁড়ির ওপর গঙ্গার দিকে পা ঝুলিয়ে বসে আছে। মহারাজ ভাবছেন এত রাতে কাদের মেয়েটি একা বসে আছে, পথ ভুলে যায় নি তো? এই মনে করে নিচে যারা ছিল তাদের ডেকে বললেন—"দেখতো, কাদের মেয়েটি ঘাটে বসে আছে?" এই বলতে বলতে মেয়েটি ঝুপ করে গঙ্গায় পড়ে গেল। অমনি মহারাজ বলে উঠলেন, "আরে যাঃ! কাদের মেয়ে একটি গঙ্গায় পড়ে গেল!" শুনে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—"ও আর কাদের মেয়ে—স্বয়ং মা গঙ্গা কালীকীর্তন শুনছিলেন।"

বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ঘরে কেউ শোয় না। একদিন মহাপুরুষ মহারাজ খোকা মহারাজকে বললেন—"খোকা, স্বামীজীর ঘরে কেউ শোয় না,

তুমি ঐ ঘরটায় আজ শোও।” খোকা মহারাজ সে রাত্রে স্বামীজীর ঘরে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেখেন, স্বামীজী তার পিঠে আস্তে আস্তে ধাক্কা দিয়ে বলছেন—“খোকা, এক গ্লাস জল দেনা ভাই।”

পরদিন সকালে উঠে খোকা মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন, “ও ঘরে যেন কেউ না শোয়, ও ঘরে স্বামীজী এখনো আছেন।”

একদিন রাখাল মহারাজ ঘুমুচ্ছেন। খোকা মহারাজও সেই ঘরে আছেন। খোকা মহারাজ জেগে; রাখাল মহারাজ ঘুমুতে ঘুমুতে বলে উঠলেন, “তাঁ দা।” খোকা মহারাজ মনে মনে ভাবতে লাগলেন—“রাজা মহারাজ ‘তাঁ দা’ কি বললেন?” ভাবতে ভাবতে খোকা মহারাজের যেই তন্দ্রা এসেছে, ঠাকুর তাকে বললেন—“রাখাল ‘তাঁ দা’ বললে, তুই বুঝতে পারলিনি? ‘তাঁ দা’ মানে তাঁর দয়া, তাঁর দয়া না হলে কিছু হবার যো নেই।”

(১৭)

ভক্তগণের সৎসঙ্গ

অমলাপ্রসাদ সিংহ

সুবোধানন্দজী (খোকা মহারাজ) পুরুলিয়া হয়ে রাঁচি যাচ্ছেন—পুরুলিয়ায় নামিবেন না। আমার স্ত্রী তাঁহার নিকট ভুবনেশ্বরে দীক্ষা নিয়েছিলেন তদবধি আর তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনের সৌভাগ্য হয়নি, তাই মহারাজ লিখেছিলেন—“তোমরা স্টেশনে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবে, আমার পুরুলিয়া নাবা হইবে না।” কলকাতার ট্রেন সকাল ছয়টায় পুরুলিয়া পৌঁছায়—পুরুলিয়াতে গাড়ি বদল করে রাঁচির জন্য ছোট লাইনের ট্রেন ধরতে হয়। মহারাজ গাড়ি বদল করে ছোট লাইনের গাড়িতে উঠে আমাদের অপেক্ষায় পথ চেয়ে আছেন। সেখান থেকে শহরের রাস্তা অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সে সময়ে আমাদের একটি ঘোড়ার গাড়ি ছিল। একটা ছোট ঘোড়া ব্রুহাম

গাড়িটি টানতো। আমরা সেই গাড়ি করে তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনার্থে স্টেশনে যাই। আমরা নেবে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলাম। মহারাজ বললেন—"ঐ গাড়িটা দূর থেকে আসতে দেখেই আমি বুঝলুম তোমরা আসছো।"

তাঁহার সহিত আমাদের এইবারের সাক্ষাৎ সম্ভবত ১৯২৭ খ্রিস্টাব্দের শীত কালে হয়েছিল।

এরপর ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধের সময় তিনি রাঁচি হতে পুরুলিয়া আসেন। তখন শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় পুরুলিয়ার পোস্টমাস্টার ছিলেন। তাহার বাড়িতে মহারাজ প্রায় দশ বারো দিন থাকেন। ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসের প্রথমেই মহারাজ আবার রাঁচি ফিরে যান। পহেলা ফেব্রুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবের দিন আবার রাঁচি থেকে ফিরে এসে পুরুলিয়ায় শরৎবাবুর বাসায় কয়েক দিন থাকেন। এই দুইবারে মিলে প্রায় মাসাবধি তিনি পুরুলিয়ায় ছিলেন।

প্রথম বারে বড়দিনের সময় যখন পুরুলিয়া ছিলেন তখন তাঁহার শরীর রাঁচির চেয়ে উন্নতি লাভ করেছিল। আমি শরৎবাবুর নির্দেশ মতো তাঁহার একটি ফটো তুলিবার ব্যবস্থা করি। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বর তাঁহার একটি ফটো তোলা হয়।

দ্বিতীয়বার ১৯২৯ সালে যখন আসেন তখন বললেন যে রাঁচি গিয়ে তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিল। পুরুলিয়ায় কয়েক দিন রহিলেন বটে কিন্তু পূর্বের মতো আর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলো না।

মহারাজের আগমনে সে সময়ে শরৎবাবুর বাড়িতে ভক্তগণ সর্বদা সৎসঙ্গ ও ভগবৎ প্রসঙ্গের জন্য মিলিত হতেন। শরৎবাবু, তপানন্দ স্বামী, হরিবাবু, তুলসীবাবু, শশাঙ্কবাবু প্রভৃতি অনেকে আমরা তখন মহারাজের পুণ্য সঙ্গ লাভে ধন্য হয়েছিলাম। সে সময়ে আমরা যেসব কথাবার্তা শুনতাম তাহা লিখে রাখতে শরৎবাবু আমাদের বলতেন। তদনুসারে আমি সে সময়ে যাহা যাহা লিখে রেখেছিলাম, তা থেকেই নিম্নোক্ত ঘটনাগুলি নেওয়া হয়েছে। মূলত সেই সময়েই ঘটনাগুলি লিখে রাখা হয়েছিল।

১। খোকা মহারাজ তাঁর সহপাঠী বন্ধু ক্ষীরোদের সহিত সর্বপ্রথমে বাড়িতে না বলে শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করতে হেঁটে দক্ষিণেশ্বর যান। ইতঃপূর্বে তিনি কলকাতার বাহিরে কখনও যাননি, এমন কি ধানগাছও দেখেননি। পথে জিজ্ঞেস করেছিলেন, "ও কিসের গাছ।" দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছে ঠাকুরের ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন, ভিতরে যাননি। ঠাকুর তাঁকে ভিতরে আসতে বলেন ও হাত ধরে নিজের খাটের ওপর বসান।

২। পরের বারে যখন দক্ষিণেশ্বরে যান, তখন ঠাকুর তাঁকে পাশের শিবমন্দিরে নিয়ে গিয়ে তাঁর জিবে একটি বীজমন্ত্র লিখে দেন ও তাঁকে জপ করতে বলেন। সেই সময়ে ঠাকুর তাঁর কুণ্ডলিনী শক্তি কণ্ঠ পর্যন্ত জাগ্রত করেন, তাহাতে তিনি অপার আনন্দ অনুভব করেন ও কয়েক দিন পর্যন্ত তাঁহার মাতালের মতো ভাব ছিল।

৩। শ্রীশ্রীঠাকুর খোকা মহারাজকে জপ করবার জন্য একটি মন্ত্র বলে দেন। রাত্রে নিজের বিছানায় মশারির ভিতর বসে খোকা মহারাজ সেই মন্ত্র জপ করতেন। জপের সময় দেখতেন, মশারির ওপরে এবং চারিধারে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে! তিনি সেই কথা শ্রীশ্রীঠাকুরকে এসে বলেন। তাহাতে ঠাকুর বলেন, "ঠিক হয়েছে, ভয় পাবিনে, ঐটেই জপ করবি।"

৪। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাবার পূর্বে খোকা মহারাজের খুব ভূতের ভয় ছিল। কিন্তু ঠাকুর ছুঁয়ে দেবার পর থেকে তাঁর ভ্রূমধ্য থেকে অন্ধকারে একটি জ্যোতি বেরুত এবং সেই আলোকে সম্মুখের ও চারিধারের সব দেখতে পেতেন। সেজন্য রাত্রে আর ভূতের ভয় করতো না। আমরা জিজ্ঞেস করেছিলাম—কত দিন ঐ রকম জ্যোতি বের হতো? তাতে তিনি বলেছিলেন—অনেক দিন ছিল তারপর ওদিকে আর বিশেষ লক্ষ্য করতুম না এবং আস্তে আস্তে কখন সেটা চলে গেল।

৫। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যে সকল ভক্তরা যেতেন তারা তাকে ভগবান বলতেন। খোকা মহারাজের বিশ্বাস হতো না। একদিন তিনি স্পষ্টই ঠাকুরকে বলেন—"মশায়, এরা সব যে আপনাকে ভগবান বলে এটা কি ঠিক?" তাতে

ঠাকুর কোনরূপ বিরক্ত না হয়ে বলেন—"ঠিক বলেছিস! একটা টাকা পেলে লোকে বাজিয়ে নেয়।" এরপর খোকা মহারাজ এমন একটা কিছু দেখতে পান যাতে তাঁর বিশ্বাস হলো ঠাকুর ভগবান। তখন ঠাকুর তাকে বলেন—"এরপর কেমন?" খোকা মহারাজ বলেন—"এখন ঠিক ঠিক!" (কি দেখে তাঁর ঠাকুরকে ভগবান বলে বিশ্বাস হয়েছিল তা আমাদের কাছে খুলে বলেননি; আমরা ঐ বিষয়ে জানবার একটু চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তিনি চেপে যান।)

৬। দক্ষিণেশ্বরের বাগানে ভক্তরা সকলে কীর্তন করতেন। সে সময়ে অনেকের 'ভাব' হতো। তখন খোকা মহারাজ শ্রীশ্রীঠাকুরকে একদিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, "অনেকেরই তো দেখলুম 'ভাব' হয়, কিন্তু কার ঠিক ঠিক?" তাতে ঠাকুর বলেছিলেন, "লেটোর ঠিক ঠিক হয়।" যখন ভক্তদের ভাব হতো তখন কোন কোন দিন তাঁর ছেলেমানুষি বুদ্ধি জেগে উঠতো এবং তিনি আলপিন ফুটিয়ে তাদের ভাব পরীক্ষা করতেন এবং অনেকের 'ভাব' ভেঙে দিতেন।

৭। সে সময়ে খোকা মহারাজের কোন দিন 'ভাব' হয়েছিল এরূপ কথা বলেননি। তাঁর নিজের বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের সহিত যে সম্বন্ধের বা ব্যবহারের কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করতেন তাতে বুঝা যেত যে তিনি যেন ঠাকুরের আদরের ছোট ছেলেটি ছিলেন। তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে একান্ত আপনার জন, পিতার তুল্য মনে করতেন। এই সম্পর্কের মধ্যে সঙ্কোচের বা গুরুত্বের লেশমাত্র ছিল না। পথশ্রান্ত হয়ে দক্ষিণেশ্বর পৌঁছে ঠাকুরকে হাওয়া করতে করতে যদি ঘুম পেতো, তখন তাঁর আদেশে তাঁর বিছানাতেই শুয়ে পড়তেন। স্নেহময় ঠাকুর খোকার মাথাটি বালিসের ওপর রেখে নিজেই পাখা নিয়ে হাওয়া করতেন, আর তিনি ঘুমিয়ে পড়তেন।

৮। একদিন বুড়ো গোপালদাদা খোকা মহারাজকে ঘর ঝাড়ু দিতে বলেন। তিনি ঝাড়ু দিচ্ছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর তাই দেখে বুড়ো গোপালদাকে বলেছিলেন, "এদের হাতে ঝাঁটা দেবে না।"

৯। শ্রীশ্রীঠাকুর কাশীপুর বাগানে থাকার সময় একদিন খোকা মহারাজ

বাইরে থেকে এসে ঘরের ভিতর ঢুকতে যাবেন, এমন সময় দেখেন শ্রীশ্রীকালী যেন ঠাকুরের ঘরের দ্বারের সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছেন। দেবী তাঁহাকে দেখে ঝুম ঝুম শব্দে নূপুর বাজিয়ে এগিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের মধ্যে মিশে গেলেন।

১০। শ্রীশ্রীঠাকুর যে দিন খোকা মহারাজকে স্পর্শ দ্বারা সমাধি লাভ করান, সে দিনের সম্বন্ধে মহারাজ আমাদিগকে যা যা বলেছিলেন তা প্রকৃত প্রস্তাবে ঠিক ঠিক অনুসরণ করতে পারি নি, তবে যা বলেছিলেন তা এইরূপ ঃ "কোটি কোটি সূর্য গ্রহ চন্দ্র তারকাদি আসিতেছে—বিলীন হইয়া যাইতেছে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় খোকা মহারাজ এই স্থূল দেহ পরিত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে স্বর্গলোকে গমন করেন—স্বর্গলোকে স্বর্গ-গঙ্গা [মন্দাকিনী] দর্শন করেন, দেবতাদেরও দেখেন। সে স্থানের কী মনোরম শোভা, মন্দাকিনীর বারি কী নির্মল, দেবতাদের গঠন ও রূপ কী সুন্দর। "কী তাঁদের চেহারা—কী সুন্দর তাঁদের নাক মুখ চোখ। কথা বললেন, কী মিষ্ট তাঁদের কথা। তাঁদের কথা শুনলুম, কিন্তু বুঝতে পারলুম না।"

সেই সময়ে খোকা মহারাজ দেখেন তাঁর নিজের স্থূল দেহটা পড়ে রয়েছে, তার ভিতর আর প্রবেশ করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু শ্রীশ্রীঠাকুর জোর করে তার ভিতর ঢুকিয়ে দিলেন।

১১। খোকা মহারাজের পূর্বপুরুষ শঙ্কর ঘোষ মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত মা কালীর মন্দিরে (ঠনঠনের কালীবাড়িতে) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গিয়েছিলেন। এ কথা শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন এবং আরও বলেছিলেন—"তোর মামার বাড়িতেও মার মন্দিরে গিয়েছি।"

১২। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর মহারাজও গুরু ভাইরা সব যে যেদিকে পারেন বেরিয়ে পড়েন। দারুণ বৈরাগ্যের তাড়নায় হাঁটা পথে কলকাতা থেকে বিন্ধ্যাচলের দিকে যাচ্ছেন—গয়ার নিকটস্থ জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। মনে সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের চিন্তা। ভাবছেন ঠাকুর যদি সত্য হন এই জঙ্গলের মধ্যে খাদ্য মিলে তো খাবেন নচেৎ অনাহারে প্রাণত্যাগ। এই ভেবে জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক গাছের তলায় বসে পড়েন।

কিছুক্ষণ পরে একটি লোক থালায় করে অনেক খাদ্যদ্রব্য লুচি আলুর দম মেঠাই প্রভৃতি ও পানীয় জল নিয়ে সেখানে উপস্থিত। সে বলে, "বাবাজী আপ ভূঁখা হৈ? আপকাবাস্তে খানা লায়ে।" মহারাজ বুঝলেন করুণাময় ঠাকুর তাকে সর্বদা রক্ষা করছেন। সেই প্রচুর খাদ্য সামগ্রী থেকে কিছু খেলেন আর বাকি সব, কাছে কতকগুলি রাখাল গরু চরাচ্ছিল, তাদের বিলিয়ে দিলেন। খাবার পেয়ে তাদের এত আনন্দ হয়েছিল যে তারা বলতে লাগলো, "বাবাজী, তু এঁহা পর রহ যা।"

১৩। তখন তীব্র বৈরাগ্য, প্রাণের মায়া কিছুমাত্র নেই, খোকা মহারাজ চলেছেন হিমালয়ের বদরীনারায়ণের পথে। চড়াই এলে ছুটে সোজা উঠে যাচ্ছেন, উতরাই এলে ছুটে নামছেন। কখনো কখনো উতরাইয়ের সময়, পাহাড় ঘুরে না নেমে, ঢালু পাহাড়ের গায়ে বসে নিজের শরীর সড়সড় করে পিছলিয়ে নামতে ছেড়ে দিচ্ছেন। সড়সড় করে বহু নিম্নে ধপাস করে পড়লেন—উঠে আবার চলতে লাগলেন। প্রাণের মায়া বলে কোন জিনিস সে সময়ে তাঁকে স্পর্শ করতো না—শরীর থাকে থাক, যায় যাক। এমন বেপরোয়া ভাবে চলতেন যে রাস্তায় এক ব্যক্তি বলেছিল—বাবাজী যেন পাখির মতো উড়ে চলছে (বাবাজী চলতে হৈ যৈসে চিড়িয়াকে মাফিক)।

১৪। একদিন রাত্রে এক গাছতলায় শুয়ে আছেন, এমন সময় স্বপ্নে দেখেন এক সুন্দরী স্ত্রীলোক এসে বলছে, "বাবা, এখানে থেকো না; আমার ছেলেরা বেরুতে পারছে না।" মহারাজ তখন উঠে গিয়ে নিকটস্থ চটিতে চলে গেলেন। পরদিন সকালে এসে দেখেন সেখানে চারিদিকে সাপের গর্ত সাপের খোলস। আমাদিগকে বলেছিলেন যে সে রাত্রে নাগমাতা তাঁকে সেখান থেকে উঠে যেতে বলেছিলেন।

১৫। একদিন এক দেবীর মন্দিরে জপ করতে করতে দেখেন দুপাশে দুটি সাপ ফণা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। সেদিন দেবী তাঁকে দর্শন দিয়ে বলেন, "তুই আমাকে পান দোক্তা দিস।" মহারাজ তারপর পান দোক্তা সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়ে দেবীর পূজা দেন।

১৬। হিমালয়ে [?] ভ্রমণকালে একসময়ে তাঁহার এরূপ ক্ষমতা [যোগবিভূতি] হয়েছিল যে মাটির নিচে দশ হাত পর্যন্ত কি আছে তা দেখতে পেতেন। একদিন এক জায়গায় দেখেন যে সাত ঘড়া মোহর রয়েছে, আর একটা যক্ষ এসে তাঁকে বলছে—"তুমি এগুলো সব লও, এ দিয়ে অনেক ভাল কাজ করো।" তিনি বলেছিলেন—"তুই আমায় লোভ দেখাচ্ছিস? তোর মোহরে পেচ্ছাব করে দি।" এই বলে তিনি সেখানে সত্যি সত্যি প্রস্রাব করে দিয়ে চলে যান।

১৭। হৃষীকেশে এক মোহন্তর আশ্রয়ে থাকার সময় মহারাজ দীর্ঘ দুই মাস কাল আমাশয় রোগে ভোগেন। ভুগে ভুগে শরীর একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হয়ে পড়ে। তিনি মনে মনে শ্রীশ্রীঠাকুরের ওপর দারুণ অভিমান করে বলেন—"এই বন্ধু-বান্ধবহীন বিদেশে এনে এত কষ্ট দেয়া, এ শরীর থাকার চেয়ে যাওয়াই ভাল।" এই বলে গঙ্গার ধারে গিয়ে বসে পড়েন ও বলেন, "এ শরীর এখানেই শেষ হয়ে যাক।" সেই সময়ে অবসন্ন দেহে তন্দ্রার ঘোরে শুনলেন, কে যেন বলছে, "হনুমানজী আসছে!" চেয়ে দেখেন এক সাড়ে ছয় ফিট লম্বা জওয়ান, মাথায় পাগড়ি তাঁর দিকে আসছে। সে এসে বললে, "উঠো, তুমহারা ক্যা তকলিফ হৈ?" মহারাজের তখন দারুণ অভিমানে মন ভরে আছে। তিনি আমাদের কাছে বলেছিলেন—"হনুমানজী না কে—কে জানে—তাকে হাঁকিয়ে দিলুম। বললুম—"কোই তকলিফ নহি হৈ।"

তারপর একটি ব্রহ্মচারী সেখানে আসে ও মহারাজকে তার সঙ্গে যাবার জন্য অনুরোধ করে। তাকেও তিনি হাঁকিয়ে দেন। পরদিন সকালে আবার সেই ব্রহ্মচারী লোকজন নিয়ে আসে। (যতদূর স্মরণ হয় সেই ব্রহ্মচারী মহারাজকে বহন করে নেবার জন্য দোলা নিয়ে এসেছিল।) ব্রহ্মচারী মহারাজকে হাতে পায়ে ধরে তার সাথে যাবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করে ও বলে—"চলুন মহারাজ, নইলে আমার প্রাণ বাঁচে না, আমাকে রাতে ঘুমুতে দেয়নি। তারপর সেই ব্রহ্মচারী মহারাজকে মহন্তের আখড়ায় লয়ে গিয়ে কিছুদিন প্রাণ দিয়ে তাঁর সেবা করতে লাগলো এবং মহারাজও ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠলেন। মহারাজ

বলেছিলেন, সেই ব্রহ্মচারীর নাম তিনকড়ি এবং সে বাঙালি ছিল। তারপর শরীর যখন সেরে গেল তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। তিনকড়ির বড় ইচ্ছা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকে ও তাঁর সেবা করে। তিনি বলেন—"সে হবে না—তুমি সরে পড়।" কাজেই তিনকড়ি সরে পড়তে বাধ্য হলো। আমরা জিজ্ঞাসা করেছিলাম—"মহারাজ, আর কখনো তিনকড়িকে দেখেছিলেন?" বলেছিলেন—"আর কখনো তাকে দেখিনি।"

১৮। একসময়ে খোকা মহারাজ ও পূজ্যপাদ রাখাল মহারাজ বৃন্দাবনে আছেন। একদিন রাত্রে রাখাল মহারাজ বললেন, "খোকা, বলরামদা এসেছেন, যেতে বলছেন।" তখন খোকা মহারাজ সাদা চোখে বলরামবাবুকে দেখলেন। বলরামবাবু কিন্তু এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্বেই কলকাতায় শরীর ত্যাগ করেছেন। বলরামবাবু তাঁদের উভয়কেই বলছেন, "তুমি ও রাখাল আসবে বলে রথ প্রস্তুত, এসো।" তাহাতে খোকা মহারাজ বললেন, "এখন আমিও যাব না, মহারাজও যাবেন না।" তখন বলরামবাবু অন্তর্ধান হয়ে গেলেন।

১৯। খোকা মহারাজ আমাদের কাছে 'মায়া' সম্বন্ধে আলোচনাকালে দুটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন।

একজন ভক্তের সহিত তাঁর মায়া সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল। খোকা মহারাজ ভক্তটিকে বোঝাতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু তার বেশ হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না। রাত্রে যখন সেই ভক্তটি অন্ধকারে ঘুমাচ্ছেন, খোকা মহারাজ তার গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিলেন। তিনি ভয় পেয়ে "কে, কে?" বলে চিৎকার করে উঠলেন। যখন মহারাজ বললেন —"আমি", তখনই ভক্তটির ভয় দূর হয়ে গেল। খোকা মহারাজ বললেন—"এই মায়া। যতক্ষণ জানোনি আমি কে, ভূত বা চোর মনে করে ভয়ে চিৎকার করছিলে; যাই জানলে, অমনি ভয় দূর হয়ে গেল। সেইরূপ যতক্ষণ না জানা যায় (জ্ঞান হয়) ততক্ষণই মায়া, জানলে আর কিছুই নয়।"

একদিন বেলুড় মঠে বাহিরের একটি সাধু এসেছেন। অনেকে বসে তাঁর সঙ্গে (মায়া সম্বন্ধে) আলোচনা করছেন। সাধুটি বলছেন, "এ জগৎ কিছু নয়"

ইত্যাদি। খোকা মহারাজ তখন স্নান করতে যাচ্ছিলেন—আলোচনা-স্থানে উপস্থিত হয়ে [তাদের আলোচনা শুনে] বললেন, "জগৎ কিছু নয়, তা হলে ন্যাংটো হয়ে গঙ্গায় ডুব দিয়ে আসুন। দেখি!" সাধুটি বললেন—"তা পারি না মহারাজ।" তখন খোকা মহারাজ বললেন, "এই দেখুন।" বলে সঙ্গে সঙ্গে অত লোকের সম্মুখে কাপড় গামছা খুলে ফেলে দিয়ে হাসতে হাসতে গঙ্গায় গিয়ে ডুব দিয়ে এসে, গা মুছে, আবার কাপড় পরে হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

২০। বেলুড় মঠে 'ভিজির্টাস রুমে' সন্ধ্যার পর কালীকীর্তন হচ্ছে মহাপুরুষ মহারাজ ও খোকা মহারাজ গঙ্গার দিকে ওপরের বারান্দায় বসে তন্ময় হয়ে কীর্তনানন্দ উপভোগ করছেন। কতক্ষণ এইরূপ চলেছে। একসময়ে মহাপুরুষ মহারাজ গঙ্গার ঘাটের উঁচু পোস্তার দিকে খোকা মহারাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন—"খোকা দেখছো?" ইনি "হাঁ মহারাজ" বলে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—একটি পরমা সুন্দরী আট-নয় বছরের বালিকা স্থির হয়ে গঙ্গার ঘাটে বসে আছে। মহারাজগণ পূর্ব্ববৎ কীর্তনানন্দ উপভোগ করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে কীর্তন যখন মন্দীভূত হয়ে আসছে, এমন সময় বালিকাটি ঝুপ করে গঙ্গার জলে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মহারাজ আমাদের বলেছিলেন, মা গঙ্গাই সে দিন বালিকা বেশে এসে কীর্তনানন্দ উপভোগ করছিলেন। আর এক দিন বেলুড় মঠের সেই বারান্দায় বসেই খোকা মহারাজ দেখেন—মা গঙ্গা সুন্দরী ষোড়শী মূর্তিতে এলো চুলে ঢেউয়ের সহিত উঠছেন, আবার ডুবে যাচ্ছেন।

২১। পূর্ব্ববঙ্গে একজন ভক্ত খোকা মহারাজকে তার বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেন। ভক্ত পরিবারে স্ত্রীলোকদের বড় ইচ্ছা যে মহারাজকে নানাবিধ ব্যঞ্জনাদি করে খাওয়ান। মহারাজের শরীর তত ভাল ছিল না, আর তিনি বরাবরই নিয়মিত সময়ের মধ্যে খেতে ভালবাসতেন। বেলা প্রায় এগারটার সময় তিনি ভক্তগৃহে এসেছেন।

তিনি বললেন, "আর দেরি কত?" ভক্তটি বললেন—"আর দেরি নেই।" গৃহস্বামী মধ্যে মধ্যে অন্দরে যাতায়াত করে রান্না কতদূর হয়েছে দেখে আসেন।

এমনি করে বেলা একটা বেজে গেল। ভক্ত বললেন, "আসুন মহারাজ জায়গা হয়েছে।" মহারাজ গিয়ে দেখেন নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও পায়সাদি খাদ্য দ্রব্য থালার চারিদিকে পনের কুড়িটি বাটিতে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। মহারাজ কিন্তু আসনে বসে গম্ভীরভাবে কেবল মাত্র ঝোল ভাত খেয়ে উঠে গেলেন। কেউ একটি কথা বলতে সাহস পেল না। আর ভক্তপরিবারের চিরদিনের মতো শিক্ষা হয়ে গেল যে সাধুর খাওয়া রসনা তৃপ্তির জন্য নয়, খাদ্যের বাহুল্য অপেক্ষা নিয়মিত সময়ে পরিমিত আহারই কর্তব্য।

২২। শ্রীম বা পূজনীয় মাস্টার মহাশয় যখন "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত" লিখিতে আরম্ভ করেন, তখন খোকা মহারাজ তাঁকে বলেছিলেন, "মাস্টার মহাশয়, আমার কথা বইয়েতে বিশেষ কিছু লিখবেন না।" মহারাজ আমাদিগকে বলেন, "এইজন্যে কথামৃতে আমার নামের বিশেষ উল্লেখ তোমরা পাবে না।"

(১৮)

সকলেই মনে করে খোকা মহারাজ তাকেই সর্বাধিক স্নেহ করেন

সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

যখনই খোকা মহারাজের কাছে গিয়েছি মনে হয়েছে যেন একেবারে পবিত্র হয়ে গেলাম। বিন্দুমাত্র দোষ স্পর্শ যে আমাদের ভিতর থাকতে পারে তাহা একেবারেই ভুলে যেতাম। আর সর্বক্ষণ একটা অকারণ পুলক অন্তর মধ্যে দোলা দিত কি যেন একটা হবে এমনি এক অনির্দেশ্যভাবে যেন উন্মুখ হয়ে থাকতাম।

আর কী সে ভালবাসা! তখন বয়স ছিল কম, কিন্তু খাওয়াটা খুব বুঝতাম। তিনিও গেলেই আমাদের খাইয়ে যেন তাঁর সাধ মিটতো না। আর কথাবার্তায় সে কী হাস্যালাপের ঘটা। নিজে হেসে আমাদের হাসিয়ে তাঁর কি অদ্ভুত আনন্দ!

এখন সেই কথাই বারবার মনে হয়। তাঁর পদতলে বসে, তাঁর সঙ্গে হাস্যালাপ করে তাঁর একটু সেবা করে যেন পরম পুরুষার্থ লাভ হতো।

তখন বুঝতে পারিনি, কিন্তু এখন সংসারের ভিতরটার দিকে যতই দেখছি, ততই সংসারের কোলাহলময় অন্তঃসারশূন্যতার পরিচয় পাচ্ছি, ততই যেন মনের আকাঙ্ক্ষা তাঁর সেই ঘরটিতে গিয়ে বসি। থেকে থেকে মনে হয় এসব আর ভাল লাগে না, এ জট ছাড়াও, এ বিদ্যাবুদ্ধি ফিরিয়ে লও, এ প্রচলিত আমোদ আহ্লাদে স্ফূর্তি থামাও। আবার বালককালে ফিরে গিয়ে সেইখানে গিয়ে বসি, তাঁর কথা শুনি। এই আমার মনের অন্তরতম কামনা।

তাঁর ভক্ত শিষ্য অনুগত পরিচিত যাকেই জিজ্ঞেস করা যাক, সকলেই মনে করে খোকা মহারাজ তাকেই সর্বাধিক স্নেহ করেন।

আর একটি অদ্ভুত ব্যাপার—তাঁর কাছে এই বলবো, সেই বলবো হেন প্রশ্ন করবো, তেন তর্ক করবো ইত্যাদি ভাব নিয়ে গেলে কি হবে তাঁর কাছে গেলেই সব ভুলে যেতে হতো, না হয় তাঁর কথাবার্তাতেই মনোগত সকল প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যেত। প্রশ্ন আর উত্থাপনই করতে হতো না।

তিনি যে দীক্ষাদি দিতেন, ঠিক গতানুগতিক ভাবে দিতেন না, সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান আড়ম্বর বর্জিত। ওপর থেকে প্রত্যক্ষ নির্দেশ বা প্রেরণা না পেলে কাকেও তিনি দীক্ষা দিতেন না। আবার ঐরূপ প্রেরণা পেলে সমীপাগত ভক্ত দীক্ষার্থী না হলেও নিজে আগ্রহ করে তাকে দীক্ষা দিতেন। তাঁর ঐ ভাবকে যদি 'গুরুভাব' বলে নির্দেশ করা যায়, তাহলে গুরুভাবের বিকাশ তাঁর মধ্যে সকল সময়ে হতো না। যখন হতো তখন তাঁর স্বাভাবিক স্বরূপের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হতো। কী সে ভাবগম্ভীর মূর্তি তখন—প্রেমঘন উজ্জ্বল বদন, অহেতুক করুণায় স্থান কাল পাত্র ভুলে, পাপী পুণ্যবান নির্বিশেষে, ভক্ত-অভক্ত, পরিচিত অপরিচিত যে হউক তাকে অভয় দান ও কৃপা বিতরণ করতেন।

ইংরেজি ১৯২৫ সাল, ঢাকা জেলার কোন এক বর্ধিষ্ণু গ্রামে [বালিয়াটি] তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে যান। সেখানে আমার মতো এক অপরিচিত বালককে কি প্রকারে অযাচিত কৃপা করেন, বলছি ঃ

সেবার যখন শুনলাম যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য আমাদের গ্রামে আসছেন তখন গ্রামে উৎসাহ ও ঔৎসুক্যের অন্ত ছিল না। তাঁর সম্বন্ধে বহু টুকরো টুকরো ঘটনা ও গল্প গ্রামময় ছড়িয়ে গেল। তাঁর নাম নাকি 'খোকা মহারাজ'। আমরা সেই বুড়ো খোকাকে দেখবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম।

তখন আমি স্কুলে প্রথম শ্রেণিতে পড়ি, প্রবেশিকা পরীক্ষা দিব। বৈকালে একদিন আশ্রমে গিয়ে দেখি সেখানে খুব সমারোহ, সেবকগণ ছুটোছুটি করছেন, দর্শনার্থীর ভিড়। যে ঘরে বেশি ভিড় সে ঘরে ঢুকতে পেলাম না। উঁকি দিয়ে দেখলাম, একঘর লোক বসে রয়েছেন। একধারে একটি তক্তপোশের ওপর বেশ ভাল বিছানা পাতা। তার ওপর একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বসে আছেন। দুজন সেবক দুদিক থেকে দুটি বড় বড় পাখা চালাচ্ছেন।

সন্ন্যাসী মহারাজের বেশ হাস্যোজ্জ্বল মুখ, মোটেই গম্ভীর নয়। চেহারার মধ্যে সারল্য ও খোলাখুলি ভাব এমন একটু মাখানো রয়েছে—যেন ইচ্ছা করলেই বন্ধুর মতো গলা ধরে পাশে বসে পড়া যায়। গায়ে জামা, তার ওপর শ্রীরামকৃষ্ণের ছবির ধরনে একখানা গেরুয়া চাদর কাঁধের ওপর ফেলা। মুখ অনেকটা চতুষ্কোণ, চোয়াল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যঞ্জক অথচ কোন অনির্দিষ্ট কারণে সারা মুখে একটা কোমল তৃপ্তির ভাব ছড়ানো। চক্ষু দুটি মনে হয় শ্রমকাতর কিন্তু একটু হাসিলেই অস্বাভাবিক উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। লোকের ভিড় ঠেলে সেদিন দেখা করা সম্ভব হলো না।

একটু মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে বাড়ি ফিরলাম। তারপর দিন সকালে পয়সা নিয়ে চলেছিলাম বাজারের দিকে মিষ্টি কিনতে। দু-একটি ভাই বোন সাথে ছিল। একটু বাঁকা পথ দিয়ে চলেছিলাম যাতে আশ্রমটি পথে পড়ে। ইচ্ছা—আশ্রমে গিয়ে সেই সন্ন্যাসী মহারাজকে একবার দেখে প্রণাম করে যাব। গিয়ে দেখলাম তিনি সেই ঘরে একাকী বসে আছেন। আমরা জানালা দিয়ে উঁকি দিয়ে দেখতেই তিনি ডাকলেন—আয়। সেই আহ্বানে সাহস পেয়ে আমি তাঁকে প্রণাম করলাম। নিজে প্রণাম করে ছোট ভাই বোনদের ডেকে এনে প্রণাম করালাম।

তিনি আমাকে দুই একটি কথা কি বললেন মনে পড়ে না। সম্ভবত পরিচয় ও কি পড়ি জিজ্ঞেস করে থাকবেন। এর পর আমি চলে আসবো ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ তক্তপোশের ওপর থেকে নেমে এসে সস্নেহে আমার কাঁধে হাত রেখে কানের নিকট মুখ এনে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, "দীক্ষা নিবি?" আমি তখন প্রথম শ্রেণিতে পড়ি, ধর্ম পুস্তক কিছু কিছু নিশ্চয়ই পড়েছিলাম, বয়স পনেরো ষোল। সুতরাং "দীক্ষা নিবি" প্রশ্নের অর্থ বুঝিতে পারি নাই এমন নয়। কিন্তু বুঝতে পারলেও প্রশ্নটি অপ্রত্যাশিত বলে একটু হতভম্ব হয়েছিলাম।

আমি সম্মুখের দিকে মাথা নুইয়ে বললাম, "আচ্ছা।" আমরা উভয়েই দাঁড়িয়ে। তিনি আরও কাছে এসে কানে মৃদুস্বরে মন্ত্র বললেন ও আমার বোঝবার জন্য দুই তিনবার আস্তে আস্তে উচ্চারণ করলেন। যখন দেখলেন আমি বুঝতে পেরেছি তখন বললেন—"আজ পূর্ণিমা। বেশ ভাল তিথি, ভালই হলো।" এই বলে কমণ্ডলু থেকে গঙ্গাজল নিয়ে নিজেও একটু পান করলেন, আমার মুখেও কিছু ঢেলে দিলেন। তারপর সহাস্যে বললেন—"দীক্ষা নিলি, দক্ষিণা দিবি না?" আমি একটু অপ্রস্তুত হলাম। হঠাৎ আমার মনে পড়লো যে আমার পকেটে পয়সা আছে, তাই দিতে গেলাম। তিনি আবার হেসে বললেন—"থাক থাক তোর দিতে হবে না, রেখে দে।" আমি পুনরায় তাঁকে প্রণাম করলাম—তিনি মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন ও বলে দিলেন যেন খাওয়া-দাওয়ার পর আবার আসি।

বেলা দুটো তিনটার সময় আবার গেলাম। তিনি সেই পূর্ব পরিচিত ঘরে শুয়েছিলেন। শব্দ পেয়ে চোখ চেয়ে আমায় দেখতে পেয়ে সস্নেহে বললেন, "আয়।" আমি গিয়ে প্রণাম করলাম ও তিনি সেইরূপ মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। তারপর বললেন, "একটু টিপে দে দেখিন।" আমি মেঝেয় হাঁটু গেড়ে বসবো ভাবছি, তিনি আমাকে বিছানার ওপর বসতে বললেন। আমি ইতস্তত করায় হাত ধরে বসিয়ে দিলেন। আমি তার পা টিপতে থাকলাম ও তিনি কথা বলতে লাগলেন, "দ্যাখ, আর কারু কাছে মন্ত্র নিবিনি, আমি যা

দিয়েছি সেই তোর মন্ত্র। আর কারুকে গুরু করবিনি, আমিই তোর গুরু। যে মন্ত্র দিয়েছি তাই সকাল সন্ধ্যায় একটু একটু জপ করবি। আর দ্যাখ, এই মন্ত্র কারু কাছে বলবিনি, বললে কিন্তু ফল হবে না।"

এই ঘটনায় তাঁর গুরুভাবের তিনটি পরিচয় পাই ঃ প্রথম—ওপর থেকে দীক্ষা বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে পরিচালিত করতেন। দ্বিতীয়, কোন বিশেষ ভাবে কাকে দীক্ষা দিতে হবে তাহাও ঠাকুরই তাঁকে জানিয়ে দিতেন। তৃতীয়, ঠাকুরের নির্দেশ একবার জানতে পারলে তিনি স্থান কালের বিচার করতেন না।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে পূর্বোক্ত বালক তাঁর সম্পূর্ণ অপরিচিত। সামান্য দু-একটি কথায় যা পরিচয় পেয়েছিলেন সে কিছুই নয়। হয়তো ছেলেটি হিন্দু এইটুকু মাত্র তিনি জেনেছিলেন। শুধু এইটুকু পরিচয়ে একজনকে হঠাৎ যেচে দীক্ষা দেওয়ার মধ্যে আমরা পূর্বোক্ত ওপরের পরিচালনা শক্তির সন্ধান পাই। হয়তো তাঁর মধ্যে তখন গুরুভাবের এমন একটা তোড় এসেছিল যে তিনি রোধ করতে পারেননি, যেমন আমরা দেখতে পাই শিশুকে মায়ের স্তন্যদান বাসনার প্রাবল্য।

এই গ্রামেই ইহার পরের বৎসর তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের বিগ্রহ মূর্তি স্থাপনা করিতে আসেন। সে সময়ে বিগ্রহ স্থাপনার দিনই একটি একাদশ বর্ষীয়া বালিকাকে অযাচিত কৃপা করেন। সে ক্ষেত্রেও 'আমি তোর গুরু, আর কারু কাছে দীক্ষা নিবিনি' ইত্যাদি সাবধান বাণী উচ্চারণ করেন।

(১৯)

অনেক দিনের পুরনো স্মৃতি জাগিয়ে দিলি, মা

যোগেন্দ্র কিশোর রক্ষিত রায়

খোকা মহারাজ একদিন তাঁতি বাজার [ঢাকা] শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র ঘোষ, বি. এল, উকিল মহাশয়ের বাসায় বেড়াতে আসেন। যোগেশবাবুর বাসা

আমাদের বাসার ঠিক বিপরীত দিকে রাস্তার পূর্ব ধারে। মেয়েরা আমাদের দোতলার ঘর থেকে দেখছিল। এমন সরলতাপূর্ণ সাধুর দিকে তাহারা মুগ্ধ নয়নে চেয়েছিল দেখে, তিনিও তাদের দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, "যাচ্ছি"। মেয়েরা তো শুনে অবাক। এত সহজে এমন মহাপুরুষের দয়া কি করে হলো? অথচ পূর্ব থেকে পরস্পরের সঙ্গে কোন পরিচয় নেই! খানিক পরে সেই সৌম্যদর্শন সন্ন্যাসী মহারাজ আমাদের বাসায় এসে আমার মেয়েদের দুজনের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে দিলেন। অত্যন্ত মধুরভাষী। প্রায় ঘণ্টাখানেক মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করেন। এই আমাদের বাসায় তাঁর প্রথম পদার্পণ।

এইবারেই ঢাকা থাকাকালীন আর একদিন তিনি আমাদের বাসায় নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন এবং আহারান্তে আমার মেজো মেয়ে প্রতিভা ও ছোট মেয়ে ঊর্মিলাকে বললেন, "মা, তোরা মন্ত্র নিবি? নিস যদি, তবে তোদের মায়ের অনুমতি নিয়ে আয়।" আমি তখন ইডেন কলেজে সঙ্গীত শেখাতে গিয়েছিলাম। মেয়েরা ছুটে গিয়ে তাদের মাকে সব বললে। তিনি ওদের বললেন, "স্বামীজী নিজে যেচে তোদের মন্ত্র দিতে চান, এ যে তোদের পরম সৌভাগ্য। এতে আবার আমার অনুমতি কিরে?" তিনি তখন নিচের ঘরে স্বামীজীর জন্য বৈকালিক জল-খাবার তৈরি করছিলেন। তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে স্বামীজীর কাছে এসে বললেন—"বাবা, আপনি অনুগ্রহ করে ওদের মন্ত্র দেবেন, এ যে আমার পরম সৌভাগ্য। লোকে কত সাধ্য-সাধনা করে এমন মহাপুরুষের অনুগ্রহ পায় না, আর আপনি কিনা যেচে ওদের মন্ত্র দিতে চাচ্ছেন, এর জন্য আমার অনুমতি চেয়েছেন কেন?" উত্তরে তিনি বললেন, "না না, সে কি হয়? মা হচ্ছেন সকলের ওপরের গুরু। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কোন ধর্মকর্মই হয় না।"

তিনি খানিকক্ষণ হেসে হেসে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সরলতাপূর্ণ মধুর কণ্ঠে, ছোট ছোট কথায় শ্রীশ্রীপরমহংসদেবের বিষয়ে গল্প করার পর ওদের যথারীতি মন্ত্র দিলেন।

আর একবার তিনি পূজনীয় তুলসী মহারাজ [স্বামী নির্মলানন্দ] এবং নীরদ মহারাজ [স্বামী অম্বিকানন্দ] কে নিয়ে আমাদের বাসায় পদার্পণ করেছিলেন। সেবার আহারান্তে সকলে আমার কনিষ্ঠা কন্যা ঊর্মিলার কণ্ঠসঙ্গীত এস্রাজ ও সেতার শুনলেন এবং আনন্দিত হয়ে খুবই উৎসাহ দিলেন। নীরদ মহারাজ মুগ্ধ হয়ে মেয়েকে বলেছিলেন, "তোর নাম বীণাপানিই থাক, ঐ নামেই তোকে মানায় ভাল।" ওর হাতের আঁকা শ্রীশ্রীমা ঠাকুরানীর একখানা তৈলচিত্রেরও কোন কোন জায়গা নীরদ মহারাজ সংশোধন করে দিয়েছিলেন। তাঁর নিজের হাতের আঁকা কয়েকখানি চারকোল স্কেচ তিনি ওকে উপহার দিয়েছিলেন।

গুরুদেব তৃতীয়বার যখন ঢাকায় আসেন সেই সময়ে আমাদের প্রতিও তাঁর বিশেষ অনুগ্রহ হয়েছিল। তাই সস্ত্রীক আমাকে এবং আমার বড় মেয়ে প্রফুল্লবালাকে মন্ত্র দিয়ে তাঁর শিষ্য শ্রেণিভুক্ত করে নিয়েছিলেন। সেবার তাঁর আহারান্তে তাঁকে একটি সোড়াওয়াটার দেবার সময় বোতল ভেঙে আমার হাতের খানিকটা কেটে যায়। শব্দ শুনে তিনি অন্য ঘর হতে তাড়াতাড়ি এসে বললেন—"ভয় নেই, একটা মস্ত বিপদ কেটে গেল।" আমি স্বামীজীর পায়ের ধুলো নিয়ে কলেজে চলে গেলাম।

বিকেলে এসে শুনলাম যে ঊর্মিলার অনেক গান তিনি ফরমাস করে করে শুনেছেন। সবশেষে মেয়ে নিজ ইচ্ছামতো নিম্নলিখিত কীর্তনটি গেয়েছিল ঃ

হরি গেও মধুপুর, হাম কুলবালা।
বিপথে পড়ল যৈসে মালতীমালা ॥
কি কহসি কি পুছসি শুন প্রিয় স্বজনি।
কৈসনে বঞ্চব ইহ দিন রজনী ॥
নয়ন কো নিন্দ গেয়ো বয়ানকো হাস।
সুখ গেও পিয়া সঙ্গ দুখ হাম পাশ ॥
ভনয়ে বিদ্যাপতি শুন বর নারী।
সুজনক কুদিন দিবস দুই চারি ॥

গান শুনতে শুনতে স্বামীজী যেন ধ্যানস্থ হয়ে গেলেন। তাঁর দু-নয়নে ধারা

বইতে লাগলো। গান সাঙ্গ হলে বললেন, "তুই আজ অনেক দিনের পুরানো স্মৃতি জাগিয়ে দিলি মা। শোন তবে বলি, ঠাকুর যখন চলে গেলেন আমাদের ছেড়ে, স্বামী বিবেকানন্দ তখন এই গানটি গেয়েছিলেন।"

এই শেষ দেখা। আমার ভাগ্যে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন আর হয় নি। আমার বড় মেয়ে ও তার মা ১৩৩৮ সনের ফাল্গুন মাসে বেলুড় মঠে তাঁর শ্রীচরণ দর্শন করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি তখন শয্যাগত। এত অসুস্থতার মধ্যেও সেই করুণাময় স্বামী হাসি মুখে এদের আশীর্বাদ করেছিলেন।

(২০)
দুঃখে থাকলে মনের বল বেশি হয়

শ্রীমতী—

খোকা মহারাজ যেন খোকাই ছিলেন, শিশুর ন্যায় অবস্থা। আমাদের সঙ্গে কত মিশেছেন; বড় দয়া, কত স্নেহ করেছেন। প্রথম রাঁচিতে দেখা হয়। অনেক কথা মনে পড়ে। লিখবার শক্তি কোথায়?

প্রায় দশ বৎসর পূর্বে, ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে মে মাসের শেষ থেকে আরম্ভ করে জুলাই মাসের অর্ধেক পর্যন্ত অসুখের দরুন বেলগাছিয়া হাসপাতালে ছিলাম। প্রথম যেদিন যাই, মহারাজ আমাকে দেখতে আসেন। আমি তাঁকে দেখে কাঁদতে থাকি ও বলি—"মহারাজ এখানে কি করে খাব? সর্বদা আমার মন কেমন করে, রাতে ঘুম হয় না, ভয় হয়।" তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেন, "মায়ী, কোন ভয় করো না, ঠাকুর ও মা তোমাদের সঙ্গে আছেন, তুমি ভাল হবে। তুমি এক কাজ করবে, যা খাবে ঠাকুর ও মাকে নিবেদন করে খাবে। তাহলে দেখবে কোন দ্বিধা আসবে না। রাত্রে যখন শোবে মনে মনে মাকে বলবে, 'মা আমার কাছে এসে আমার সঙ্গে শোও।' দুঃখে থাকলে মনের বল বেশি হয়।" তখন তাঁর উপদেশ যেন আমার একমাত্র সম্বল হলো।

তাঁর উপদেশ মতো কাজ করে মনে বেশ সাহস পেলাম। মহারাজ আমায় দেখতে গঙ্গা পার হয়ে, রোদে হেঁটে হাসপাতালে আসতেন। তাঁর দর্শন লাভে ও আশ্বাসবাণীতে মনের অশান্তি কতকটা দূর হতো।

অপারেশানের পর দিন হঠাৎ চেয়ে দেখি মহারাজ সম্মুখে উপস্থিত। আমার হাত পা বাঁধা তবু আমি পাশ ফিরতে চেষ্টা করি। তিনি প্রসাদ এনেছিলেন, আমার মুখে দিলেন। চেয়ে দেখি তাঁর চক্ষে জল পড়ছে। তিনি বললেন—"মায়ী, রোজ তোমার জন্য ঠাকুরকে বলি। এবার তুমি ভাল হবে। তোমার অবস্থা দেখে আমার চোখেও জল আসে। তুমি কাঁদলে আর আসবো না। চেয়ে দেখ কত লোক রয়েছে।"

হাসপাতাল থেকে এসে ঘুঘুডাঙার বাসাতে ছিলাম। হঠাৎ মহারাজ একদিন আমাদের বাসায় উপস্থিত। তিনি অন্যান্য মহারাজদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরছিলেন, দমদম স্টেশনে এসে তিনি নেমে পড়লেন। আমাদের বাসা পোস্ট-অফিসের কাছে, এইমাত্র পূর্বে তাকে বলেছিলাম। তিনি বললেন, "হাসপাতাল থেকে এসে তোমার শরীর কেমন আছে জানবার জন্য মন ব্যাকুল হলো, তাই নেমে পড়লাম। পোস্ট অফিসের কাছে এসে, এখানে হাসপাতাল থেকে কেউ এসেছে কিনা অনুসন্ধান করে তোমাদের বাসায় এসেছি।" বেলা প্রায় দশটা হয়েছিল। আমি মহারাজকে থাকার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন—"আগে যেমন রেঁধে খাওয়াতে, এখন তো আর পারবে না" ইত্যাদি নানাকথা বলে কলকাতায় ফিরে গেলেন।

দেশে যাবার সময় মেয়ে উমাকে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে ভর্তি করে গিয়েছিলাম। তার বয়স দশ বৎসর। খোকা মহারাজ মাঝে মাঝে নিবেদিতা বিদ্যালয়ে গিয়ে তার সাথে দেখা করতেন ও নানারূপ গল্প করতেন। উমাকে মহারাজ খুবই ভালবাসতেন।

উমার অসুখের সময় আবার যখন কলকাতা যাই, বেলুড় মঠে গিয়ে মহারাজের সহিত দেখা করবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু তিনি মঠে আছেন কিনা জানতাম না, তাই যাওয়া হলো না।

উমার দুদিনের খেলা ওখানেই সাঙ্গ হয়। খোকা মহারাজ পরে বলেছিলেন—“উমার অসুখের সংবাদ জানতে পেলে আমি নিশ্চয়ই দেখা করতুম। আমার নামে বেলুড় মঠে চিঠি দিলেই আমি যেখানে থাকতুম পাঠিয়ে দিত।”

শেষ যেবার তিনি পাটনা আসেন তখন শোকাকুল প্রাণ নিয়ে অন্য কোথাও যেতাম না, রোজ মহারাজের কাছে দুপুরে যেতাম, এই কাজ ছিল। তিনি শীতকালে পাটনা এসেছিলেন, আমাদের বাসার নিকটেই—বাবুর বাসায় থাকতেন। সকালে ও বিকালে যখন বেড়াতে যেতেন, সময় সময় আমাদের বাসায় আসতেন। দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর তাঁর কাছে যেতাম। তাঁর কাছে গিয়ে শান্তি পেতাম। তিনি সময় সময় আমার মাথায় জপ করে দিতেন। উহাতে বুকের বেদনা অনেকটা উপশম হতো। তিনি আমাদের খুবই স্নেহ করতেন।

তাঁর কাছে আমাদের লজ্জা সঙ্কোচ কিছুই ছিল না। তাঁকে দেখে একটি বালক বলেই বোধ হতো।

তাঁর অসুখের সময় বাবু দেশ থেকে ফিরবার পথে তাঁর সঙ্গে বেলুড়ে দেখা করেছিলেন। মহারাজ আমসত্ত্ব থাকলে পাঠাতে বলেছিলেন। আমার নিকট সামান্যই ছিল এবং —কের নিকট হতে কিছু নিয়ে পাঠিয়েছিলাম। তিনি পেয়ে খুব আনন্দ প্রকাশ করে সকলকে পৃথক পৃথক চিঠি দেন।

(২১)

বিলনীয়ায়

—কানন

স্বামী সুবোধানন্দজী বাংলা ১৩৩১ সালে ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের কয়েক দিন পূর্বে বিলনীয়া শহরে পদার্পণ করেন। মোট দশ

বারো দিন ছিলেন। বিলনীয়ার হেডমাস্টার কুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ছোট ভাই কেশবলালকে পাঠিয়ে ঢাকা হতে শ্রীশ্রীগুরুদেবকে আনানো হয়েছিল।

সুবোধানন্দজী বিলনীয়ায় কয়েকজন স্ত্রী পুরুষ ভক্তকে দীক্ষা দেন। তন্মধ্যে হেমদাস গুপ্ত সস্ত্রীক দীক্ষা নেন। শ্রীযুক্ত লালমোহনবাবু (কনট্রাকটর) সস্ত্রীক শিবরাত্রির দিন দীক্ষা নেন। তিনি সেদিন হেডমাস্টারবাবুর বাসায় কয়েকজন ভক্তকে ও দরিদ্র নারায়ণকে খাওয়াইয়া ছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুদেব নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়ানো দেখেছিলেন। রান্না করেছিলেন হেডমাস্টার মহাশয়ের স্ত্রী।

যেদিন অভিনন্দন দেওয়া হয়, ছোট হাকিমের স্ত্রী অভিনন্দন পাঠ করেছিলেন।

আমি একটা কানে ভার শুনি, সেজন্য দুঃখ করতে শ্রীশ্রীগুরুদেব বললেন—"দুঃখ কর কেন, ভালই হয়েছে, কেউ তোমাকে বকলে বা নিন্দা করলে তুমি তা শুনতে পাবে না—তোমার দুঃখও হবে না।"

শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় আমার এখন আর কোন দুঃখ নেই। এখন এই আশীর্বাদ করুন যেন সর্বদা শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম করতে পারি ও তাঁর শ্রীচরণে যেন অচলা ভক্তি হয়।

(২২)

হাঁ, ওঁর জন্যই এত ত্যাগ তপস্যা

হরেন্দ্র কুমার নাগ

যখনই খোকা মহারাজের দর্শন মিলত, স্ফূর্তি হাসি তামাশা ও রগড়ে সময় কেটে যেত। তাঁর কথা কতটুকুই বা স্মৃতিতে আছে। যতটুকু স্মৃতিতে আছে নিম্নে দেওয়া গেল।

১। একদিন কথাচ্ছলে এক রগড়ের গল্প আমাকে বলেছিলেন। স্বামী অদ্ভুতানন্দ (পূজনীয় লাটু মহারাজ) কোন সময় তাঁকে বলেন, "খোকা, তুই আমার সঙ্গে যাবি?" তিনি বলেন, "তোর সঙ্গে আমি কোথায় যাব?" লাটু মহারাজ পশ্চিমের কোন তীর্থস্থানের নাম করেন।

খোকা মহারাজ বলেন, "তোর সঙ্গে গেলে তোকে যদি রাস্তায় বিক্রি করে দি?"

লাটু মহারাজ বলেন, "সে কি? তুই কত টাকায় আমাকে বিক্রি করবি?"

খোকা মহারাজ বলেন, "তোকে আর কত টাকায় বিক্রি করবো। এই রাস্তার খরচটা হলেই হলো।"

লাটু মহারাজ, "ওহ বাবা, তবে তোকে সঙ্গে নেব না।"

২। একদিন তিনি আমাদের নিমতলা স্ট্রিটের বাসায় আসেন। প্রায় দুই ঘণ্টা ছিলেন। সে সময়ে আমি তাঁকে বলেছিলাম, "মহারাজ বেশ আনন্দে আছেন। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হাঁ, ও জন্যই তো এত ত্যাগ তপস্যা।"

৩। কোন সময়ে তিনি এক ভদ্রলোকের বাড়ি নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। আহারের সময় থালায় ভাত ও বাটিতে শুক্তো ডাল দেওয়া হতেই গৃহস্বামী অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে বলেন—"মহারাজ, আর তো কিছু নেই, এই মাত্র আয়োজন।" শুনে তিনি ছোট শিশুটির মতো সরল বিশ্বাসে শুক্তো ডাল দিয়েই আহার সমাপন করলেন। পরে ভাল তরকারি ও মিষ্টান্নাদি এলে তিনি বললেন—"আমার খাওয়া শেষ হয়েছে—এসব এখন তোমরা খাও।"

৪। একসময়ে তিনি আমাদের বেড়ার বাড়িতে আছেন। সে সময়ে হরিশের মাতাকে দেখা মাত্র প্রাণজুড়নো মধুর স্বরে বললেন—"এসো মা, এসো।" হরিশের মাতা বললেন—"মহারাজ, রান্না-বান্না নিয়ে থাকি আপনার একটু সেবাও তো করতে পারি না।" উত্তরে তিনি বললেন—"সে কি বলছো, এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ সেবা—তোমরা শক্তিরূপা, শক্তির অংশ।"

৫। চাঁদপুরবাসীদের মহাসৌভাগ্য বিলনীয়া থেকে নোয়াখালি ফিরবার

পথে খোকা মহারাজ চাঁদপুর ভাড়াটে বাড়ির শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রমে পদার্পণ করেন। তখন সেই আশ্রমে ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য থাকতেন। তথায় খোকা মহারাজ দশ জন ভক্তকে কৃপা করেন। তিনি উক্ত আশ্রমে থাকাকালীন একদিন বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হয়ে তাঁকে প্রশ্নাদি করেন।

প্রশ্ন ঃ "আচ্ছা মহারাজ, কি করে সহজে ভগবান লাভ করা যায়?" উত্তরে তিনি বলেন—"নাম জপ দ্বারাই হবে।" (অর্থাৎ গুরুদত্ত নাম ঐকান্তিকতার সহিত জপ করলেই সহজে ভগবান লাভ হয়।)

ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে কেউ বললেন, "কেন, ধ্যানের দ্বারা ভগবান লাভ হয় না?"

তিনি বলেন—"হবে না কেন গো? তাও হয়। তবে গুরুমুখে উপদেশ পেয়ে যাতে সহজে ভগবান লাভ হয়, তাই বললাম।"

(২৩)

খোকা মহারাজ গল্প বলেন

শ্রীমতী প্রিয়বালা দেবী

১। এক মনে ডাকা কি রকম

একসময়ে পাঞ্জাব দেশে এক নবাব এক হিন্দু সাধুকে দেখে বলেছিলেন, "আপনি হিন্দু কি মুসলমান?" সাধু বললেন, "যাই বল, আমি তাই। আমি কোন সম্প্রদায়ের ভিতরে নেই। যখন যে, যে ভাবে নেয়, আমি সেই ভাবেই থাকি।"

নবাব বললেন, "আপনি মসজিদে গিয়ে ভগবানকে ডাকতে পারেন কি না?"

সাধু বললেন—"আমার কোন আপত্তি নেই।"

নবাব বললেন—"তবে চলুন মসজিদে গিয়ে ভগবানকে একত্রে ডাকবো ও প্রার্থনা করবো।"

তারপর সাধু নবাবের সঙ্গে মসজিদে গেলেন; নবাব তার একজন মৌলবিকে ডাকালেন ভগবানকে ডাকতে আর প্রার্থনা করার জন্য। তারপর একসঙ্গে তিন জন বসলেন—নবাব, মৌলবি ও সাধু। তিন জন প্রার্থনা করতে বসলেন। নবাব ও মৌলবী প্রার্থনা করতে লাগলেন; সাধু বসে আছেন। প্রার্থনার পর নবাব সাধুকে জিজ্ঞেস করলেন—"আপনি আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন কিনা?" সাধু বললেন, "তুমি তো ভগবানকে ডাকো নি; তুমি ভাবছিলে, কাবুল দেশে ঘোড়া পাওয়া যায়, তাই কিনবে।"

নবাব বললেন, "আচ্ছা, মৌলবি তো ভগবানকে ডেকেছিলেন, তার সঙ্গে প্রার্থনা করলেন না কেন?"

সাধু বললেন, "মৌলবি ভাবছিলেন তার বাড়িতে ঘোড়ার বাচ্চা হবে বাড়িতে কেউ নেই, ঘোড়াকে কে দেখবে, খাওয়াবে।"

নবাব ও মৌলবি সাধুকে বললেন—"আপনি ঠিক বলেছেন।"

তারা দুজনে সাধুর পদধূলি নিয়ে চলে গেলেন, সাধু বসে রইলেন।

২। ব্যাকুলতা কি রকম

খোকা মহারাজ বলেন ঃ একবার বৃন্দাবনধামে এক প্রাচীন বৈষ্ণব সাধুর সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। তাঁর নাম রামদাস কাঠিয়া। তিনি কাঠের কৌপীন পরতেন, তাই লোকে বলতো কাঠিয়া বাবা। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, "আপনার জীবনে কোন রকম আশ্চর্য ঘটনা হয়েছিল? যদি আমায় বলতে কোন আপত্তি না থাকে আমায় বলুন শুনতে ইচ্ছা হয়, কারণ আপনি প্রাচীন সাধু, অনেক রকম দেখেছেন ও শুনেছেন।"

রামদাসজী বলেন, "যখন আমার বয়স পনের ষোল বছর, ভগবান লাভ

করবো বলে মনে ভারী বৈরাগ্য-ব্যাকুলতা। বিয়ে করিনি, মা বাপও নেই, কার জন্যই বা চাকুরি কি সংসার করবো? শেষে বাড়ি থেকে বের হলাম। পায়ে হেঁটে হরিদ্বারের নিকট এলাম। তারপর হৃষীকেশ হয়ে হিমালয় পাহাড়ে উঠলাম; রাস্তা ছেড়ে জঙ্গল ধরে বনে বনে চলতে লাগলাম। তিন চার দিন কিছু খাবার জোটেনি। ক্ষুধা পিপাসায় কাতর হয়ে শুধু ভগবানকে চিন্তা করতে লাগলাম। তারপর দেখতে পেলাম—উঁচু পাহাড়ে ধোঁয়া উঠছে। দেখে মনে হলো, কোন লোক সেখানে আছে দেখতে হবে। সেই উঁচু পাহাড়ের দিকে চললুম—সেখানে গিয়ে দেখি একজন সাধু বসে আছেন। ধ্যান করছেন। সেখানে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইলুম। পরে সাধুর যখন ধ্যান ভঙ্গ হলো তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন—"কে তুমি এখানে এসেছো?" আমি বললাম—"তিন চার দিন কিছু খাইনি। আগে আমায় কিছু খাবার দিন পরে সমস্ত বলছি।" সেই সাধু বললেন—"এখানেই অনেক রকম ফল আছে, খাও, পাহাড়ের ঝরনায় জল আছে পান করো।" কিছু খেয়ে যখন শরীর সুস্থ হলো, তারপর সেই মহাত্মাকে বলতে লাগলুম—"আমি অনেক সাধু দেখেছি, কারোকে মনে লাগে না, খালি সাধুর পোশাক পরেছে মাত্র। তারা ঠিক সাধু নয় আপনাকে দেখলাম বিজন বনে বসে ভগবানের চিন্তায় মগ্ন। আপনি দয়া করে বলবেন কি, কী করে আমি ভগবানের দর্শন পাব?" সেই মহাত্মা বললেন, "তুমি ভগবানের জন্য নিজের শরীর নষ্ট করতে পার?" আমি বললুম, "এখনই পারি। জীবনে যদি ভগবানকে লাভ করতে না পারি তবে এই জীবন আমার কি দরকার? এখনই শরীর নষ্ট করবো কি করতে হবে আপনি বলুন।" মহাত্মা বললেন, "এই পাহাড়ের ওপর থেকে নিচে লাফিয়ে পড় দেখি। আগে পাহাড়ের নিচের দিকে চেয়ে দেখ, পরে লাফিয়ে পড়।" আমি কাপড় গুটালাম লাফিয়ে পড়বো বলে। এমন সময় সেই মহাত্মা আমায় দুই হাতে ধরলেন ও আমায় খুব আশীর্বাদ করলেন। তারপর সেই মহাত্মা বললেন, "নিকটেই গ্রাম আছে। এই রাস্তা দিয়ে যাও; সেখানে গেলে গ্রামের লোকেরা তোমাকে খেতে দেবে। তোমার কয়দিন কিছু খাওয়া হয়নি।" মহাত্মার কথা শুনে গ্রামে গেলুম।

গ্রামের লোকেরা বললে, "আমাদের এখানে বাড়ি। আমরা তো কোন মহাত্মা কোন সময়ে দেখিনি। চল, আমাদের দেখাবে।" অবশেষে গ্রামের লোকদের সহিত এলাম। কিন্তু সেখানে মহাত্মার আর কোন চিহ্নও দেখলাম না।"

সেই রামদাস কাঠিয়া বৃন্দাবন ধামে খোকা মহারাজের নিকট এই গল্প বলেছিলেন। এখন তিনি নেই। প্রায় বিশ বছর হবে মারা গেছেন।

৩। বাসনা-কামনাতে মানুষকে ফিরে ফিরে সংসারে আসতে হয়।

খোকা মহারাজ বলেন ঃ একজন সিদ্ধপুরুষের এক ধনী শিষ্য ছিলেন। ধনী শিষ্যের একটি ঘরে মাটির নিচে অনেক টাকা পোঁতা ছিল। সিদ্ধপুরুষ তা জানতেন। কয়েক বৎসর পরে ধনী গৃহস্থ মারা গেলেন। রহিল তার নাবালক কয়েকটি ছেলে। সেই ধনীর মৃত্যুর পর সেই সিদ্ধপুরুষ ধনীর বাড়ি এসে দেখলেন, ধনীর ছেলে কয়টি ও বিধবা স্ত্রী অর্থাভাবে খেতে-পরতে পারছে না। সেই সিদ্ধপুরুষ ছেলেদের বললেন, "তোমাদের বাবার অনেক টাকা ছিল, কেন এত কষ্ট?" বাড়ির একটি ঘর দেখিয়ে দিয়ে বললেন, "এই ঘরের মধ্যে অনেক টাকা পোঁতা আছে তোমরা বের করে নাও।" তখন তারা সেই ঘর খুঁড়ে দেখলো, ঘরের মধ্যে এক প্রকাণ্ড অজগর সাপ। সিদ্ধপুরুষ দেখে বললেন, "দরজাটা বন্ধ করে রাখ।" তখন সাধু আর একটি ঘরে গিয়ে জপ ও ধ্যান করতে লাগলেন। ধ্যানে দেখলেন তার ধনী শিষ্যই সাপ হয়ে তার টাকাকড়ি আগলে রেখেছে। সেই সিদ্ধপুরুষ ছেলেদের বললেন, "সাপটাকে মেরে ফেল। ঘরের অমুক জায়গা থেকে টাকাকড়ি বের কর।" তারা টাকাকড়ি বের করে দেখলো, অনেক টাকা। সাধু ছেলেদের বললেন, এখন তোমরা এই টাকাকড়ি নিয়ে ভোগ কর। আমি এখন চলে যাব। আবার দু-তিন বছর পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবো।

দু-তিন বছর পরে সাধু সেই ছেলেদের বাড়ি এলেন—দেখলেন ছেলেরা অনেক জায়গা জমি চাষ করছে ও বাড়ি-ঘর ভাল করছে। অনেক দিন পরে ছেলেরা সাধুকে দেখে ঘরে বসিয়ে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে পূজা করল। সাধু চিন্তা

করতে লাগলেন—আমার সেই ধনী শিষ্য এখন কোথায়? সেই ঘরে সাধু দরজা বন্ধ করে একলা ধ্যানে বসলেন এবং জানতে পারলেন, সেই ধনী শিষ্য এদের বাড়িতেই এক বলদ হয়ে রয়েছে, লাঙল টানছে—গাড়ি বইছে।

তারপর সেই সিদ্ধপুরুষ ছেলেদের বললেন, "তোমরা তোমাদের পিতার কর্ম গয়ায় গিয়ে কর। তার পিণ্ড দাও। আমি তোমাদের বাড়িতে থাকবো, যতদিন না তোমরা গয়া থেকে ফিরে আস।"

ছেলেরা সপরিবারে গয়ায় চলে গেল পিতৃকার্যের জন্য। সাধু একলা বাড়িতে রহিলেন। যেদিন পিণ্ড দেওয়া হলো, সেদিন বলদটি মরে গেল। ছেলেরা যখন ফিরে এল, সাধু তাদের বললেন—"তোমরা গয়াতে গিয়েছিলে। তোমাদের সেই চাষ করার গরুটি মরে গিয়েছে।"

বাসনা-কামনাতে মানুষকে ঘুরে ফিরে সংসারে আসতে হয়। সেইজন্য শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, "ভগবানকে কিসে পাব সেই চিন্তা রাখলেই মঙ্গল।"

৪। মানুষের দুঃখ-কষ্ট হয় কেন

খোকা মহারাজ বলেন ঃ অনেকে বাজে চিন্তা করে আসল জিনিস হারায়। একবার যদি ভগবানের বিষয় ঠিক ঠিক জানতে পারে সে শত গোলমালে পড়লেও তার মন ভগবান চিন্তায় লিপ্ত থাকে। যারা সাঁতার শিখে তারা আর কখনো ভুলে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, যেমন গাছ ছোটবেলায় বেড়া দিয়ে রাখতে হয়, সেইরকম প্রথমাবস্থায় সাবধানে থাকতে হয়। যেমন গাছ বড় হলে পরে তাতে হাতি বাঁধলেও কিছু হয় না, সেই মতো মানুষের জীবন গঠিত হয়। বাল্যকাল থেকে ভগবানের বিষয় শিক্ষা করা দরকার। তাতে বড় হলে অনেক দুঃখ-কষ্ট কমে যায়। ভগবান মানুষের সৎ-শিক্ষার জন্য কত কি করেছেন। জায়গায় জায়গায় ঠাকুরবাড়ি, ঘরে ঘরে তুলসী মঞ্চ, ধর্ম সম্বন্ধে কত পুস্তক কত লোকের বাড়িতে আছে। কিন্তু কেউ সে সকল পড়বে না, দেবালয়ে যাবে না; সে দোষ কার—ভগবানের কি মানুষের? ভগবানকে লোকে মঙ্গলময় বলে। যে তাঁকে চিন্তা করে, এক মনে ডাকে তিনি তার মঙ্গল করেন। যেমন লোকের অসুখ হলে পরে, কাঁদা-কাটা করে স্বপনে ঔষধ পায়। কিন্তু

ভগবান কেমন, তাঁর দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে কেউ কাঁদা-কাটা করে না, তাঁকে দর্শন করতে চায় না বা এক মনে ডাকে না।

৫। নির্জনে তীর্থে মন্দিরে গোপনে ভগবানকে ডাকা

খোকা মহারাজ বলেন ঃ হিমালয়ে উত্তরাখণ্ডে অনেক তীর্থস্থান আছে ও অনেক সাধুদের বিষয় শোনা যায়। সেখানে কত পাহাড়। অনেক পাহাড়ের ওপর দেব-দেবীর মন্দির। পাহাড়ি লোকেরা বেশির ভাগ দেবীর উপাসক। শিবের মন্দিরও আছে।

আমি একবার এক দেবীর স্থান দেখতে গিয়েছিলাম। দেবীর নাম ভদ্রকালী। অনেক পাহাড় ভেঙে দেবীর মন্দিরে যেতে হয়। ওপর থেকে নিচে নামবার সময় গাছের শুকনো পাতার ওপর দিয়ে যেতে পড়ে যাবার ভয়। যখন নিচের পাহাড়ে নামলাম, দেখি নিচে কত গাছপালা, স্রোতস্বতী নদী, চারিদিকে বড় বড় গাছ। ক্রমশ পাহাড়ের নিচের দিকে নামতে লাগলাম। দেখলাম নিচের দিকে খুব বড় গুহার ভিতরে প্রকাণ্ড স্রোতস্বতী নদী চলেছে। নদীর নাম ভদ্রাবতী, নদীর জল খুব ঠাণ্ডা। নদীর পাশের অনেক গাছপালা সব পাথর হয়ে গিয়েছে। একটা ছাগলের মাথা দেখলাম পাথর হয়ে গিয়েছে। ক্রমশ এক কোমর জলে নামলাম, গুহার ভিতরে গেলাম। সেই ভদ্রাবতী নদীর গুহার ভিতরে উঁচু জায়গায় দেখলাম ছোট পাথরের মূর্তি। ব্রাহ্মণ গিয়ে রোজ পূজা করে। বর্ষাকালে যেতে পারে না, তখন নদীর জল বেড়ে যায় ও খুব স্রোত থাকে। সেখানে গুহার ভিতর আলো নিয়ে গিয়ে দেখলাম প্রায় সত্তর আশি হাত উঁচু মন্দির। পর পর তিনটি মন্দির—প্রথম মন্দির থেকে আর দুটি আরও উঁচু। আশ্চর্যের বিষয় পাহাড়ের ভিতরে এরকম মন্দির কে তৈয়ারি করলে। ভদ্রকালীর মন্দির থেকে নন্দাদেবীর মন্দির বিশ পঁচিশ মাইল দূরে। সেখানে আমার যাওয়া হয়নি।

৬। মহামায়ার নামে অমঙ্গল মঙ্গল হয়ে যায়

খোকা মহারাজ বলেন ঃ

একটা গল্প শুনেছি, সত্য ঘটনা। কলকাতার একজন লোক চণ্ডীর গান

করতো, তার নাম জগা সেকরা, বিখ্যাত গায়ক। একবার মফঃস্বলে চণ্ডীর গান করতে জগা সেকরা ও তার দল গিয়েছিল। ফিরবার সময় তারা হুগলী এসেছিল। সেখানে এক জমিদার তাদের খাতির করে বললে, এখানে আপনারা আতিথ্য গ্রহণ করুন। তারা সকলে জমিদার বাড়ি গেল। বিকেলে তারা কেহ কেহ মুখ হাত পা ধুতে গিয়ে দেখলে পুকুরের ধারে জঙ্গলে মুণ্ড কাটা মানুষের ধড় পড়ে রয়েছে চার পাঁচটা। দেখে সেকরার লোক জগা সেকরাকে বললে, "এরা আমাদের খুন করবে।" অবশেষে জগা সেকরা নিজে এবং তার লোকেরা একে একে গিয়ে দেখলে—সত্যই মানুষগুলোকে মেরে ফেলেছে। জঙ্গলে ধড় পড়ে রয়েছে। ঐসব দেখে তারা এসে জমিদারের এক ঘরের মধ্যে বসলো। সন্ধ্যার পর জমিদার এসে সেকরাকে বললে, তোমরা আহারের জোগাড় কর, আমি সিধে দিচ্ছি। জগা সেকরা বললে, "মশায় আমরা আগে মায়ের নাম করবো। তারপর খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্ত হবে। আমরা মায়ের নাম না করে জলগ্রহণ করি না।" জমিদার বললে, "ঘরে বসেই মায়ের নাম কর।" জগা সেকরা বললে, "আপনি বাহিরে একটা সতরঞ্জি পাতিয়ে দিন ও একটি আলো জ্বালিয়ে দিন সেখানে বসেই মায়ের নাম হবে।"

জমিদার তাই করলে।

জগা সেকরা ও তার দল চণ্ডীর গান-বাজনা আরম্ভ করল। চণ্ডীর গান হবে শুনে আশেপাশের সমস্ত লোক এল। সমস্ত রাত ধরে চণ্ডীর গান হয়েছিল। জমিদার বাড়ির লোক ও অন্য লোক যারা গান শুনছিল, গায়কদের পুরস্কার স্বরূপ অনেক টাকা পয়সা দিয়েছিল। চণ্ডীর গান সমস্ত রাত হয়ে, তারপর দিন বেলা আটটা-নয়টা পর্যন্ত হয়েছিল। জমিদার বাড়ির মেয়েরা গান শুনে এত আনন্দিত হয়েছিল যে তাদের সোনা রূপার অলঙ্কার আর রূপার ঘটি বাটি যা কিছু ছিল সমস্তই পুরস্কার দিয়েছিল। শেষকালে জগা সেকরা রূপার বাসনপত্র, টাকা-পয়সা সমস্ত বেঁধে জমিদারকে বললে, "আমরা এখন চলে যাব।" জমিদার অনেক অনুরোধ করলে, "আমাদের এখানে আজকের দিনটা থেকে রাতে বিশ্রাম করুন।" জগা সেকরা সে কথা শুনলে না, বললে, "নিকটে এক গ্রাম আছে,

সেখানে আমাদের যেতে হবে—আবার যখন আসবো তখন আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে, আজ আমাদের অমুক গ্রামে যেতে হবে বিশেষ দরকার।"

এই বলে জগা সেকরা ও তার দলের লোক সব চলে গেল। অবশেষে জমিদার ও তার দলের লোক সব বলাবলি করতে লাগলো যে বেটা ভারী পালিয়েছে। তারা ভেবেছিল সে রাত্রে থাকলে তাদের টাকাকড়ি সব কেড়ে নেবে ও তাদের সকলকে কেটে ফেলবে।

মানুষ ভাবে এক আর মহামায়ার ইচ্ছায় হয় অন্যরকম।

সে জমিদার বংশে এখন কেউ নেই—নির্বংশ হয়েছে।

মহামায়ার ইচ্ছায় জগা সেকরার দলবল সব রক্ষা পেল। মা যাকে রাখেন, কার সাধ্য তাকে মারে! মায়ের নামের জয় জয়কার হলো।

৭। খোকা মহারাজের নিজ মুখের কয়েকটি উক্তি ঃ

ছোটবেলায় আমার খুব ভয় ছিল। শ্রীশ্রীঠাকুর যখন আমায় স্পর্শ করলেন, তারপর থেকে আমার আর কোন ভয় ছিল না।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন—এখানে যত ভক্ত আসবে সব জানা আছে।

ঠাকুর যখন মা কালীর পূজা করতেন তখন উন্মত্তের মতো অবস্থা হতো। তখন ডাকতেন—ওরে ভক্তরা তোরা শিগ্‌গির আয়।

আবার মার কাছে বলতেন—যত রকমের ভক্ত আছে, যাদের উচ্চ অবস্থা, তাদের এনে দাও, সকলকে দেখবো।

অবশেষে সকল সম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ সব এসেছিলেন, তিনি সকলকে দেখেছিলেন। পরে তাঁর ভক্তরাও এসেছিলেন, তিনি সকলকে দেখে খুব আনন্দ করেছিলেন ও কত গল্প করতেন।

শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছিলেন, এর পর আরও কত ভক্ত আসবে এবং পৃথিবী ছেয়ে যাবে।

বলেছিলেন—এখানকার হাব-ভাব, চাল-চলন, কথাবার্তা যাদের ভাল লাগবে তাদের এই শেষ জন্ম।

শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে একটি গান শুনেছি—

ভব দুঃখ হরা নাম তোমার।
তাপিত তনয়ে ডাকে
তুমি বেড়াও ফাঁকে ফাঁকে
কি দোষে হয়েছি দোষী চরণে তোমার ॥

মা আনন্দময়ী, দীন-তারিণী তোমার ছেলে মেয়ে সকলে তোমায় দেখতে পায় না কিন্তু তুমি তাদের দেখ, সকলের প্রতি কৃপা দৃষ্টি রেখো—এই প্রার্থনা মা, তোমার কৃপায় তোমার ছেলে মেয়েদের অমঙ্গল মঙ্গল হয়ে যাক।

(২৪)

শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভের জন্য উদ্বিগ্ন

রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

রাঁচিতে খোকা মহারাজ আমাদের কাছে বলেছিলেন যে শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহরক্ষার পর তিনি কিছুকাল বরাহনগর ও আলমবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে ছিলেন। সেখানে কিছুকাল থাকার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন লাভের জন্য তাঁর মন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়। তখন তিনি হেঁটে কলকাতা থেকে কাশী যাত্রা করেন। তিনি বলতেন, সে সময়ে পথে কোন আশ্রয়ের কথা বা খাবার কথা তাঁর মনে আসতো না। কোন বাড়িতে কি মন্দিরে যেতেন না। পথের ধারে গাছতলায়, নদীর তীরে, শ্মশানে অথবা মাঠে—যেখানে যখন সন্ধ্যা হতো সেইখানেই বিশ্রাম করতেন। এ অবস্থায় শরীরের সুখ-দুঃখ বলে কোন হুঁশই ছিল না। সর্বদাই শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্য উন্মনা ভাবে থাকতেন। সে সময়ে দেওঘর পর্যন্ত হেঁটে যাবার পর দেখলেন—পা ফেটে রক্ত পড়ছে। দেওঘরে কিছুদিন থেকে আবার সেখান থেকে রওনা হন।

এইভাবে কিছুকাল ভ্রমণের পর রাজপুতানায় রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দের) সহিত খোকা মহারাজ মিলিত হন। রাখাল মহারাজও তখন একাকী ভ্রমণ করছিলেন। খোকা মহারাজ রাখাল মহারাজের সেবার জন্য তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। পরে তাঁরা বৃন্দাবন এসে তিন চার মাস থাকেন। বৃন্দাবনে থাকার সময় তিনি রাখাল মহারাজের সঙ্গে এক ঘরে শুতেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করতেন, রাখাল মহারাজ রোজ রাত জেগে মশারির ভিতর বসে ধ্যান করেন। কয়েক দিন এইরূপ লক্ষ্য করার পর খোকা মহারাজ একদিন রাখাল মহারাজকে বলেন, "আপনি সারারাত জেগে কেন এমন কষ্ট করেন? এরূপ করলে অল্প দিনেই শরীর খারাপ হয়ে পড়বে। ঠাকুর আপনাকে এত ভালবাসতেন, আপনার এত কষ্ট করবার দরকার কি?" উত্তরে রাখাল মহারাজ বলেন—"দেখ খোকা, এ জিনিস হাতে হাতে দেবার নয়। এ জিনিস [ব্রহ্মজ্ঞান] খেটে লাভ করতে হয়। যদি হাতে হাতে দেবার হতো তবে ঠাকুর আমায় যে রকম ভালবাসতেন, তিনি হাতে হাতে দিয়ে দিতেন।"

একাকী ভ্রমণের সময় হৃষীকেশে খোকা মহারাজ খুব আমাশয়ের পীড়ায় ভোগেন। দু-এক দিন পরেই ঘরের বাহির হবার শক্তি আর রইল না। ঘরের ভিতর পড়ে পড়ে যন্ত্রণায় ছটফট করতেন। এই অবস্থায় ঠাকুরের ওপর ভারী অভিমান হয়। তিনি সেই অবস্থায় শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন পান—ঠাকুর এসে তাঁর গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দেন ও বলেন—"কিরে. তোর কি সেবা করবার লোকজন নেই—বল এখুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" উত্তরে খোকা মহারাজ বলেন—"না আমার কোন লোকজনের দরকার নেই। আমার অসুখ হলে আপনি আসবেন আমি দেখব।"

একবার হিমালয়ে ভ্রমণকালে কোন পাহাড়ি জায়গায় গাছতলায় গায়ের চাদর বিছিয়ে শুয়ে ছিলেন। কাছেই বসতি ছিল—কিন্তু সেখানে আশ্রয় নেন নি। ঐভাবে গাছতলায় থাকবার সময় মধ্য রাত্রে একটি বৃদ্ধা এসে তাঁকে জাগিয়ে দিয়ে বলে—"ওরে, ওঠ ওঠ ঐ দাওয়ায় গিয়ে শো। দেখছিস না এখানে কত গর্ত রয়েছে। ওরা (সাপ প্রভৃতি) আহারের চেষ্টায় বাহিরে আসতে

পারছে না। তুই গর্তের মুখ চাপা দিয়ে শুয়ে রয়েছিস।" এই কথা শুনে তিনি দাওয়ায় গিয়ে শুলেন।

খোকা মহারাজ একবার রাঁচিতে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন—তিনি কোন সময়ে কোঠারে (উড়িষ্যায়) বলরামবাবুদের বাড়ি গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি এক দেবীর মন্দির-প্রাঙ্গণে থাকতেন। তাহার খাবার রোজ বলরামবাবুদের বাড়ি থেকে দিয়ে যেত। দেবীর মন্দিরের সম্মুখে একটি ঘাট-বাঁধানো পুষ্করিণী ছিল। তিনি কখনো কখনো সেই বাঁধানো ঘাটের সিঁড়িতে রাত কাটাতেন। তিনি বলেছিলেন—সেই সময়ে দুটি কুকুর কোথা হতে এসে রাতে ওই বাঁধানো ঘাটে পাহারা দিত। একদিন রাতে সিঁড়ির ওপর ঘুমিয়ে পড়েছেন—হঠাৎ মাঝ রাতে কুকুর দুটো খুব চিৎকার করতে থাকে, সেই চিৎকারে তার ঘুম ভেঙে যায়। তিনি চারিদিকে চেয়ে দেখতে পেলেন যে জল থেকে একটি কুমির সিঁড়ি দিয়ে উঠে তার দিকে আসছে। দেখে তিনি ওখান থেকে উঠে গিয়ে দেবীর মন্দিরে আশ্রয় নেন।

এক রাতে মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে বসে আছেন—এমন সময় দেখেন পুরানো দেয়ালের ফাটল থেকে এক প্রকাণ্ড গোখরো সাপ বের হয়ে তাঁর দিকে আসছে। দেখে তিনি ভয় পাননি—সেই সাপ কি করে, দেখবার জন্য চুপ করে বসে আছেন। দেখলেন সাপটা কিছু দূর এসে তাঁর দিকে চেয়ে রইল। তারপর আবার দেয়ালের ফাটলের ভিতর ঢুকে গেল।

দেবীর মন্দিরের নিকটে এক শ্মশানেও তিনি কখনো কখনো রাতে ধ্যান করতেন। তিনি বলেছিলেন, একদিন রাত্রে ধ্যানের সময় দুটি বড় বড় সাপ এসে তার চারিদিকে ঘুরতে থাকে। তিনি তাতে ভয় না পেয়ে ধ্যানেতেই মনঃসংযম করেন। ধ্যানান্তে সেই সাপ আর দেখতে পাননি।

বলেছিলেন—ওখানে খুব মশার উপদ্রব। একটু ধ্যান করতে বসলে সমস্ত শরীর মশায় ছেয়ে ফেলতো। মশার উপদ্রবে প্রথম মন একটু চঞ্চল হতো—কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ধ্যান জমে উঠলে আর বাহিরের হুঁশ থাকতো না। ওই সময় একদিন শেষ রাত্রে ধ্যানান্তে তিনি বোধ করলেন—কে যেন হাওয়া করে

মশা তাড়াচ্ছে। চেয়ে দেখলেন দেবী নিজেই আঁচল দিয়ে মশা তাড়াচ্ছেন। দেবী তাঁকে আদেশ করেন—"আমায় দোক্তা দিয়ে পান খেতে দিবি।" পরের দিন তিনি দোক্তা দেওয়া পান দেবীকে নিবেদন করেন।

(২৫)

কত যে স্নেহ পেয়েছি

সাধনা সেনগুপ্ত

আমাদের বাড়ি (ঢাকা, বিক্রমপুর) কলমা গ্রামে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম প্রেমানন্দ স্বামীজী সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন আমরা ছোট ছিলাম, তাই কিছুই মনে পড়ে না।

উক্ত আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসবের সময়—বোধ হয় ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে এসেছিলেন খোকা মহারাজ। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন সাধু মহারাজও ছিলেন। কয়েক দিন হৈ-চৈ ও আনন্দে কেটে গেল।

উৎসব শেষ হলে আমরা কয়েকজন দীক্ষা নেব। দীক্ষা সম্বন্ধে তখন কিছু বুঝতাম না। তবুও দীক্ষার জন্য সব আয়োজন করলাম। আশ্রমে আমরা তিন জন পাশাপাশি বসে দীক্ষা পেলাম। মহারাজ হাত ধরে করজপ দেখিয়ে দিলেন।

বাড়িতেও আমাদের শ্রীশ্রীঠাকুর ঘর আছে। একদিন ঠাকুরঘরের সামনে মহারাজ বসে আছেন, আর আমরা ফুল বেলপাতা দিয়ে পূজা করছি। হঠাৎ এক দুধওয়ালী এসে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন—"আমার পা জ্বলে গেল।" আমরা পা ধুইয়ে, চন্দন ঘসে পায়ে দিয়ে, পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলাম। তবে জ্বালা কমে।

তিনি যে বাড়িতে থাকতেন—আমরা বড় বাড়ি বলতাম। সারা দুপুর সেখানে একদিন তাঁর কাছেই ছিলাম। মহারাজ পা টিপে দিতে বললেন। টিপতে

গিয়ে দেখি পা দুটো ইটের মতো শক্ত। তা বলায় মহারাজ তৎক্ষণাৎ পা নরম করে বললেন—"এখন?"

একদিন আমরা মেয়েরা আশ্রমে রান্না করে মহারাজকে খাওয়ালাম। চিংড়ি মাছ বেটে বড়া করে আলু দিয়ে ঝোল রান্না করায় তিনি কত প্রশংসা করলেন—বেশ মনে আছে।

এক মাসের মতো আমরা সকলে মনের আনন্দে কাটালাম। তারপর তিনি ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে চলে গেলেন। ঢাকা থেকেই তাঁর বেলুড় মঠে ফেরবার কথা—আর এখানে আসবেন না। কত যে কষ্ট হলো তা লেখবার নয়। মনে হয়েছিল সব কাজ যেন ফুরিয়ে গিয়েছে, কোন কাজই নেই।

কয়েকদিন বাদে তাঁকে চিঠি দিলাম, তখন নতুন একটা আনন্দ মনের মধ্যে এল। নিবেদিতা স্কুলে যাবার জন্য আমার কাছে খবর এল। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। এসব যে লিখতে হবে তা কি তখন জানতাম। তাহলে আরও মনে রাখতে চেষ্টা করতাম।

কিছুদিন বাদে নিবেদিতা স্কুলে শিক্ষকতা করতে গেলাম। তখন সেখানকার তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ। তিনি আমার মামাকে আমায় ওখানে পাঠাবার কথা বলেছিলেন, তাই গিয়েছিলাম।

পূজনীয় খোকা মহারাজ প্রতি সপ্তাহে অথবা দুই সপ্তাহে একদিন নিবেদিতা স্কুলে গিয়ে দর্শন দিয়ে আসতেন।

একদিন আমরা স্কুল-কর্তৃপক্ষসহ সকলে দক্ষিণেশ্বর দর্শনে যাই। সেখানে স্নান দর্শনাদি সবই হচ্ছে। কিন্তু আমার মনটা স্থির ছিল না। কেবলই মনে হচ্ছিল পূজনীয় মহারাজ আমাকে না দেখে ফিরে আসবেন। কত কষ্ট করে যাবেন আর ফিরে আসবেন—ভেবে ভেবে আমার মন বড়ই চঞ্চল হচ্ছিল, কাউকে বলতেও পারছিলাম না, কেবল কান্না পাচ্ছিল। যা ভেবেছিলাম তাই হলো। বাগবাজারের ঘাটের কাছ দিয়ে বাস যাবার সময় দেখলাম পূজনীয় মহারাজ সেই প্রচণ্ড রোদে ছাতা মাথায় দিয়ে খেয়া ঘাটে যাচ্ছেন। বাসের

মধ্যে কয়েকজনকে দেখালাম—ঐ মহারাজ যাচ্ছেন। বাস থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে ইচ্ছা হলো কিন্তু উপায়হীন বিষণ্ণ হয়ে বসে রইলাম।

একদিন বৈকালে তিনি স্কুলে এসেছেন। আমার মাথায় তখন খুব যন্ত্রণা, মাথাটা গরম। আমি মহারাজের হাত আমার মাথায় চেপে ধরে বললাম, "দেখুন আমার মাথাটা কিরকম গরম। এক হাঁড়ি ভাত সিদ্ধ হয়ে যাবে।" তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"মাথা আর এ রকম গরম থাকবে না, ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।" তারপর থেকে আমার মাথার যন্ত্রণা ও গরম আর তেমন ছিল না।

নিবেদিতা স্কুলে থাকা খাওয়ার পরিবর্তে শিক্ষকতা করতাম। একদিন স্কুলে আমাকে ছেঁড়া কাপড় পরা দেখে বললেন, "তোর কাপড় নেই?" আমি কিছু না বলে কেবল কাঁদতে লাগলাম।

কয়েকদিন পরে বেলুড় মঠে গিয়েছি। তিনি আমাকে বললেন দুখানা ধুতি ছাপাবার জন্য গোপালকে দিয়েছি। তুই কাপড় দুখানা পরবি।"

বেলুড় মঠে আর একদিন বিশ্রামের সময় বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবক ও ভদ্রমহিলা মহারাজকে প্রণাম করতে তাঁর ঘরে এলেন। মহারাজ যুবকটির প্রতি খুব বিরক্ত হয়ে খুব ভর্ৎসনা করলেন। আমার মুখের দিকে চেয়ে মহারাজ হঠাৎ বলে উঠলেন, "এ তোর ভাই নাকি?" আমি "না" বলায় যেন নিশ্চিন্ত হলেন।

গ্রীষ্মের ছুটিতে ঠাকুরের উৎসবের সময় বাড়ি (কলমা) গেলাম। বেলুড় মঠ থেকে অন্যান্য মহারাজরা উৎসবে গিয়েছেন। বেশ আনন্দে দিনগুলি কেটে গেল।

কিছুদিন বাদে মহারাজ রাঁচিতে আমার মায়ের জন্য শিক্ষিকার কাজ ঠিক করে মাকে চিঠি দিলেন, "তুমি আর পুরুলিয়া না গিয়ে রাঁচিতে চলে আসবে।" পুরুলিয়ায় মার পক্ষে একটু অসুবিধা ছিল, সেজন্য মহারাজ রাঁচির ভক্তদের দ্বারা মায়ের কাজ একেবারে ঠিক করে পরে চিঠি দিয়েছিলেন। তিনি

যে আমাদের জন্য কত চিন্তা করতেন এতেই বেশ বোঝা যায়। আমিও মায়ের সঙ্গে রাঁচি যাই। রাঁচিতে শ্রীশ্রীমার অনেক ভক্ত ছিলেন। আমার মাও শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্যা ছিলেন। মা রাঁচিতে গিয়ে খুব অসুস্থ হন। ভক্তরা অনেকেই পালা করে রোগীর সেবা করেন, যেমন শ্রীশ ঘটক একজন। আট দশ দিন বাদে আমার দাদা রাঁচি এলেন—কিন্তু তখন রোগীর জ্ঞান ছিল না। খোকা মহারাজ এ সংবাদ পেয়ে চিন্তিত হয়ে চিঠি দিলেন—"গোবিন্দবাবুর বাড়িতে প্রত্যহ শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয়, রোজ তাঁর বাড়ি থেকে ঠাকুরের চরণামৃত এনে মার মাথায় দাও ও খাওয়াও।"

তারপর খোঁজ করে সেই ভক্ত ভদ্রলোকের কাছে সব বললাম ও শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণামৃত রোজ এনে খাওয়াতে ও মাথায় দিতে লাগলাম। মা ভাল হলেন। কিছুদিন পরে মহারাজের আর এক চিঠি পেলাম এবং আমার জপের মালাও এলো। মহারাজ লিখলেন, "আমি জপ করিয়া পাঠাইলাম।"

১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে আমি কলকাতায় ট্রেনিং নেবার জন্য প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়ে আবার রাঁচি গেলাম। ১৯৩১ সালের প্রথম সপ্তাহে আমি কলকাতার (ভবানীপুর) ল্যানস্‌ডাউন রোডে ট্রেনিং নিতে এলাম। একদিন বেলুড় মঠে গিয়ে মহারাজের আশীর্বাদ নিয়ে এলাম।

আমার মা রাঁচি থেকে হাওড়ায় এলেন শিক্ষকতা করতে। কাজেই আমি বোর্ডিং থেকে মায়ের কাছে গেলেই বেলুড় মঠে চলে যেতাম। ফল মিষ্টি যা হোক একটু কিছু হাতে করে নিয়ে যেতাম। একদিন কোন কিছুই নিয়ে যেতে না পারায় ক্ষুণ্ণ হয়েছি বুঝতে পেরে মহারাজ আমায় বললেন—"ঐ টেবিলের উপর ফল আছে, যা হয় একটা নিয়ে আয়।" আমি একটা বেদানা নিয়ে যেতেই বললেন—"আমার হাতে দে।" তাঁর হাতে দিতেই বললেন—"এই তোর ফল দেওয়া হয়ে গেল, তুই মন খারাপ করিস না।"

শালিখা (হাওড়া) থেকে প্রায় প্রতি সপ্তাহেই বেলুড় মঠে যেতাম। সকালে যেতাম ও সন্ধ্যায় আরতির পর ফিরে আসতাম; সারাদিন খোকা মহারাজের কাছে থাকতাম। কোন সময়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতাম। কোনও সময় পা

টিপে গায়ে হাত বুলিয়ে দিতাম। কোন দিন বৈকালে মেঘ দেখলে বলতেন, "আজ এখন চলে যা। মেঘ করেছে, গঙ্গা দিয়ে যাসনি, বাসে যাবি।" বেশির ভাগ বাসেই যেতাম।

একদিন ভবানীপুর থেকে বেলুড় মঠে গিয়ে প্রণাম করতেই বললেন— "বড় দেরি করে এলি। আজ কত খাওয়া হলো, কিছু কি আর আছে?" বুঝলাম আজ মহারাজের জন্মতিথি, তাই শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ হয়েছে। অভয় মহারাজকে দিয়ে একবাটি পায়েস আনিয়ে দিলেন। আর একটা চামচও দিতে বললেন। আমি মহারাজের খাটের পাশে মোড়াতে বসে চামচ দিয়ে পায়েস খেতে লাগলাম। তিনি আবার দু-একটা কথাও বলতে লাগলেন।

খোকা মহারাজ ও মহাপুরুষ মহারাজ পাশাপাশি ঘরে থাকতেন। কোন কিছু খাবার করলে দুজনের জন্যই নিয়ে যেতাম। কোন দিন পায়েস, কোন দিন পাটিসাপটা ইত্যাদি। দুজনের সেবকই তাঁদের শারীরিক অবস্থা বুঝে ঐসব খাবার তাঁদের দিতেন বা দিতেন না। তাতে তাঁরাও বলাবলি করতেন আর আমাদেরও খারাপ লাগতো। মহাপুরুষ মহারাজ আমার মাকে 'শালখের বুড়ি' বলে ডাকতেন। সপ্তাহে একদিন না গেলে শালখেতে সেবক পাঠিয়ে আমাদের খোঁজ খবর নিতেন ও প্রসাদ পাঠিয়ে দিতেন। মঠে গেলে প্রসাদ না নিয়ে কখনোও ফিরতে দিতেন না। যখন মহাপুরুষ মহারাজের বাকশক্তি রহিত হয়ে গেল তখনও ইশারায় খাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতেন। এইসব কারণে তাঁর সেবকদের মধ্যে একজন হঠাৎ একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়েছ?" আমি বলার পর সেবক মহারাজ বললেন, "তুমি মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এত যাতায়াত করতে এবং তিনিও তোমাদের জন্য চিন্তা করতেন—তাই জিজ্ঞেস করলুম।"

কিছুদিন পরে খোকা মহারাজের শরীর বেশি খারাপ হওয়াতে তাঁকে স্থানান্তরিত করে লাইব্রেরির [এখন (১৯৭৭) যেখানে মিশন অফিস] দোতলার পূর্ব দিকের ঘরে আনা হলো। এ ঘরে বেশ আলো বাতাস ছিল। তাঁর কাছে এলেই বলতেন—"পা-টা একটু টিপে দে।" তিনি ঘুমিয়ে পড়লেও তাঁর খাটের

পাশেই বসে থাকতাম। তিনি মেঘ দেখলেই বাড়ি পাঠাবার জন্য অস্থির হয়ে পড়তেন। ঝড়জলকে বড় ভয় করতেন।

একদিন পা টিপতে টিপতে বলে ফেললুম, "মহারাজ, আপনার বিছানার চারিদিকে কত বালিশের গাদা, তবু আপনি বালিশে মাথা না দিয়ে হাতের ওপর মাথা রেখে ঘুমান কেন?" তিনি বললেন—"যখন হিমালয়ে তপস্যা করতুম, তখন কি এত বালিশ বিছানা থাকতো? তখন এমনি করেই শুতুম, সেই অভ্যাস রয়ে গেছে।"

একদিন সকালে দশটা সাড়ে দশটায় গিয়েছি। মহারাজ ঘুমিয়ে আছেন। কি করবো ভাবছি আর মহারাজের ঘরে যাতায়াত করছি। সেবককে জিজ্ঞেস করলাম, "কতক্ষণ যাবৎ ইনি ঘুমিয়ে পড়েছেন?" সেবক আমাকে তাঁর খাটের পাশে বসে থাকতে বললেন। আমি নিশ্চিত হয়ে বসে রইলাম, কিছুক্ষণ পরেই তিনি উঠলেন। তাঁর স্নানাহারের আয়োজন হচ্ছিল। ওদিকে প্রসাদের ঘণ্টা পড়ায় আমি উঠে গেলাম। প্রসাদ পেয়ে এসে দেখি তিনি স্নানাহার করে শুয়েছেন। আমি গিয়ে তাঁর হাত পা টিপে দিতে লাগলাম। এ রকম প্রায়ই যেতাম এবং তাঁর কাছে সারাদিন থাকতাম।

তখন ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দ। তাঁর শরীর দিন দিন খারাপ হচ্ছে। তাঁর বিকেলের দিকে দর্শনার্থীর ভিড় থাকে। আমি মার সঙ্গে নয়তো দাদাদের সঙ্গে তাঁকে দেখতে যেতাম। একদিন মেজদার সঙ্গে সকালের দিকে গিয়েছি, মেজদা আবার তাঁর পাঁচ-ছয় বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন। আমি গিয়ে দেখি মহারাজ ঘুমিয়ে আছেন। আমি মন্দিরে-মন্দিরে বেড়াতে লাগলাম। মোটেই ভাল লাগছিল না। মহারাজকে আর একলা পাবার আশা নেই। মেজদার মেয়ে নিচে কাঁদছে। মেজদা বাড়ি যাবার জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। আমি দোতলার রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দাদাকে আর একটু অপেক্ষা করতে বললাম। মহারাজকেও সাহস করে যাবার কথা বলতে পারছি না। তবুও সাহস করে একবার বললাম—"মহারাজ, আমি এখন যাই।" তিনি শুনে অবাক হয়ে বললেন—"তুই কখন এসেছিস, যাবি যে?"

—"সকালে এসেছি, মহারাজ।"

—"আমি তো তা জানি না।"

—"আমি যখন এসেছি, আপনি তখন ঘুমোচ্ছিলেন, তাই আসি নি।"

—"আমি ঘুমোচ্ছিলাম, তাতে কি, আমাকে ঠেলে জাগিয়ে দিলি না কেন? এখন যাবি না, এখানে বোস।"

আমি খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। কিন্তু মনটায় অস্বস্তি। মেজদা ডাকাডাকি করছেন, তাঁর মেয়ে কাঁদছে—তিনি আমাকে ফেলে যাবেন না। সামনে সন্ধ্যা নামছে। তারপর মহারাজের ঘরের ভিতর গিয়ে তাঁকে বললাম, "আজ আমি যাই—মেজদার মেয়ে বড় বিরক্ত করছে," ইত্যাদি বলে মহারাজকে প্রণাম করলাম। তাতে মহারাজ (যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে) বললেন, "তবে যাবি? যা।" তাঁর ইচ্ছা ছিল না, তবু চলে এলাম। আমার মনটাও খারাপ হয়ে গেল, কারণ মহারাজ থাকবার জন্য এত আগ্রহ কোন দিনই করেননি। বোধ হয় স্থূল শরীরে আর দেখা হবে না, তিনি বুঝেছিলেন এই শেষ বিদায় হয়ে গেল।

এখনও তাঁর ঘরের সেই দৃশ্য আমার মানস চক্ষে দেখছি বলে মনে হয়। মনে হয় দৌড়ে গিয়ে তাঁর শ্রীচরণতলে নির্ভয়-আশ্রয় নিই।

আমি শিশুকালে পিতৃহারা হয়েছি তাঁকে পেয়ে সে কথা ভুলে গিয়েছিলাম।

তাঁর কত যে স্নেহ পেয়েছি তা ভেবে এখনও চোখ জলে ভরে যায়। তখন তো উপলব্ধি করতে পারিনি এসব স্মৃতি শেষ জীবনে কত আনন্দের ও কত প্রয়োজনের। এখন অনুতাপ হয় আরও কেন মনে রাখলাম না। এত বোকা ছিলাম যে কোন স্মৃতিচিহ্নই রাখিনি। জীবনসায়াহ্নে এগুলির যে কত প্রয়োজন এখন তা বুঝছি। কত পাকা চুল তুলেছি, নখ কেটেছি, পা টিপেছি, বসে বসে গল্প করেছি, কত আনন্দেই দিন কাটিয়েছি তা প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই।

(২৬)

তুই নাকি দীক্ষা নিবি?

কমলা (টুনু)

খোকা মহারাজ রাঁচিতে এলে প্রথম দর্শনেই তাঁকে আমার খুব ভাল লাগে—বড় আপনার জন বলে মনে হয়। তিনি কিন্তু বিশেষ ডাকেন না—জিজ্ঞাসাও কিছু করেন না। আমার বয়স তখন নয় বছর।

পাড়ার সব মেয়েরা দীক্ষা নেয়, আমার বড়ই ইচ্ছা হয় যে আমিও মন্ত্র নিই। একদিন আমার মা মহারাজকে আহারের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। আমি বেলা বারোটা অবধি উপোস করে মন্ত্র নিতে চাই—মহারাজ সে দিন নিতে বারণ করেন।

পরে একদিন বেলা দুটার সময় স্কুল থেকে এসেছি—বাড়ির মেয়েরা সব বেড়াতে যাবেন এমন সময় মহারাজ আমাকে তাঁর কাছে থাকতে বললেন। সেদিন মনে বড় অভিমান হলো, তবু তাঁর কথা শুনলাম। কিছুক্ষণ পরে সবাই বেড়াতে চলে গেলে তিনি আমায় বললেন—"তুই নাকি দীক্ষা নিবি?" আমি বললাম—"কৈ আর দিলেন?" মহারাজ বললেন—"আয় নিবি আয়, আমার পাশে বোস। স্নান করেছিস তো?" আমি বললাম—"না মহারাজ।" আমার চুল খোলা ছিল, তাই মহারাজ বললেন—"করেছিস, মনে নেই হয়তো।" বিছানায় বসেই দীক্ষা দিয়ে বললেন—"সর্বদা মনে মনে জপ করবি, ভুলে যাসনি যেন।" তারপর সঙ্গে নিয়ে লেকের ধারে বেড়াতে গেলেন।

সেই দিন থেকে মহারাজের বিশেষ স্নেহের পাত্রী হই। তিনি আমায় কাছে ডাকেন—তেল মাখিয়ে দিতে, তামাক সাজতে, খাবার পর গা হাত পা টিপে দিতে বলেন, সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে সৎশিক্ষা দেন। স্কুলের কাগজ আছে কিনা জিজ্ঞেস করেন, না থাকলে পয়সা দেন। একবার স্লেটে পাহাড় এঁকে

দেখিয়েছিলেন। স্কুলে যাবার আগে রোজ দেখা করতে বলতেন। প্রসাদী মাদ্রাজী সুপুরি দিতেন। এই সুপুরি আমি খুব ভালবাসতুম।

তাঁর দেহত্যাগের পর আমি তাঁর সেবকের কাছে প্রসাদী সুপুরি চাইতে—তাঁর সুপুরি রাখার কৌটোটি পাই।

উত্থান একাদশীতে তাঁর জন্মতিথি—আমি তা জানতুম না। সকালে উঠে একদিন প্রণাম করতেই তিনি আশীর্বাদ করে একটি টাকা দেন। আমি নিতে অস্বীকার করায় খুব বিরক্ত হন, বলেন—"আমি যা বলবো তা না শুনলে আমার কাছে আসিস্‌ না।"

রাঁচিতে (ডারেণ্ডায়) মহারাজের ফটো তোলা হয়। আমাদের বাড়ি থেকে যদি ফটো না নেওয়া হয়—মহারাজ লুকিয়ে আমায় একটি টাকা দেন; বলেন—"এইটি দিয়ে ফটো কিনবি।"

পাড়ার সবাই কাপড়ে তাঁর চরণ-চিহ্ন নেয়—আমরা জানতুম না। মহারাজ বললেন—"দ্যাখ আমার সঙ্গে চল, কেমন মজা হবে।" আমি বললুম—"কেন মহারাজ?" তিনি রুমাল দিতে চান ও বলেন—"ওরা সবাই পায়ের ছাপ নেবে, তুইও একটা নিবি।" আমি ছুটে বাড়ি থেকে খানিকটা মার্কিন নিয়ে আসি। তিনি বলেন—"পাগলী মেয়ে—কেমন রুমাল পেতিস।" বলেই শিশুর মতো হাসতে লাগলেন। আমার কাপড়ে সুন্দর পায়ের ছাপ উঠে। তারপর দিন সকালে তাঁর কাছে যেতেই বলেন—"শোন ফটো ও পায়ের ছাপ শুধু রেখে দিলে নষ্ট হয়ে যাবে—বাঁধিয়ে রাখবি—এই টাকাটা নে।" আমি বলি—"রোজ রোজ বুঝি আপনার নেব? কিছুই তো দিতে পারি না।" তিনি বলেন—"তাতে কি রে—বাপ যদি মেয়েকে না দেয় তো কে দেবে?"

একদিন তাঁর ব্যবহৃত একজোড়া মোজা দিয়ে বলেন—"দ্যাখ এই মোজা রেখে দে—ভাববি আমি তোর কাছে আছি।"

কিছুদিন পরে তিনি কাশী চলে যান। তখন গরমের দিন। সেখান থেকে লিখলেন—"এখানে ভীষণ গরম—তুই আমার মোজায় হাওয়া কর—তবে আমি কিছু ঠাণ্ডা হব।"

বছর দুই বাদে আবার যখন রাঁচিতে আসেন, আমি দেখা করতে যেতেই বলেন—"কি রে, জপ করিস তো? না ভুলে গেছিস?" তখন খেলায় মেতে প্রায়ই জপ করতুম না।

দুর্গাপূজার অষ্টমীর দিন মহারাজ ঠাকুরঘরে ডেকে জপ করতে বলেন ও আমি জপ করি। তিনি বলেন—"ভুলিস নি তো—তবে করিস না কেন?" আমি বলি—"মহারাজ, সবসময় কাপড় ছাড়তে পারি না।" শুনে তিনি বলেন—"সে কি রে—মনে মনে জপ করবি, আর সন্ধ্যা সকালে ঠাকুর ঘরে ভক্তি ভরে প্রণাম করবি—তাতেই হবে।"

আমার মাকে মহারাজ কাশী থেকে জপের মালা এনে দেন। আমি বলি—"মহারাজ, আমায় যে মালা দিলেন না?" তিনি বলেন—"মালা জপে শালারা—তোর কেন মালা জপার সাধ—তুই মনে মনে জপবি, পারিস তো করে জপবি।"

একদিন আমি জিজ্ঞেস করি, "মহারাজ ঠাকুরকে দেখতে পাব তো?" সঙ্গে সঙ্গে বলেন, "হাঁ।"

"ভয় পাব না তো?"

"আমাকে দেখে ভয় পাস?"

"না তো।"

"তবে তাঁকে দেখেও পাবি না। তবে হাঁ, মনে-প্রাণে ডাকতে হবে।"

"মহারাজ, অনেক সময় মনে মনে জপ করছি, কিন্তু কথা বলি সে জপে তো কোন কাজ হবে না?"

—"দেখ, আগুন জেনে হাত দিস বা না জেনে হাত দিস, হাত পুড়বে। তেমনি ঠাকুরকে ডাকলেই কাজ হবে। তবে এক মনে ডাকলে যত শিগ্‌গির কাজ হবে, ততটা হবে না।"

—"মহারাজ, সবাই ধ্যান করে শুনি, কি করে ধ্যান করতে হয়, আমায় বলে দিন।"

—"শোন, গুরুর ধ্যান করতে হয় মাথায়, আর ইষ্টের ধ্যান করতে হয় হৃদয়ে। যখন পূজা করতে বসবি, আমায় মাথার মধ্যে চিন্তা করবি, আর ঠাকুরকে হৃদয়ে—বুঝলি? পূজা করতে বসবার আগে হাততালি দিয়ে নিবি। হাততালি দিয়ে নিলে মনের পাপ দূর হয়ে যায়। যেমন গাছে পাখি বসলে শব্দ করলে পাখি চলে যায়, গাছটা খালি হয়, তেমনি হাততালি দেওয়ায় মনের ময়লা কেটে যায়।"

একদিন মহারাজকে তাঁর ছোটবেলার কথা জিজ্ঞেস করি, কিছু বলতে চাননি। শেষে বললেন—"আমি ছোটবেলায় রোজ রাত্রে বাইরে যেতে উঠতাম। ঠাকুমা বলতেন আমি বসে থাকি, তুমি যাও। আমার কিন্তু বড় ভয় হতো। তারপর দেখতাম আমার কপালের মাঝখান থেকে একটা জ্যোতি বের হতো। আমি সেই আলোতে আর ভয় পেতাম না। বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভয় কমে যায় আর জ্যোতিও দেখতে পাই না।"

আমি একদিন বলি, "মহারাজ আপনি কি পাশ?" মহারাজ বলেন, "আমি এ পাশ আর ও পাশ।" বলেই কী হাসি!

মহারাজ আমাদের বাড়ি এলেই কিছু খেতে চাইতেন। গাছে পেয়ারা থাকলে বলতেন—"কলসিতে রেখে দিও, নরম হলে আমায় কেটে দিও।" নয়তো মুড়ি গোলমরিচের গুঁড়ো নুন দিয়ে দিতে বলতেন। বলতেন—"দেখ, বাড়িতে সাধু এলে শুধু হাতে ফিরিও না—কিছু না থাকে একটি হরিতকী দিও।"

একবার মায়ের হাতে কিছু না থাকায় মা খুব বিপদে পড়েন। মহারাজ এসে বলেন—"মায়ী, আমি তোমায় একটি জিনিস দেবো তুমি রাগ করো না।" মহারাজ পনেরো টাকা মায়ের হাতে দিয়ে বললেন—এই দিয়ে ছেলেদের বই কিনবে। মা বলেন—"আপনি গুরুদেব, কোথায় আমি আপনাকে দেবো—না আপনি আমাকে দিচ্ছেন—এতে তো আমার দোষ হবে।" মহারাজ বলেন—"না, এতে দোষ হবে না, তুমি নাও।"

আর একবার বড় ভাইয়ের পৈতার সময় মহারাজ রাজেনবাবুর স্ত্রীর হাতে

টাকা দিয়ে বলে যান—"এখন দিও না, কাজের সময় দিও।" মহারাজ রাঁচি থেকে চলে যাবার কিছুদিন পরে ভাইয়ের পৈতে হয়।

আমি একবার বলি—"মহারাজ, আপনি কত উপদেশ দেন, আমি ছোট্ট—বড় হলে ভুলে যাব। সব লিখে রাখি।" মহারাজ বলেন—"এখন কিছু লিখতে হবে না আমার দেহ গেলে যা লিখবার লিখিস।" আমি বলি, "সেকি মহারাজ, আপনি দেহ রাখলে আমার উপায় কি হবে?" মহারাজ বলেন, "কোন ভয় নেই, যাঁর আশ্রয়ে এসেছিস—তোদের আর ভয় কি? সময় হলে ঠাকুর সব দেখিয়ে দেবেন।"

(২৭)

সবই সময় সাপেক্ষ

পারুল মুখোপাধ্যায়

রাঁচিতে গোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারি কোয়ার্টার। বাড়িতে দুটি পেয়ারা গাছ। একদিন রাত্রে গাছ থেকে একটি বেশ হলদে পাকা পেয়ারা পড়লো। সকালে আমার বাবা সেই পেয়ারাটি পেলেন। পেয়ারাটিতে কোনরূপ দাগ ছিল না। অনেক সময় দেখা যায় খুব উঁচু থেকে পেয়ারা পড়লে তাতে কাঁকড় বা মাটি লেগে পেয়ারাটা খারাপ করে দেয়। কিন্তু সেই পেয়ারাটিতে কোনরূপ দাগ ছিল না।

পরদিন সকালে খোকা মহারাজ আমাদের বাড়ি বেড়াতে এলেন। তাঁকে সেই পেয়ারাটি দেওয়া হলো। পেয়ারাটি দেওয়াতে তিনি খুব খুশি হলেন। বললেন, "আমারও ইচ্ছা হয়েছিল একটি গাছ-পাকা পেয়ারা খেতে।"

আমি তখন খুব ছোটো।

আমার মা যে দিন খোকা মহারাজের কাছে দীক্ষা নিলেন সেদিন আমিও

মায়ের সঙ্গে ছিলাম। সেই আমার খোকা মহারাজের সঙ্গে প্রথম দেখা। মা প্রায়ই রাজেনবাবুর বাড়ি ধর্মপুস্তক পাঠ শুনতে যেতেন! আমারও খুব ইচ্ছা হতো সেখানে যেতে—কিন্তু আমি কোন দিন সে কথা মাকে বলিনি। আবার ছোট ভাই বোনদের ফেলে যেতেও পারতুম না। মার শরীর খারাপ ছিল, বাড়ির কাজকর্ম আমাকে দেখতে হতো। তবু তিনটে সাড়ে-তিনটের সময় কোন রকম একটা কথা নিয়ে যেতাম সেখানে। মাকে কিছু বলবার দরকার নেই—মহারাজকে একবার দেখবার উদ্দেশ্যেই যেতাম। আমি গিয়ে বারান্দার পাশে দাঁড়াতেই মা বলতেন—"তুমি যাও, আমি আসছি।" কিন্তু আমার চলে আসতে মোটেই ইচ্ছা হতো না। খোকা মহারাজ একটু হাসতেন, কোন কোন সময় বলতেন—"আচ্ছা একটু বসে নিক।"

এইরকম করে কিছুদিন যায়। মহারাজ মাঝে মাঝে আমাদের বাড়ি আসতেন, কিন্তু আমার সঙ্গে বিশেষ কোন কথা হতো না। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসতেন—কিছু বলতেন না।

মহারাজ আমাদের বাড়ির পাশের রাস্তা দিয়ে বেলা দশটা এগারটার সময় যেতেন—আমি রান্নাঘরের জানালা দিয়ে দেখতুম। কোন দিন হয়তো আমার দিকে তাকিয়ে একটু হেসে চলে যেতেন—কিছু বলতেন না। আমার একদিন মনে হলো খিড়কির দরজার সামনে দাঁড়াই, যদি মহারাজ যাবার সময় একটু কথা বলেন। কিন্তু সেদিনও আমার আশা বিফল হলো। তার পরদিনও আমি সেইখানে দাঁড়ালাম। সেদিন মহারাজ বললেন—"আমি এখন যাই, বেলা হয়ে গিয়েছে—তোমার মাকে বলো আমি বিকেলে আসবো।" বিকেলে এসেছিলেন, আমার সঙ্গে কিছু কথাও হয়েছিল। তখন আমার মনে আরও বড় আশা হলো যদি মহারাজ আমাদের বাড়ি থাকতেন তাহলে তাঁর সঙ্গে কত কথাই বলতুম।

কয়েক দিন পরে ইন্দুবাবুর ২৪ নম্বরের বাড়ি বদলাবার সময় মহারাজ আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করছিলেন। আমি আমাদের খাবার ঘরের জানালার ধারে বসে ভাবি—মহারাজ যদি আমাদের বাড়ি একটু আসতেন। এ কথা ভাবার পরক্ষণেই মহারাজ এসে বললেন—"ঠাণ্ডা জল

থাকে তো আমাকে একটু দাও।” আমি এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে মহারাজকে দিলুম। জল পান করে তিনি বললেন—“বাঃ কি সুন্দর ঠাণ্ডা জল—এমন জল আমি কোথাও খাইনি।”

সেদিন আমার আশা পূর্ণ হলো। মহারাজ এখন রোজই আমাদের বাড়ি আসেন আমার সঙ্গে কথাবার্তাও হয়। একদিন আমি বললুম “মহারাজ আপনি কেন এতদিন আমাকে দেখে একটু হেসে চলে যেতেন আমার সঙ্গে একটি কথাও বলতেন না। মহারাজ বললেন, “সবই সময় সাপেক্ষ।”

মহারাজ কলাইয়ের ডাল খেতে ভালবাসতেন। একদিন রান্নাঘরে মনে মনে ভাবছি—মহারাজকে একটু ডাল খাওয়ালে হতো। সত্য সত্যই মহারাজ পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকে 'আনন্দময়ী কোথায়' বলে ডাকলেন। রান্নাঘরের কাছে গিয়ে বললেন—“কি কি রাঁধছিস?” আমি তখন কলাইয়ের ডালের কথাই আগে বললুম। তিনি বললেন—“তোর কলাইয়ের ডালটাই নিয়ে চল, আজ তোর কলাইয়ের ডালটাই খাব।”

জীবনে চলার পথে আজ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি খোকা মহারাজ আজও আমার আশেপাশেই আছেন এবং আমার বিশ্বাস থাকবেনও।

দুপুরে মহারাজের সঙ্গে ঠাকুরের বই পড়া এবং কথাবার্তা হতো। তিনি যা বলতেন কিছু কিছু যা মনে আছে লিখছি ঃ

(১) একদিন গিরিশবাবু মাতাল অবস্থায় অনেক রাতে কালীমন্দিরে যান। দারোয়ান জিজ্ঞেস করে—“তুমি কে?” তিনি বলেন—“আমি গিরিশ ঘোষ।” “তুমি এত রাত্রে কি চাও?” “আমি মাকে একটু প্রণাম করতে এসেছি।”

তারপর গিরিশবাবু মন্দিরের কাছে যান ও বলেন—“মা, দরজাটা খোলো।” এই বলে অনেক ধাক্কাধাক্কি করেন ও কাঁদতে থাকেন। কাঁদতে কাঁদতে বলেন—“তুমি ভোলানাথকে নিয়ে ফুর্তি করছো, আর আমি এত কেঁদে কেঁদে দরজাটা ধাক্কাচ্ছি—তবু খুললি নে মা?” এই বলে তিনি আরও কাঁদতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে ঝনাৎ করে দরজাটা খুলে গেল। তখন গিরিশবাবু

মন্দিরে ঢুকে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে বললেন—"মা এতক্ষণ ডাকার পরে তোর দয়া হলো। এবার আমি তবে যাই, তুই দরজা বন্ধ করে দে।" আবার মন্দিরের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

(২) ঠাকুর ছেড়ে গেলেন। তাঁর দেহত্যাগের পর খোকা মহারাজ ঘর ছেড়ে বের হলেন। একদিন ঘুরতে ঘুরতে একটি ছোটো বাড়ির কাছে সন্ধ্যার পর উপস্থিত হলেন। বাড়িটাতে দু-তিনটি পুলিস থাকতো। মহারাজ সেখানে না গিয়ে একটা গাছের তলায় 'ঠাকুর দেখো' বলে শুয়ে পড়লেন। শোয়ার কিছুক্ষণ পরে এক বুড়ি এসে বললো, "খোকা, তুই এখান থেকে ওঠ।" মহারাজ বললেন—"আমি উঠবো কেন?"

—"এখানে অনেক সাপের গর্ত আছে, না উঠলে তোকে যদি কামড়ে দেয়!"

—"কামড়াবে কেন, তুই দেখ না, আমি উঠবো না, আমি এখানেই শুয়ে থাকবো।"

—"তবে কি আমি তোর জন্য সারারাত এখানে থাকবো? তুই না উঠলে আমি যেতে পারি নে।"

—"তবে আমি কোথায় যাব?"

—"ঐ যে লোকগুলি চৌকি দেয়, ওদের বললেই ওরা তোকে জায়গা দেবে।",

—"না, ওরা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়?"

—"তুই গিয়েই দেখ না—তাড়াবে কেন, তুই চোরও নস, ডাকাতও নস।"

—"তবে তুই বোস—আমি দেখে আসি।"

—"আচ্ছা, আমি দেখছি—তুই যা।"

তখন সেই পাহারাওয়ালারা মহারাজকে থাকবার জায়গা দিল। মহারাজ ফিরে এসে দেখেন সে বুড়ি আর সেখানে নেই।

এইরকম আরও কত গল্প তাঁর কাছে শুনেছি।

জীবনে চলার পথে আজ প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি খোকা মহারাজ আজও আমার কাছেই আছেন এবং আমার বিশ্বাস থাকবেনও!

এই আমি বাবার মনা, মার পারুল, মহারাজের আনন্দময়ী।

(২৮)

যেন গোপাল খাচ্ছেন

শচীন্দ্র চন্দ্র দে সরকার

আজ ১৩৩১ সালের ১১ মাঘ, শনিবার শুভ অমাবস্যা তিথি (ইং ২৪ জানুয়ারি ১৯২৫) প্রাতঃকাল। আজ দুদিন হয় লতপদী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যুগাবতার ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য সুবোধানন্দ মহারাজের শুভাগমন হয়েছে। তিনি আজ শ্রীশ্রীঠাকুরঘরে একখানা তক্তপোশের ওপর বসে আছেন। আশ্রমে চারপাশের গ্রাম থেকে লোকজন এসে খোকা মহারাজের শ্রীচরণ দর্শন ও প্রণাম করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন। প্রত্যেকেরই মনে বড় বাসনা আকাঙ্ক্ষা মহারাজের নিকট কৃপা পাবেন। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবছেন ঃ আমি এমন কি সৎকর্ম করেছি যার ফলে আমি এরূপ মহাপুরুষের কৃপা পেতে পারি। এইরূপে সকলেই একবার আশা আবার আশঙ্কা, একবার বিশ্বাস আবার সন্দেহ নিয়ে উৎকণ্ঠিত ভাবে সময় কাটাচ্ছেন। কিন্তু তাদের বেশিক্ষণ এই উৎকণ্ঠা ভোগ করতে হলো না। যথাসময়ে মহারাজ নিজগুণে সকলকে কৃপা করলেন। আমিও সেই সঙ্গে তাঁর কৃপা পেলাম।

পরক্ষণেই আমার সর্বাঙ্গে শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে কি যেন এক ভাব-স্রোত প্রবাহিত হলো। ঐ স্রোত আমাকে যেন কোথায় নিয়ে চলল। মন

যেন ক্রমশ উন্নত স্তরে উঠতে লাগলো। মনে হলো যে মস্তক আজ মহারাজের শ্রীপাদপদ্মে বিক্রীত হলো, এ মস্তক আর কারো নিকট যেন নত না হয়। এই মস্তিষ্কে যেন আর কখনো কোন কুচিন্তা স্থান না পায়। যে কর্ণ আজ মহারাজের বাক্য শুনে শুদ্ধ হলো সেই কর্ণ যেন আর কখনো কোন কুকথা শুনতে না পায়। যে চক্ষু আজ মহারাজকে দেখে কৃতার্থ হলো সে চক্ষু যেন আর কুদৃশ্য না দেখে। যে হস্ত আজ মহারাজের পাদস্পর্শ করে ধন্য হলো সে হাত যেন আর কখনও কোন কুকাজ না করে। আজ হৃদয় যাঁকে আসন দিল সে হৃদয়ে যেন আর কারো স্থান না হয়। এইরূপে সেদিন আমার মনোমধ্যে এক যুগান্তর উপস্থিত হলো। এইরূপ ভাবান্তরে আমার নিজের কিছু ব্যক্তিত্ব, কর্তৃত্ব বা বিশেষত্ব নেই, এসবই তাঁর অনন্ত শক্তির প্রভাব, এসব তাঁরই অহৈতুকী কৃপার ফল।

এভাব কেবল আমার একলার হয়নি, যতদূর জানতে পেরেছি তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তমাত্রেরই মনে সে দিন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল। এমন কি তাঁর কৃপাপ্রাপ্ত ভক্ত ব্যতীত অন্য যেসব লোক সেদিন আশ্রমে উপস্থিত ছিল তাদের মনেও একটা আনন্দের উৎস ফুটে উঠেছিল। এইরূপ মহানন্দে দিন কাটতে লাগল। এদিকে অপরাহ্নে খোকা মহারাজের সঙ্গী জিতেন মহারাজ নামক জনৈক সন্ন্যাসী ভক্ত শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর লীলা সংক্রান্ত গান ধরলেন—হারমোনিয়াম সংযোগে মধুর কণ্ঠে গাইতে লাগলেন—

“এমন মধু মাখা হরিনাম নিমাই কোথা হতে এনেছে।
নাম একবার শুনে হৃদয় বীণে অম্নি বেজে উঠেছে ॥
বহুদিন শ্রবণে শুনেছি ঐ নাম কভু তো এমন করেনি পরাণ।
আজি কি যেন কি এক নব ভাবোদয় হৃদয় মাঝারে হতেছে ॥
কেটে গেছে বিষম নয়নের ঘোর গলে গেছে কঠিন হৃদয় মোর।
আজি কি যেন কি এক উজ্জ্বল জগতে আমায় নিয়ে চলেছে ॥
আজ হতে নিমাই তোর সঙ্গে রবো জ্ঞানের গরব আর না করিব।
আজ সব ছেড়ে দিয়ে হরি হরি বলে নাচিতে বাসনা হতেছে ॥

কে যেন কহিছে মোর কানে কানে তোর পারের উপায় হলো এত দিনে।
আজ প্রেমের পসরা ধরি নিজ শিরে প্রেমের ঠাকুর এসেছে ॥''

একটির পর একটি গান হচ্ছে, আর তা শুনে শ্রোতাদের হৃদয়ে প্রত্যেকটি তার ঝঙ্কার দিয়ে উঠছে। এমন সময়োপযোগী গান হচ্ছে যে গানের প্রত্যেকটি পদ মনের ও ভাবের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। আজ তাদের মনে হচ্ছে যেন গৌর-নিতাই দুভায়ে একাধারে খোকা মহারাজ রূপে অবতীর্ণ হয়ে নাম বিলাচ্ছেন, কৃপা বিতরণ করছেন।

তিন চার দিন উক্ত আশ্রমে থেকে সরল ভাষায় ভক্তদের নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের লীলা ও বিবিধ ভাবপূর্ণ বহু গল্প বলে এবং নানাপ্রকার উপদেশ দানে এই নব নবদ্বীপের অধিবাসীদিগকে এক স্বর্গীয় আনন্দের অধিকারী করে রেখে খোকা মহারাজ ঢাকা রওয়ানা হলেন।

আমরা একটি পালকিতে করে তাঁকে পাথুরিয়াঘাটা স্টিমার স্টেশন পর্যন্ত কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিলাম। পথে তিনি পালকিতে বসে বসেই হাসির গল্প বলে আমাদিগকে হাসিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ''যারা পালকি বয়ে নিয়ে যায় তাদের মধ্যে দুজন সামনে থাকে, তারা বলে 'শালার বড় ভার রে'। আর পেছনে যে দুজন থাকে তারা জবাব দেয়, 'হুঁ হুঁ হুঁ'।'' পথে এমনি ফুর্তি করে আমাদের এমন আনন্দে রেখেছিলেন যে আমরা পালকি বইতে কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ করতে পারিনি। তারপর আমাদের আশীর্বাদ করে পাথুরিয়াঘাটা থেকে স্টিমারে ঢাকা রওয়ানা হলেন।

পাঁচ বৎসর পরে ১৩৩৬ সালের ২৭ কার্তিক বুধবার উত্থান একাদশী তিথি (ইং ১৩ নভেম্বর ১৯২৯)। আজ খোকা মহারাজের জন্মদিন উপলক্ষে বাগবাজার কলকাতা শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ি 'উদ্বোধনে' বহু ভক্তদের সমাগম। তাঁর জীবদ্দশায় এই উৎসবে যোগদান করার আমার প্রথম সুযোগ হয়। তিনি স্নানাদির পর দ্বিতলে তাঁর থাকবার ঘরের মাঝখানে দরজার দিকে মুখ করে শয্যার ওপর উপবিষ্ট। ঘরটি অত্যন্ত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, জিনিস-পত্রগুলি সুশৃঙ্খল ভাবে সাজানো। তাঁর দুই পাশে দুটি ফুলের তোড়া শোভা পাচ্ছে।

ভক্তগণ এসে তাঁকে ভক্তিভরে প্রণাম করছেন। কেহ বা করপুটে দূর্বা-পুষ্প-পত্রাদি লয়ে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে অঞ্জলি দিচ্ছেন। এইরূপে ভক্তগণ নিজ নিজ মনোবাসনা পূর্ণ করছেন।

এমন সময় তাঁর সেবক এসে অনুরোধ করতে সকলেই একটু সরে মহারাজের দিকে মুখ করে অর্ধমণ্ডলাকারে বসে তাঁর দিকে চেয়ে রইলেন। সেবক নিজ হাতে অতি যত্নের সহিত নানাপ্রকার ব্যঞ্জন ও মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করেছিলেন। সেসব ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে তাঁর সম্মুখে সাজিয়ে রাখলেন ও তাঁকে আহার করতে অনুরোধ করলেন। মহারাজ এত খাদ্য সামগ্রীর আয়োজন দেখে মধুর হাস্যে সকলকে আনন্দিত করে বলে উঠলেন—"আচ্ছা, রোজ রোজ এমনি তৈরি করে খেতে দিও দেখি।" "হাঁ মহারাজ আপনি খেয়ে সহ্য করতে পারবেন তো, রোজই আপনাকে এমনি তৈরি করে দেবো।" (সেবকের এরূপ বলার কারণ খোকা মহারাজ এ সময়ে মোটেই সুস্থ ছিলেন না।)[১]

তারপর তিনি ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে হাত দিয়ে বালকের ন্যায় 'এটা কি, ওটা কি' জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। সেবক একটির পর একটি ব্যঞ্জনের নাম বলে কি দিয়ে তৈরি তাও বলে দিতে লাগলেন। তিনি শিশুর মতো আঙুল দিয়ে জিহ্বাগ্রে এক একটি জিনিস চেখে দেখতে লাগলেন। কখনও এটা থেকে একটু আবার ওটা থেকে একটু মুখে দিতে লাগলেন। আমরা সকলেই তাঁর খাওয়া দেখতে লাগলাম। তাঁর খাওয়ার এরূপ ভাবভঙ্গি দেখে একটি মহিলা আবেগ ভরে বলে উঠলেন, "মহারাজ যে খাচ্ছেন, মনে হয় যেন গোপাল খাচ্ছে।" বাস্তবিক তাঁর শিশুর মতো খাবার ধরন দেখে আমারও ঐরূপ মনে হয়েছিল। কিন্তু আমি প্রকাশ করে বলিনি, শুধু নয়ন ভরে ঐ মনোহর গোপাল মূর্তি দেখছিলাম। মহিলাটির কথার উত্তরে মহারাজ ঈষৎ হেসে সম্মুখস্থ দরজার উপরি ভাগে দেয়ালে টাঙান একখানা গোপালের ছবি দেখিয়ে বললেন, "ঐ

---

১ সবেমাত্র অসুখ থেকে সেরে উঠেছেন। ইতঃপূর্বে আগস্ট মাসে জামতাড়ায় আমাশয় রোগে তাঁর প্রাণসংশয় হয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে বাগবাজার 'উদ্বোধনে' শ্রীশ্রীমায়ের আবাসমন্দিরে কিছুকাল ছিলেন—ইহা সেই সময়ের ঘটনা। —সঙ্কলক

যে উপর পানে চেয়ে দেখ গোপালের মূর্তি রয়েছে। ঐ যে গোপাল রয়েছেন।" আমরা সকলে তখন ঐ গোপাল মূর্তি চেয়ে দেখলাম।

তিনি রোগী বুঝে ঔষধ প্রয়োগ করতেন। যে লোকের পক্ষে যেরূপ উপদেশ প্রযোজ্য তাকে তিনি সেরূপ উপদেশ দান করতেন।

একবার একটি চিঠিতে আমি তাঁকে আমার কাজের বিস্তৃত বিবরণ জানিয়ে লিখেছিলাম, "মহারাজ আমি যে কাজ করি তাতে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে বাস করা একান্ত প্রয়োজন নচেৎ কাজের বিশেষ অসুবিধা হয়। অসৎ সংসর্গে থাকলে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা একরূপ অসম্ভব। এমত অবস্থায় আমাকে উপদেশ দিন, কোথায় এবং কিরূপে আমি সৎসঙ্গ পাই। উত্তরে তিনি লেখেন—"ভগবানের নামই সৎসঙ্গ তাহা জানিয়া রাখিবে।" তাঁর এই উপদেশে আমি নিশ্চিন্ত হলাম। কথা প্রসঙ্গে তিনি এ বিষয়ে আরও একটি উপদেশ দিয়েছিলেন, "আপনি ভাল তো জগৎ ভাল।" বাস্তবিক আমি আজ পর্যন্ত দেখছি যে, নিজে অন্যের সহিত ভাল ব্যবহার করলে অন্যের নিকট হতেও ভাল ব্যবহার পাওয়া যায়।

আর একবার একখানি চিঠিতে আমি আমার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও তৎসাধনে সাংসারিক বহুবিধ বাধা অভাব অশান্তি মনশ্চাঞ্চল্য উদ্বেগ নিরাশা ও পথভ্রষ্ট হবার আশঙ্কার কথা জানিয়ে তাঁর উপদেশ প্রার্থনা করেছিলাম। উত্তরে তিনি লেখেন—"ভগবানের উপর যে মন রাখিয়া চলে তাহার বেতালে পা পড়ে না—যেমন বাপ ছেলের হাত ধরিয়া চলিতেছে, সুতরাং ঠাকুরই তাহাকে রক্ষা করেন।" কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও একদিন মনের চঞ্চলতা দূরীকরণের উপায় সম্বন্ধে বলেছিলেন, "চঞ্চলতা মনের স্বাভাবিক অবস্থা। খুব বেশি করে ঠাকুরের নাম করবে, নাম জপ করতে করতে মন ক্রমশ স্থির হবে। জপ যত বেশি করবে ততই ভাল।"

বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যখন তাঁর ঘরে প্রবেশ করতাম, তিনি আমাকে দেখা মাত্রই অতি মধুর সম্ভাষণে বলে উঠতেন—"কে, শচীন এয়েছ, ভাল আছ তো?"

একদিন বেলুড় মঠের একজন বালকভক্তের সঙ্গে দোতলায় গঙ্গার দিকের বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। মহারাজ তখন বারান্দায় পায়চারি করছিলেন আর এক একবার তিনি যে ঘরে থাকতেন সেই ঘরে প্রবেশ করছিলেন। কি যেন ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বলে উঠলেন—"ঠাকুর বলতেন হাঁড়িতে যখন তরকারি সিদ্ধ হয় তখন আলু বেগুনগুলি মনে করে খুব লাফাচ্ছি, কিন্তু যখন জ্বাল টেনে নেওয়া যায় তখন সব চুপ; তখন বুঝতে পারে কার জোরে এতক্ষণ লাফাচ্ছিল। সংসারী লোকগুলিও এই আলু বেগুনের মতো। ঈশ্বরের একটু শক্তি পেয়ে খুব অহঙ্কার করে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। কিন্তু ভগবান যখন তাঁর শক্তি কেড়ে নেন তখন সব চুপ। তখন তারা বুঝতে পারে তাদের নিজের কোন শক্তি নেই, তাঁর শক্তিতেই সকলে শক্তিমান।"

একদিন বিকেলে কলকাতা থেকে রওনা হয়ে বেলুড় মঠে মহারাজের ঘরে প্রবেশ করে দেখি তিনি চৌকির ওপর বসে একজন ডাক্তার ভক্তের নিকট নিজ জীবনের অনেক কথা বলছেন ঃ

একদিন গ্রীষ্মকালে ঠাকুর তাঁর তক্তপোশের ওপর বিছানায় শুয়ে খোকা মহারাজকে কাছে ডেকে তার হাতে একখানা পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করতে বলেন। তদনুসারে মহারাজ ঠাকুরের তক্তপোশের পাশে দাঁড়িয়ে ঠাকুরকে বাতাস করতে লাগলেন। অসুবিধা মনে করে ঠাকুর খোকা মহারাজকে তাঁর বিছানায় বসে বাতাস করতে বলেন। তাতে মহারাজ দ্বিধা বোধ করাতে ঠাকুর তাকে জোর করে নিজের বিছানায় বসিয়ে দিলেন। কতক্ষণ পরে তাঁকে নিজের বিছানায় শুইয়ে, পাখাখানা নিজের হাতে নিয়ে খোকা মহারাজকে বাতাস করতে লাগলেন। এইরূপ খোকা মহারাজের প্রতি ঠাকুরের অপত্য স্নেহের অনেক কথা শুনলাম।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজকে বলেছিলাম, "মহারাজ দিনের অধিকাংশ সময়ই বৃথা কাজে বাজে কথায় ও বাজে চিন্তায় চলে যায় খুব অল্প সময়ই ভগবানের নাম করি বা তাঁর বিষয় ভাবি। কোন দিন বা হেলায় হেলায় অমনি কেটে যায়। এমত অবস্থায় আমাদের উপায় কি হবে?" উত্তরে তিনি বলেন—

"ছেলেপিলের স্বভাবই কাদামাটি মেখে থাকা। মা তাকে ধুইয়ে কোলে তুলে নেন। তিনি ক্রমশ এসব কমিয়ে কোলে তুলে নেবেন। তাঁর সন্তান তিনিই রক্ষা করবেন।"

বেলুড় মঠে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেই তিনি জিজ্ঞেস করতেন—"ঠাকুর ঘরে গিয়ে ঠাকুর দর্শন করেছ? প্রসাদ পেয়েছ? মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করেছ?" আর তিনি ধর্ম সম্বন্ধে পুস্তকাদি পড়তে বলতেন; যেসব বই পড়লে মনে শান্তি আসে এরূপ বই পড়তে বলতেন।

সাংসারিক অভাব অভিযোগ ও নানাপ্রকার চিন্তা-ভাবনায় মন যখনই অত্যন্ত অশান্ত হতো তখনই আমি তাঁর সাথে দেখা করতে যেতাম। তাঁকে দেখলে ও তাঁর নিকট বসে তাঁর মুখের দুটো আশ্বাসের কথা শুনলে আমার সমস্ত অশান্তি দূর হতো আর আমি এক বিমল আনন্দ উপভোগ করতাম। এখনও তাঁর সেইসব কথা স্মরণ হলে মন গলে যায়, অনন্ত আনন্দসাগরে ভেসে বেড়ায়।

(২৯)
ও হে, এস তো

উমেশ চন্দ্র সেন

স্কুল জীবনে গুরুদাস বর্মন-কৃত 'শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত' পাঠের সুযোগ হয়। তাহাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সঙ্গে খোকা মহারাজের মিলন ও তাঁহার সরল সহজ কথাবার্তা—ঠাকুর কর্তৃক তাঁর বক্ষ স্পর্শের ফলে তাঁর কুণ্ডলিনীর জাগরণ—এসব কথা মনে বেশ রেখাপাত করে। তখন থেকেই খোকা মহারাজের প্রতি একটা আকর্ষণ অনুভব করি।

ঠাকুরের অন্তরঙ্গদের মধ্যে প্রথমে বাবুরাম মহারাজকেই সাক্ষাৎ দর্শন

লাভের সৌভাগ্য আমার হয়। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে দেশে অবসর যাপন করছি, এমন সময় আমাদের সৌভাগ্যক্রমে বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) কলমায় শুভাগমন করেন।

তারপর কলেজে পড়তে কলকাতায় এসে বেলুড় মঠে যাতায়াত। সেখানে শ্রীশ্রীবাবুরাম মহারাজের স্নেহ ও করুণা আমাদের হৃদয় মন অধিকার করে। খোকা মহারাজ তখন বাংলার বাইরেই থাকতেন—কদাচিৎ বেলুড়ে এলেও তাঁর সাথে আলাপের সৌভাগ্য হয়নি। আর তখন কৌতূহলী বা অনুসন্ধিৎসু মোটেই ছিলুম না—অতিশয় মুখচোরা ছিলাম।

মনে পড়ে একবার খোকা মহারাজ আমাকে বেলুড় মঠে ভিজিটার্স রুম থেকে 'ওহে, এসো তো' বলে ডেকে নিয়ে অন্যত্র রক্ষিত একটি থালা থেকে একভাগ হালুয়া নিয়ে খেতে বলেছিলেন। তখন তাঁকে চিনতুম না, আর বাস্তবিক বাবুরাম মহারাজ আমাদের মন এতটা অধিকার করে বসেছিলেন যে অন্য মহারাজদের সঙ্গে আলাপ করার আগ্রহও হতো না।

খোকা মহারাজকে বেলুড় মঠে বেশি দেখতে পাই মহাপুরুষ (শিবানন্দ) মহারাজের অধ্যক্ষতার প্রারম্ভ কাল থেকে। তখন তাঁর সঙ্গে আলাপের প্রয়াস পাই। কয়েকবার তাঁকে প্রণাম করে কাছে দাঁড়িয়েছি কিন্তু তিনি কোন কথা বলেননি। এইরূপে একদিন প্রণাম করে দাঁড়াতেই মনে হলো তিনি যেন প্রসন্ন। সেদিন কথাও বললেন—"মহাপুরুষ মহারাজকে চেনো, প্রেসিডেন্ট? তাঁর সঙ্গে আলাপ করো গে।" অর্থাৎ তিনি নিজে আলাপ করতে ইচ্ছুক নন। কাজেই তাঁর সঙ্গে আলাপ করার আশা ত্যাগ করতে হলো।

১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে গ্রীষ্মকালে খোকা মহারাজ কলমায় শুভাগমন করেন। আমি গরমের ছুটিতে কলকাতা থেকে দেশে গিয়ে কলমায় বড়বাড়িতে[১] খোকা মহারাজের সাক্ষাৎ পাই। প্রণাম করতেই বললেন, "তোমায় কোথায় দেখেছি মনে হয়।" আমি বললাম, "কলকাতায় থাকি মাঝে মাঝে বেলুড় মঠে যাই, মঠেই দেখে থাকবেন।"

১ ভূপতিবাবুদের বাড়ি

সেবার খোকা মহারাজ কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এবং ভূপতিবাবুদের বাড়িতে সপ্তাহকাল কাটালেন। এই সুযোগে তাঁর সঙ্গে আলাপ জমে উঠল। বধূঠাকুরানীর প্রেরণায় আমাদের বাড়িতে মধ্যাহ্নে আহারের জন্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করতে গেলাম। তিনি রাজি হলেন। পরে শুনলাম তিনি নাকি কলমার একজনকে বলেছিলেন—"ছেলেটি ভাল, ওদের বাড়ি যেতে হবে।"

অনেক পথক্লেশ দিয়ে তাঁকে আমাদের বাড়ি নিয়েছিলাম। হাঁটিয়ে নিতে সঙ্কোচ বোধ হলো কাছাকাছি পালকিও ছিল না; তাঁকে নৌকা করে নিলুম। তখন নৌকা-পথে একটু ঘুরে যেতে হতো বলে প্রায় চল্লিশ মিনিট সময় লেগেছিল। হাঁটা পথে বিশ মিনিটেই যাওয়া যেত। তাঁর যে নৌকায় চড়তে ভয়, সে কথা তখন জানতুম না। সুতরাং এই নৌকা-যাত্রাটা তাঁর পক্ষে অস্বস্তিকরই হয়েছিল, ফিরবার সময় পায়ে হেঁটেই ফিরলেন। পরে বলেছিলেন—"নৌকার কি দরকার ছিল, হেঁটেই যেতে পারতুম।" একজন ব্রহ্মচারী তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তিনি কিরূপ অনাসক্তভাবে খাওয়াদাওয়া করতেন, তার একটি দৃষ্টান্ত বলছি। খাওয়ার সময় আমার মা বললেন—"মর্তমান কলাটা রাখলেন কেন খেয়ে ফেলুন।" আমি বললাম, "অনুরোধ উপরোধের দরকার নেই, ওঁকে নিজের ইচ্ছামতো খেতে দাও।" মায়ের কথায় কলাটা ধরে ভাঙলেন, আবার আমার কথায় তা রেখে দিলেন।

খাওয়ার পর বিশ্রাম করলেন আমাদের বাহির-বাড়ির ঘরে। আমি খাওয়াদাওয়া সেরে গিয়ে তাঁকে একটু হাওয়া করতে আরম্ভ করলাম। তিনি বললেন, "হাওয়া থাক একটু তামাক খাওয়াও।" বেলা পড়লে ঘর ছেড়ে গাছতলায় বসলেন। সেখানে পাড়া-প্রতিবেশী দু-চার জন এসেছিলেন।

তারপর হেঁটে কলমা রওনা হলেন।

কলমায় বড়বাড়িতে থাকা-কালীন বড়বাড়ির পুকুর থেকে ছিপ দিয়ে প্রায় সাত সের ওজনের একটা রুই মাছ ধরে তাঁর সেবার জন্য দিয়েছিলাম।

বিনোদবাবুর মুখে শুনেছি কলমা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে থাকার সময় বৈকালে খোকা মহারাজ একটা আম গাছের ছায়ায় বসতেন সেই গাছটাকে একটা

কুমড়োর লতা জড়িয়ে ধরেছিল। সেটাকে লক্ষ্য করে খোকা মহারাজ বলেছিলেন, "এটা যে আমগাছটাকে নষ্ট করবে।" আশ্রমকর্তা বলেন, "এ গাছের আম ভারি টক।" তাতে খোকা মহারাজ বলেন, "সে কি এমন সুন্দর গাছটা এমন ছায়া দিচ্ছে!" বিনোদবাবু বলেন মহারাজ গাছটার দিকে অতি প্রসন্ন দৃষ্টিতে চেয়েছিলেন। সে গাছটার আম এখন ভাল হয়েছে। বাস্তবিক আমগুলি আর সেরূপ টক নেই, এখন খাবার যোগ্য হয়েছে।

এ যাত্রায় তিনি ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে কিছুকাল কাটিয়েছিলেন এবং বালিয়াটি সোনারগাঁ প্রভৃতি স্থানেও গিয়েছিলেন। এর পর তাঁর স্বাস্থ্য খারাপ হতে থাকে।

খোকা মহারাজের অসুখ যখন বাড়াবাড়ি বেলুড় মঠের লাইব্রেরি তখন বর্তমান বড় মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ছিল—এখন (১৯৭৭) সেখানে অফিস। সেখানে দোতলায় লাইব্রেরির পূর্ব দিকের ঘরে তিনি থাকতেন। সেখান থেকে পুরনো মঠবাড়ি গঙ্গা প্রভৃতি জানালা দিয়ে দেখা যেত। তাঁর অনুরক্ত ভক্তগণ মঠে রাত্রিযাপন করতে হলে তাঁর ঘরের পশ্চিম দিকের লাইব্রেরি ঘরের মেঝেতে শুতেন। একদিন মশারির মধ্যে বসে জপ করছিলাম। হঠাৎ বেশ একটা উদ্দীপনা এলো। কারণ কি ভাবছিলুম। পরে জানলুম খোকা মহারাজ ঐ সময়ে আমাদের ঘরে গিয়েছিলেন।

ছুটিতে দেশে যাব সেই সময়ে একদিনের কথাবার্তা মনে হয়। মহারাজ বললেন, "তুমি দেশে যাচ্ছ—মনে হয় তোমার সঙ্গে যাই। কলমায় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে কি হাওয়া, সামনে পুকুর আছে। সেখানে খুব হাওয়া খেতে পারবে তুমি। আশ্রমে খুব হাওয়া আর ভূপতির বাড়ির ছাদেও খুব হাওয়া।"

আমি বললাম—"ভূপতিবাবুদের ছাদের আর একটু ওপরে উঠলে পদ্মা দেখা যায়।"

মহারাজ বললেন, "পদ্মা তো দেখেছি।"

(৩০)

বঞ্চিত জীবনের আনন্দের স্রোত

শ্রীমতী চারুবালা গুহ

১৩৩০ সনে ঢাকায় খোকা মহারাজকে স্বপ্নে দর্শন করি। একদিন দুপুরবেলা খাওয়াদাওয়ার পর ঘুমিয়ে পড়েছি এমন সময় দেখি এক মহাপুরুষ আমাকে দীক্ষা দিচ্ছেন। পূর্বে কখনো আমি তাঁকে দেখিনি, কি প্রকারে দীক্ষা হয় তাও জানিনে। কিন্তু সেই শুভ মুহূর্তে তাঁকে জ্যোতির্ময় মহাপুরুষ রূপে দর্শন করে দীক্ষা গ্রহণ করে পরম শান্তি লাভ করলাম। স্বপ্ন ভেঙে গেলে কোথায় সেই মহাপুরুষ, তাঁর দর্শন লাভের জন্য আমার মন বড়ই অস্থির হলো। ভিতর থেকে কে যেন বলে দিল শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে তাঁর খোঁজ পাব। আমি বৌদিকে বললাম, আমি মঠে যাব। তিনি বললেন, বাড়িতে একটি লোকও নেই একা তোমায় কি করে পাঠাই। আমার মঠে যাওয়া হলো না।

সেদিন মঙ্গলবার। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সব ভক্তমেয়েরা গেণ্ডারিয়া পল্লিতে মিলিত হয়েছিলেন। সেখানে শনি-মঙ্গলবারে ঠাকুরের বই স্তোত্র প্রভৃতি পাঠ হতো। আমি মঠে যেতে না পেরে সেইখানেই গেলাম। গিয়ে শুনলাম ভাগ্যকুলে একজন বেলুড় মঠের সাধু মহারাজ এসেছেন। তিনি আগামী শনিবার ঢাকা আসবেন। শনিবার গিয়ে শুনলাম স্বামী সুবোধানন্দ ঢাকা-মঠে এসেছেন—আর তিনি আজ ফরাসগঞ্জ 'গৌরাবাস' নামক বাড়িতে এসেছেন। প্রিয়বালার মা বললেন—আজ বোধ হয় শনি-মঙ্গলবারের সৎসঙ্গ হবে না। কারণ আমাদের বাসার সকলেই দীক্ষা নিতে গৌরাবাস গিয়েছে। আমার মনে হলো তখনই তাঁকে দর্শন করতে ছুটে যাই; কিন্তু কি করি বাসায় বলে আসিনি, এদিকে সাড়ে চারটে বেজে গিয়েছে, হয় তো সেখানে গিয়েও তাঁর দর্শন পাব না। এই সমস্ত ভেবে আমার আর যাওয়া হলো না। মনে বড়ই দুঃখ হলো।

প্রিয়বালার মা বললেন—বোধ হয় আগামী মঙ্গলবার তিনি আমাদের বাসায় আসবেন।

আমি বাসায় চলে এলাম।

মঙ্গলবার মহারাজ আসবেন কি না ঠিক খবর জানবার জন্য সোমবার আবার প্রিয়বালাদের বাসায় গিয়ে শুনলাম মঙ্গলবার আসা স্থির হয়েছে।

মঙ্গলবার বেলা তিনটার সময় কিছু ক্ষীরের পিঠা তৈরি করে নিয়ে তাঁকে দর্শন করতে গেলাম। আমাকে দেখে প্রিয়বালার মা বললেন, "মহারাজ খাওয়াদাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করছেন। আপনি তাঁর জন্য যা এনেছেন ঠাকুরঘরে রাখুন ও সেইখানেই একটু বসুন।"

আমি ঠাকুরঘরে এক পাশে বসে আছি, এমনি সময় দেখি মহারাজ হাত মুখ ধুতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছেন। এ ঠিক সেইরূপ যেরূপে তিনি আমায় স্বপ্নে কৃপা করেছিলেন। এখন আমি আমার স্বপ্নদৃষ্ট গুরুমূর্তি সম্মুখে দেখলাম।

হাত মুখ ধোয়া হলে মহারাজ ঘরে গিয়ে বসলেন। আমিও ঘরে গিয়ে এক পাশে বসে আমার স্বপ্নের কথা ভাবতে লাগলাম। এই সময় মহারাজ প্রিয়বালাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই মেয়েটি কোথা থেকে এসেছে?" প্রিয়বালা উত্তর দিল—'ইনি এখান থেকেই এসেছেন। আপনাকে দর্শন করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। সর্বদাই সৎসঙ্গে আসেন। এই কথা শুনে মহারাজ আমার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। পরে বললেন—"চল তোমাদের মিটিং ঘরে যাই।" তিনি উঠলেন—মেয়েরা সকলে তাঁকে প্রণাম করলেন—আমিও প্রণাম করলাম। তিনি আমায় আশীর্বাদ করলেন, অস্ফুট স্বরে কি যেন বললেন—আমার সকল জ্বালার শান্তি হলো।

মহারাজ মিটিং ঘরে গিয়ে বসলেন। আমরা তাঁর গলায় মালা দিলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বই পড়া হতে লাগলো। কখন তাঁর ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ঠাকুর কি বলেছিলেন—এ সমস্ত কথা পড়া হচ্ছিল, তিনি মৃদু মধুর হাসছিলেন। পড়া শেষ হলো। আমরা স্তোত্র পাঠ করলাম।

এইবার মহারাজকে খেতে দেওয়া হলো। মেয়েরা যে যাহা এনেছিলেন দেওয়া হয়েছে। আমি যা নিয়েছিলাম খেয়ে বললেন, "ইহা কে করেছে?" প্রিয়বালা আমাকে মহারাজের কাছে নিয়ে গেল ও আমাকে দেখিয়ে বললেন, "চারুদিদি এই খাবার তৈরি করে আপনার জন্য নিয়ে এসেছেন।" তিনি আমার দিকে চেয়ে বললেন—"তুমি এই খাবার করেছ, কি করে তৈরি করেছ বলতো?" আমি তাঁর কাছে বসে সমস্ত কথার উত্তর দিলাম, তার খাওয়া শেষ হলো। সন্ধ্যা হলে মহারাজ গৌরাবাসে গেলেন। আমরা যার যার বাড়ি চলে এলাম।

ঢাকা ১৩৩০ সন বৈশাখ মাস, পুষ্পদোল। আমি সকালে স্নান করে দীক্ষার উপকরণ-সহ মঠে গেলাম। তখন বেলা দশটা। মহারাজ বারান্দায় পায়চারি করছিলেন। আমার গাড়ি দেখে নিকটে এসে আমায় নামিয়ে নিয়ে গেলেন ও একজন ব্রহ্মচারীকে বললেন, "এইসব জিনিসপত্র ঠাকুরের ঘরে নিয়ে যাও।" মহারাজ তার ঘরে গেলেন আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। একটু পরে তিনি ঠাকুরঘরে গেলেন তখন আমার প্রাণের মধ্যে কি ভাব হচ্ছিল, ভাষায় প্রকাশ করা অসাধ্য। কিছুক্ষণ পরে মতি মহারাজ আমাকে ঠাকুরঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। মহারাজ আমাকে আসনে বসতে আদেশ করলেন। আমি বসলাম।

মহারাজ কৃপা করে দীক্ষা দিলেন। আমার প্রাণ শীতল হলো।

আমি মহারাজের জন্য একখানা রুমাল নিয়ে গিয়েছিলাম। তিনি ঠাকুরঘর থেকে বের হবার সময় সেখানা দেখলেন ও হাতে করে বের হয়ে এলেন। আমি তার পিছু পিছু তার ঘরে এলাম। তিনি মতি মহারাজকে বললেন, "আমি অনেক লোককে দীক্ষা দিয়েছি কিন্তু ওকে দিয়ে প্রাণটা যেমন ঠাণ্ডা হলো এমন আর হয়নি।"

মতি মহারাজ বললেন, "এ কার ভগিনী জানেন তো? হরেনবাবুর[১] বোন। এর ওপর ঠাকুরের বিশেষ কৃপা।" মহারাজ আমাকে বললেন—'দীক্ষা নিয়ে মঠে প্রসাদ পেতে হয়। আজ এখানে থাকবে।"

১ হরেন্দ্রকুমার নাগ, শ্রীশ্রীমায়ের শিষ্য।

১৩৩৩ সন, ৯ জ্যৈষ্ঠ। কলকাতা সিমলা স্ট্রিট, সন্ধ্যাবেলা আমি ঠাকুরঘরে আরতি শেষ করে বের হলে আমার বৌদি (হেমচন্দ্র নাগ মহাশয়ের পত্নী) বললেন—"মহারাজ এসে প্রাণেশবাবুর ঘরে বসে আছেন।" আমি শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সেই ঘরে গিয়ে মহারাজকে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বললেন, "ভাল আছ তো? আমি এসে দেখলাম তুমি ঠাকুরের আরতি করছো, তাই এখানে বসে আছি। তোমার সঙ্গে দেখা না করলে তুমি আবার দুঃখ করবে আমাকেও দুঃখ দেবে।" প্রাণেশবাবু বললেন, "দেখ দেখি তোমার কেমন সৌভাগ্য—ঠাকুরের আরতি করে গুরুপ্রণাম করতে পেলে।"

আমি মহারাজকে হাওয়া করতে লাগলাম।

মহারাজ এখানে জলযোগ করবেন। হেমদাদার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ গিয়েছিলেন—সেখানে কি ঠাকুর আছেন?" তিনি বললেন—"মহাদেব আছেন, সেতুবন্ধ আছে। আমি ওদেশে (দক্ষিণ দেশে) কিছুদিন ছিলুম। ওখানে ভয়ানক মশা। অত বড় মশা আমি কোথাও দেখিনি। একদিন রাতে আমি ধ্যান করতে বসেছি—দেখি আমার সর্বাঙ্গ মশায় ঢেকে গিয়েছে আমার ভ্রূক্ষেপ নেই। তারপর দেখি আমার পাশে দুটি খুব বড় সাপ একটু পরে একটি কালোপানা মেয়ে এসে আমায় হাওয়া করে মশা তাড়িয়ে দিতে লাগলো। তারপর সাপ দুটি আমার চারিদিক ঘিরে ফেললো। আমি ধ্যান করতে লাগলাম। রাত কেটে গেল। সে সাপ বা স্ত্রীলোক কোথায় আমি তা জানিনে।"

এই সময় হেমদাদা বাসায় এলেন। মহারাজের জলযোগান্তে হেমদাদা বললেন—"এইসব খাবার চারু তয়ের করেছে।" তিনি বললেন—"আমি খুব সন্তুষ্ট হলাম। ওকে সর্বদা কাজে রেখো, কখনো বসিয়ে রেখো না। আজ আমি এর কাছে অনেক কথা বলেছি।"

তারপর মহারাজ অদ্বৈত আশ্রমে চলে গেলেন।

১৩৩৩ সন ৩ আষাঢ় বেলা দশটা। হেমদাদা খেয়ে অফিসে যাবেন, এমন

সময় মহারাজ এলেন। দাদা মহারাজকে প্রণামান্তে বললেন—"আপনি উপরে গিয়ে বসুন।" আমাকে বললেন, "তুমি উপরে মহারাজের কাছে যাও।" আমি উপরে গিয়ে দেখি মহারাজ বসেননি। স্বামীজীর ভাই মহিম দত্ত মহাশয় আমাদের বাসায় শুতেন। তাঁর বিছানা দেখিয়ে মহারাজ প্রাণেশবাবুকে জিজ্ঞেস করছেন—"এ কার বিছানা?" প্রাণেশবাবু বললেন—"মহিমবাবুর।" মহারাজ নিজ হাতে বিছানাটি উঠিয়ে অন্য জায়গায় রেখে দিলেন। তখন আমি নতুন বিছানা করে দিলাম। তিনি বসলেন। তিনি বললেন—"ঠাকুর আমাদের কারু সঙ্গে খেতে বা শুতে দিতেন না।"

১৩৩৩ সন ৬ অগ্রহায়ণ কলকাতা।

সিমলা স্ট্রিটের বাসায় মহারাজকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। তিনি এখন অদ্বৈত আশ্রমে আছেন। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বাসায় এসে বললেন—"তোমরা যদি সকাল সকাল জোগাড় করে দিতে পার তো কাল খেতে পারবো। কাল আমার একটু কাজ আছে।"

সেদিন তিনি নিজের অনেক কথা বলেছিলেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম ঠাকুরের দেহরক্ষার সময়ে আপনি কোথায় ছিলেন। তিনি বললেন, "এখানেই ছিলুম। পরে রাখাল মহারাজের সঙ্গে দেশ ভ্রমণে বের হলাম। তখন মনের এমন অবস্থা যে প্রাণ থাক কি যাক। হাঁটা পথে কাশী গিয়েছি। পথে ক্লান্ত হয়ে গাছতলায় শুয়ে পড়েছি।" রাখাল মহারাজ বলতেন, "খোকা তোর পরিশ্রম হয়েছে?" আমি কিছু বলতাম না। রাখাল মহারাজের সঙ্গে বৃন্দাবনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কাছে যাই। গোস্বামী মহাশয় আমাদের দেখে খুব খুশি হলেন, খুব আদর যত্ন করে খাওয়ালেন। রাখাল মহারাজ খাটে শুলেন—আমি তাঁর পাশে নিচে শুলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি রাখাল মহারাজ বসে আছেন ও খুব বড় বড় দুটি ভয়ানক কুকুর ভীষণ ঝগড়া করছে। তখন অনেক রাত। পরদিন রাখাল মহারাজ বললেন, "খোকা তুই ভয় পেয়েছিলি?" আমি বললাম, "না।"

তখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী রাখাল মহারাজকে বলেছিলেন, "আপনাকে

ঠাকুর বড় ভালবাসতেন, আপনারা ঠাকুরের সন্তান, আপনাদের দেখে ধন্য হলাম।”

মহারাজ দাঁড়ালেন। আমরা সকলে প্রণাম করলাম। তিনি অদ্বৈত আশ্রমে গেলেন।

১৩৩৪ সন বৈশাখ মাস সকাল সাতটা। প্রাণেশবাবুর সঙ্গে গঙ্গাস্নান করতে এসেছি। মহারাজ স্টিমারে যাচ্ছেন। আমাদের দেখেছেন। আমিও পরে তাঁকে দেখলাম। তিনি কি যেন বললেন বুঝলাম না। স্টিমার আহিড়ীটোলা ঘাটে গেল। আমি প্রাণেশবাবুকে বললাম—“মহারাজ ঐ স্টিমারে আছেন।”

মহারাজ আহিড়ীটোলা ঘাটে নেমে আমাদের কাছে এসে প্রাণেশবাবুকে বললেন, “চারুকে আমি মঠে নিয়ে যাচ্ছি।” স্টিমারে বসে অনেক কথা হলো। আমি বললাম, “মহারাজ ধ্যান-জপ করতে বসলে মন চঞ্চল হয় কেন?” তিনি বললেন—“যখন মন চঞ্চল হয় জপ-ধ্যান ছেড়ে স্তব পাঠ করো—রামনাম কীর্তন করো ঠাকুরের কথামৃত, লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ করো। ধ্যান করতে করতে অভ্যাস হলে দেখবে ক্রমেই মনস্থির হয়ে আসবে।” আমি বললাম—“মন কি করে একাগ্র হবে?” তিনি বললেন, “সব ছেড়ে দিয়ে তাঁকে ডাকো, জপ-ধ্যান কর, তবেই মন একাগ্র হবে।”

এদিকে স্টিমার শিবতলা এল। মহারাজ আমাকে বললেন—“এখান দিয়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি যাওয়া যায়। এই দক্ষিণেশ্বরে একদিন ঠাকুরের কাছে এসেছি—তিনি নিজ হাতে আমাদের প্রসাদ দিলেন, আমরা প্রসাদ গ্রহণ করে তাঁর কাছে অনেকক্ষণ বসে তাঁর কথা শুনলাম। তারপর বাসায় ফেরার জন্য দাঁড়িয়েছি, তিনি জিজ্ঞেস করলেন—“তোর কাছে পয়সা আছে?” আমি বললুম—নেই। তখন তিনি মাস্টারমশাই ও অন্য ভক্তদের বললেন—“তোমরা এর ভাড়াটা দিয়ে দিও।”

তারপর আমরা বেলুড় মঠে এলাম। মহারাজ আমাকে ঠাকুরঘরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেলেন। কিছু পরে আমাকে ডেকে পাঠালেন ও নিজে গঙ্গাস্নান করে এসে আহারান্তে আমার হাতে প্রসাদ দিলেন ও নিচে খেতে

পাঠিয়ে দিলেন। বিকালে আমাকে ডেকে আমার হাতে তাঁর জামা ধুতি জুতো দিয়ে বললেন—"এই জুতো পরে আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছি তুমি নাও।"

পাঁচটার স্টিমারে তিনি আমাকে সঙ্গে লয়ে সিমলার বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তিনি যখন যেখানে থাকতেন সর্বদা আমাকে নানা উপদেশ-পূর্ণ পত্র দিতেন।

(৩১)

যতক্ষণ না জানছিলে ততক্ষণ ভয়

স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ

[বেলুড় মঠের সন্ন্যাসী স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ তদীয় দিনলিপিতে পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। তাহারই প্রতিলিপি দৃষ্টে এই সঙ্কলন। ইহাতে কতকগুলি প্রয়োজনীয় তারিখ ও কথোপকথনের হদিশ মিলবে যাহা ভবিষ্যৎ জীবনী লেখক ও গবেষকের প্রয়োজনে আসিতে পারে। —সঙ্কলক]

তারিখ ২০-৩-২৪ খ্রিঃ, স্থান বেলুড় মঠ

খোকা মহারাজ কথাপ্রসঙ্গে মহাপুরুষ মহারাজকে বলেন—"ভুবনেশ্বরে দুর্গাপদ বললে—কে একজন ডেপুটি বেশ ভক্ত, বেলা এগারটা অবধি পূজা করছে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তার অফিস দেখতে এসেছে, এদিকে সে পুজোতে মজে আছে। সাহেবকে নাকি সেই ডেপুটির মতো একজন লোক এসে কাগজপত্র দেখালে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব খুশি হয়ে মন্তব্য লিখে গেছে; ডেপুটি তখন নিজ বাসায় ঠাকুরঘরে। যখন তার হুঁশ হয়েছে অমনি দৌড়ে অফিসে এসেছে। আরদালি বললে, "বাবু, তুমি এই এসে কাগজপত্র সব দেখিয়ে গেলে আবার এসেছ কেন?" ডেপুটি আবার ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করলে। সেও

বললে, আবার এসেছ কেন? তখন কি একটা কথা জিজ্ঞেস করে বাড়ি এসে স্তম্ভিত হয়ে বসে বসে ভাবছে আমি তো যাইনি, তবে ইষ্টদেবই এরূপভাবে আমায় রক্ষা করতে গিয়েছিলেন। এই ভেবে সেই ডেপুটি সেই দিনই কাজে ইস্তফা দিলে।"

শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজ—"এইরকম যে রঘুনাথ দাসের হয়েছিল—কোথাও রামায়ণ হলে সকল কাজ ফেলে তার শুনা চাই। সৈন্য বিভাগে কাজ করতো। একদিন গিয়েছে রামায়ণ শুনতে কোথায় তার হুঁশ নেই। ফিরে এসে দেখে তার ডিউটির (Duty) প্রহর চলে গিয়েছে। তখন সে ওপরওয়ালার কাছে মাপ চাইতে যায়। ওপরওয়ালা বললে, 'আমি নিজে এসে দেখলুম তুমি তোমার পালা মতো ডিউটি দিয়ে গেলে।' রঘুনাথ ভাবলো—আমি তো আসিনি তবে রঘুবীরই এ কাজ করেছেন। এই বলে সেই দিনই চাকুরি ছেড়ে দিলে।"

তারিখ ২৪ মার্চ, ১৯২৪ খ্রিঃ

মাধবানন্দ স্বামী শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী লেখা সম্বন্ধে কতকগুলি তারিখ ও অনেক সংবাদ জেনে নিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর ক-বার তীর্থে যান—তাঁর লীলাসঙ্গিগণ কে কখন তাঁর নিকট যান ইত্যাদি। প্রায় দেড় ঘণ্টার ওপর এইসব আলোচনা শুনলাম। শরৎ মহারাজ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর মাসে প্রথম শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শন করেন। সে বৎসর ডিসেম্বরে বাবুরাম মহারাজ এনট্রান্স পরীক্ষা দিলেন। শরৎ মহারাজ তখন কলেজে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণিতে পড়েন। শশী মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও হরিপ্রসন্ন মহারাজ একশ্রেণিতে পড়তেন। তাঁহারা ১৮৮১-৮২ খ্রিস্টাব্দে এনট্রান্স পাশ করেন। শরৎ মহারাজ সেন্টজেভিয়ার্স কলেজে পড়তেন। তিনি বাবুরাম মহারাজকে হাতে কালি ও অন্যান্য স্থানে কালির দাগ দেখে জিজ্ঞেস করেন—"কি মশায় কোত্থেকে এলেন?" শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ যায় রাত্রি প্রায় একটা হবে। সেদিন চন্দ্রেতে যেন কি একটা গোলাকার আলো পড়ে। পুষ্পবৃষ্টিও হয়েছিল।

২২ এপ্রিল ১৯২৪ খ্রিঃ

কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় তাঁদের বাড়িতে (হাড়িয়ায়) খোকা মহারাজকে নিমন্ত্রণ করেন এবং এক সভা আহ্বান করেন—একশতের মতো স্থানীয় ভদ্রলোক উপস্থিত হন।

সভায় শিশু হস্তামলকের [শংকরাচার্যের শিষ্য] কথা হয়। সংসারে কিরূপে থাকতে হয় সে কথাও হয়। মহারাজ বলেন সংসারে ভগবানের নামরূপ খুঁটি ধরে থাকতে হয়। ভক্তি ও বিশ্বাস চাই। গুরুতে বিশ্বাস না হলে কিছুই হবে না। কোনরূপ বাসনা না থাকলে—সেই বিশ্বাস বা ভক্তিতেই ভগবান লাভ হয়। ছুঁচের ভিতর সুতো ঢুকাতে গেলে যেমন একটু ফেঁসো থাকলে হয় না, সেইরূপ যে মনে কোনরূপ বাসনা আছে সে মন ভগবানের রাজ্যে ঢুকতে পারে না। একাগ্রতা চাই—একাগ্র না হলে কিছুই হয় না।

৪ জুন ১৯২৪ খ্রিঃ [স্থান অনির্ণীত]

শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্তগণের কথা উঠায় পূজ্যপাদ খোকা মহারাজ বলেন—"স্বামী বিবেকানন্দ ব্যায়াম করতেন, রাখাল মহারাজ কুস্তি করতেন। তাঁর সঙ্গে কেউ পারতো না। স্বামীজী কলায়ের ডাল ও পুঁইশাক হলে খুব ভাত খেতে পারতেন। গোপালের মাকে শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, সে ফলওয়ালি হয়ে যশোদার বাড়িতে ফল বিক্রি করতে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে কোলে করেছিল। রাখাল মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের খেলার সাথি ছিলেন। শরৎ মহারাজ (স্বামী সারদানন্দ) ও শশী মহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) যিশুখ্রিস্টের সঙ্গী ছিলেন। বলরামবাবুকে ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গের কীর্তনের দলে দেখেছিলেন। বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দ) নাকি শ্রীমতী রাধার অংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

(রায় বাহাদুর শরৎ কিশোরের সহিত কথোপকথন)

"পশুতে আর মানুষে তফাত—একটা পশু বাগানে ঢুকে গাছ খেলে তাড়িয়ে দিলেও আবার আসে কিন্তু মানুষ আসবে না, কারণ মানুষের বুদ্ধি আছে।"

"যার যেমন মন—একটা চোর সারারাত জেগে চুরির কোন সুবিধে করতে পারলো না। রাস্তার ধারে এক গাছতলায় পড়ে ঘুমুচ্ছে। আর একটা চোর ওকে দেখেই চিনে ফেললো আর বলতে লাগলো—'শালা কিছু জোটে নাই তাই পড়ে পড়ে ঘুমুচ্ছিস।' তারপর এক মাতাল সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল ঢুলতে ঢুলতে। সে চোরটাকে মাতাল ঠাউড়ে বলছে—'শালা এত মদ খেয়েছে যে আর সামলাতে পারেনি, তাই পড়ে আছে। আমি বেশ সামলে নিয়েছি।' এক সাধু ভাবাবেশে সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে। সে চোরটাকে দেখে বলছে—'আহা! ভক্তটি সমাধিস্থ হয়ে পড়ে আছেন।' যার যেমন মন সে তেমন দেখে।"

১৫ সেপ্টেম্বর ১৯২৪ খ্রিঃ, ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণমঠ

—বাবু ঢাকার অধ্যাপক। কয়েকদিন 'জ্ঞানযোগ' পড়ছেন কিন্তু মায়া সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করতে পারছেন না। এই 'মায়া' সম্বন্ধে তাঁর খোকা মহারাজের সঙ্গে আলোচনা হতো। আজ সন্ধ্যারতির পর জপাদি করে খোকা মহারাজ যে ঘরে শুতেন তার অপর পার্শ্বে অধ্যাপক নিজ বিছানায় বসার পর খোকা মহারাজ অধ্যাপকের একটু শয়ন করার ইচ্ছা দেখে তাকে মশারি খাটিয়ে শুতে বললেন। এই সময়ে মঠের একজন ব্রহ্মচারী কোন কাজে দরকার হওয়ায় ঘরের আলোটি নিয়ে যায়। তখন অন্ধকারে উভয়ের মধ্যে 'মায়া' সম্বন্ধে আলাপ চলছে। মাথার দিকের জানালা খোলা দেখে খোকা মহারাজ বললেন—"শৈলেশ, জানালাটা খুলে শুলে—দেখো ভূতে লম্বা হাত না বাড়ায়।" "ভূত আবার কি?" বলেন অধ্যাপক। কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব। পরে মহারাজ অতি সন্তর্পণে নিজ বিছানা থেকে উঠে চুপি চুপি অধ্যাপকের শরীরে হাত বুলোতে লাগলেন। অধ্যাপক চমকে উঠে ভূতের ভয়ে হৈ হৈ করতে লাগলেন। তখন আর বেশিক্ষণ মহারাজ হাসি সম্বরণ করতে পারলেন না। অধ্যাপকের হুঁশ ফিরে এলে অনেকক্ষণ ধরে উভয়ে হাসি। তখন খোকা মহারাজ বললেন—"যতক্ষণ না জানছিলে ততক্ষণ ভয় ছিল—যাই জানলে আর ভয় নেই। এখন সত্যি সত্যিই ভূতে ধরলেও ভয় পাবে না। জগৎকে মায়া বলে যারা একবার

জানতে পেরেছে তারা কিছুতেই ভয় খায় না, সব মায়াই দেখে। যারা ওসব মায়া বলে জানতে পারেনি; তারা ভয় পায়।”

সোনার-গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, রাত সাতটা, ৬-১২-২৪ খ্রিস্টাব্দ

সন্ধ্যারতির পর খোকা মহারাজের কাছে মেঝেতে সব বসা হলো। উপস্থিত একজন কাজকর্মের কথা তোলায় মহারাজ বলেন—“কাজকর্ম না করে কি কেউ মানুষ হতে পারে? কাশী সেবাশ্রমে কাজ ছাড়া কোন কথা নেই—এমন কি ধ্যান-জপ পাঠ পর্যন্ত করার সময় দেয় না। আঠারো জন কর্মী ত্রিশ জন রোগীর সেবা করছে ইনডোরে (Indoor)। যদি কারু কিছু করতে হয় তো সে রাত্রিতে করে। গীতা পাঠ হয় অদ্বৈত আশ্রমে। ঘণ্টা বাজিয়ে দেয়, সকলের জন্য জগদানন্দ ক্লাস করে। কর্মীরা দিনরাত খাটে কেবল পাঁচটায় একটু বিশ্রাম করার সময় নেয়। যদি কেউ থাকে যার কাজে মন নেই বা ধ্যান-জপ করতে চায় তাকে তাড়িয়ে দেয়। কর্মে শরীর মন ভাল থাকে চঞ্চল হতে পায় না। মন স্থির না হলে কিছুই হবে না। কাশী সেবাশ্রমে হাড় ভাঙা খাটুনি দেখে অবাক হয়ে থাকতে হয়। ভুবনেশ্বরে একটি সাধুর ইচ্ছে কাশী যায় কাজকর্ম ছেড়ে। আমি বললুম, ‘যাচ্ছ না যে?’ সে বলে, ‘এই টাইম টেবল (Time Table) দেখছি।’ আমি বললুম—‘টাইম টেবল কেন? বৈরাগ্য যদি হয়ে থাকে বেরিয়ে যাও—হেঁটে চলে যাও।’ বলে—‘তা কি পারি?’ আমি বললুম, ‘না পার তো বাড়ি ফিরে যাও। দরজা খোলা। বে থা করগে—বেশ থাকবে।’ কোথায় কাজ নেই—আমরা কি কম কাজ করেছি? তপস্যায় বেরিয়ে আমি মহারাজের [স্বামী ব্রহ্মানন্দ] সঙ্গে অনেক দিন ছিলুম। বৃন্দাবনে মহারাজের স্নানের জল ও আমার স্নানের জল ঘড়া ঘড়া আমি নিজে তুলতুম যমুনা থেকে। আমাদের বেলা কত কাজ করেছি।”

৭ ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রিঃ, সোনার-গাঁ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ

সন্ধ্যারতির পর কৃষ্ণদাস, গোষ্ঠ, গোপাল, ললিত প্রভৃতি ভক্তগণ ও মঠের ব্রহ্মচারিগণ উপস্থিত। খোকা মহারাজ সকলকে কিছুক্ষণ নীরব দেখে

বললেন—“কারো জিজ্ঞাসা থাকলে বল, যা জানি বলতে পারবো। (ব্রহ্মচারী মহেশ চৈতন্যকে লক্ষ্য করে) তুমি যেন কি জিজ্ঞাসা করবে ভাবছো, কিছু থাকে তো জিজ্ঞাসা কর না?”

মহেশ চৈতন্য—“আচ্ছা মহারাজ, লাটু মহারাজের ‘সৎকথায়’ আছে পূর্বে খুব সাধন-ভজন দরকার। তা কাজ করতে গেলে সাধন-ভজন হয় কোথায়?”

খোকা মহারাজ—“লাটু মহারাজ বলতেন তাঁর উচ্চ ভাবের কথা। তিনি ঐ সাধন-ভজন ধ্যান-জপ ছাড়া আর কিছু করতে পারতেন না। তা বলে কি সবাইকে ঐরকম করতে হবে? তবে আর স্বামীজী এত সব কর্মের কথা বললেন কেন? কর্ম আগুতে করে না নিলে কি কেউ সাধন-ভজন করতে পারে?”

প্রশ্ন—“তবে সাধন-ভজন কখন করতে হবে টের পাব?”

উত্তর—“যখন তোমার সাধন-ভজন করার সময় আসবে তখন ভগবানই সেই ব্যবস্থা করে দেবেন। নিজে টের পাবে, যাদের সঙ্গে থাকবে তারাও কাজ থেকে অবসর দিয়ে কেবল সাধন-ভজন করতে দেবে। ঠাকুর বলতেন বৌ যখন পোয়াতি হয় শাশুড়ি আস্তে আস্তে কাজ কমিয়ে দেয়। যাদের অমন হয় তাদের খাওয়া-পরা দেহাত্মবুদ্ধি কিছু থাকে না, কোন চিন্তা ভয় থাকে না।”

প্রশ্ন—“যাদের সঙ্গে কাজ করি তাদের ওপর হিংসা হয় কেন, তারা কথা বললে মনে হয় স্বার্থপর কথা বলছে।”

উত্তর—“যে যতটুকু সুখ আয়েশ চায় সেটা না পেলেই হিংসা হয়। স্বার্থপর মনে করা ভুল। এখানে কার কি স্বার্থ আছে? যারা যেখানেই থাকুক না কেন, যখন যারই তলব হবে তখনই তাকে স্থানান্তরে যেতে হবে। করুণানন্দকে চিঠি পাঠানো হয়েছিল—তবুও যখন এল না, মঠ থেকে লোক গিয়ে তার নিজের মঠ থেকেও তাকে সরিয়ে দিলে।”

প্রশ্ন—“কত মনে হয় একবার কাশী যাব, বৃন্দাবন যাব, বেলুড় মঠ দেখিনি।”

উত্তর—"বেশ তো সময় যখন হবে একে একে সব হবে। অত ভেবে ভেবে মাথার অসুখ করে ফেলেছ। দেখ আরো খারাপ না হয়।"

গোপাল—"আচ্ছা মহারাজ, দীক্ষা কি কুলগুরু হতেই নিতে হয়—না অন্য কারু কাছ থেকেও নেওয়া যায়?"

উত্তর—"নেওয়া যাবে না কেন? যাঁকে গুরুর উপযুক্ত মনে করবে ঠিক ঠিক ভক্তি বিশ্বাস হবে তাঁকেই গ্রহণ করতে পার।"

ললিত—"আমরা তো সংসারে থাকি, মনস্থির করবার উপায় কি?"

উত্তর—"তাঁকে ডাকা ও কাতর প্রার্থনা করা। খালি শুনলে কি হবে? করব বলে ফেলে রাখলেই মুশকিল, তার আর হয় না। একজন সমুদ্র-স্নানে গিয়েছিল তা দাঁড়িয়ে বললে ঢেউটা গেলেই স্নান করে নেব। তা সমুদ্রের ঢেউও গেল না, তার স্নান করাও হলো না।

প্রশ্ন—"সংসারে নানা গোল, ঝগড়াঝাটি কত কি।"

উত্তর—"ঝগড়া না করলেই হলো।"

প্রশ্ন—"কি করে না করে থাকবো?"

উত্তর—"চুপ করে থাকবে। বোবার শত্রু নেই।"

জনৈক—"আপনার মহারাজ রাগ নেই। কোন দিনও রাগ করতে দেখলুম না।"

উত্তর—"আছে বই কি, ভেতরে থাকে, দাবিয়ে রাখি।"

প্রশ্ন—"গুরু কজন করা যায়?"

উত্তর—'দীক্ষাগুরু এক, শিক্ষা অনেকের কাছে নেওয়া যায়।"

৯ ডিসেম্বর ১৯২৪, সোনার-গাঁ

আজ সকালে খোকা মহারাজ কয়েকটি কথা বললেন—"বরিশালে যখন গিয়েছিলাম এক বৃদ্ধা, বয়স চৌষট্টি পঁয়ষট্টি হবে—জিজ্ঞেস করলে আমায়

প্রাণায়ামের কথা। আমি বললুম—অতসব আমি জানি না। আচ্ছা—মায়ের কাছে যেতে হলে কি কেউ নাক টিপতে টিপতে যায়, না এঁকে বেঁকে আসন করতে করতে যায়? আসন প্রাণায়াম—এসব হচ্ছে মনকে সেখানে যাবার জন্য, তৈরি করার জন্য, যে করে করুক। বৃদ্ধা শুনে ভারি খুশি। পরে বললাম—ভাল ভাল বই পড়বেন। বললে—হাঁ পড়ি। এ বই পড়ি ও বই পড়ি এইসব। আমি বললাম আপনার ছেলের চিঠিখানা যেদিন বিদেশ থেকেআসে তখন চিঠি পড়লে কি মনে হয়—ছেলের চেহারা তার সকল কথা মনে পড়ে নাকি? যে পড়ায় মনে ভগবানের স্মৃতি, তাঁর ভাব না মনে এনে দেয় তাতে কি হয় বা হবে? পাখির মতো পড়লে কিছুই লাভ নেই। শুনে বুড়ি খুব খুশি।"

১০-১২-২৪ খ্রিঃ, সোনার-গাঁ মঠ, বৈকাল

উপস্থিত আমিনপুরের ললিতবাবু, হামছাদী থেকে বীরেন সেন, পালামের কৃষ্ণদাস ইত্যাদি। খোকা মহারাজ মেয়েদের উপদেশ দিয়ে এসেই ললিতবাবুকে বললেন—"আপনি কলকাতা গিয়েছেন—বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর গিয়েছেন? পঞ্চমুণ্ডী, পঞ্চবটী দেখেছেন?"

ললিত—"আজ্ঞে হাঁ।"

খোকা মহারাজ—"শ্রীশ্রীঠাকুর যখন পঞ্চবটীতে সাধন করতেন ও কালীঘরে মা কালীর পুজো করতেন তখন পুজো করে এসেই একটা কাপড় মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকতেন। কারু সঙ্গে কথা কইতেন না। কেবল, মা দেখা দাও বলে কাঁদতেন। তখন মা এসে একদিন বললেন—এত ভাবছিস কেন? এই দেখ আমি আছি। এই তোর সঙ্গেই আছি, তোতেই মিশে আছি। বলে মা ঠাকুরের সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। ঠাকুরের ভাগনে ও সেবক হৃদয় মুখুয্যে যখন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতো তখন তিনি নাকি হাতে খাবার নিয়ে একা কার সঙ্গে কালীঘরে কথা বলছেন। মা যেন খাচ্ছেন—আবার মা বলছেন—'দেখি আমি তোর মুখ দিয়ে খাই।' ঠাকুর আরতি করতেন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেন—হয়তো পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে দাঁড়িয়েই আছেন। হৃদয় পঞ্চপ্রদীপ তাঁর

হাত থেকে নিয়ে আরতি শেষ করতেন। তখন অনেক সময় দেখা যেত ঠাকুরের ভাবসমাধি।

"একবার মথুরবাবুর জন্য চাকর তামাক নিয়ে যাচ্ছিল—সেই তামাক পোড়া গুল কি করে ভাবাবস্থায় ঠাকুরের পিঠের নিচে পড়ে যায়। সেখানটা পুড়তে পুড়তে গর্ত হয়ে ভিতরে ঢুকে যায়। তখন ঠাকুর বলছেন—'দেখতো পিঁপড়ে না কি কামড়াচ্ছে।' এর নাম 'ভাব'। দেহ-জ্ঞান থাকে না মাতালের মতো অবস্থা হয়। তাঁর কাছে গিয়ে 'ভাব' চিনেছি। আমাদের মধ্যেই কতজনার 'ভাব' আমি ছুঁচ ফুটিয়ে ভেঙে দিয়েছি।

"সাহেবরা কেমন তিন চার ঘণ্টা ধ্যান করে। এক ঘণ্টায় কত রোজগার করতে পারতো। ভগবানকে ডাকতে হয়। লোকে ভগবানকে ডাকে যখন বিপদে পড়ে, যখন ছেলের মরণাপন্ন অসুখ হয়, তখন হয় তো মা কালীকে পাঁঠা মানত করে। যাই সেরে যায়, তখন আর মনে থাকে না। যদি মনে পড়ে হয় তো বলবে, 'মাঠে কত পাঁঠা চরে খাচ্ছে, নে গে একটা।' একটা লোক মা কালীকে ডাকছে আর বলছে, যদি কিছু পেতুম অর্ধেক তোকে দিতুম আর অর্ধেক আমার থাকতো। একটা টাকাও যদি পেতুম তবে আট আনা তোকে দিতুম। যেতে যেতে হঠাৎ একটা আধুলি পেল। পেয়েই বলছে—তা তোর আট আনা আগুতেই তুই নিয়ে নিয়েছিস মা? বেশ হয়েছে। এই রকমই তো লোকের ভক্তি বিশ্বাস—কি হবে বলুন।"

বীরেনবাবুর একটি দশ বছরের মেয়ে তার সঙ্গে এসেছে। সে বলেছিল, "খোকা মহারাজকে দেখতে যাব।" তাকে কাছে নিয়ে খোকা মহারাজ বললেন—"বাড়ি গিয়ে কেমন খোকা দেখলি জিজ্ঞেস করলে কি বলবি? চুল পাকা খোকা, দাঁত পড়া খোকা?"

১৩-১২-২৪ খ্রিঃ বেলা তিনটা মহেন্দ্র সরকারের বাড়ি

দশ বারো জন ভক্ত-সহ খোকা মহারাজ উপস্থিত। সকলেই বসলেন। কীর্তনাদির পর সকলের অনুরোধে মহারাজ বলেন, "দক্ষিণেশ্বরে স্বামী

বিবেকানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন, 'জীবে দয়া নামে রুচি' এইতো ঠিক? ঠাকুর অমনি বললেন, 'দূর শালা, জীবে দয়া করবার তুই কে?' দুয়ারে যদি ভিখারি আসে, যেই তাকে কিছু দিতে পারবে, সে নিজেকেই ধন্য মনে করবে, নারায়ণকে সেবা করলুম ভেবে।"

প্রশ্ন—"সংসারে কি ভাবে থাকতে হবে?"

উত্তর—"বড়লোকের বাড়ির দাসদাসী যেমনভাবে থাকে। মুখে বলে ও আমার, সে আমার, অথচ ভেতরে ভেতরে জানে এরা তার কেউ নয়। সেইরকম সংসারের সকলে দুদিনের জন্য, একমাত্র ভগবানই আপনার। [নারায়ণগঞ্জে] দেওভোগে সাধু নাগমহাশয় ছিলেন এইরূপ আদর্শ গৃহী। তাঁকে দেখেছি, সর্বদাই কি একটা ভাব ভিতরে ভিতরে চলেছে, সর্বদাই ভগবদ্ভাবে তন্ময়। আর জীব মাত্রের ওপরেই কি ভক্তি। কারুর আগে যেতে পারতেন না। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা, অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'—এসব লক্ষণ তাঁতে প্রকাশ ছিল।"

মোগরা পাড়ার নায়েব—"আমরা যখন যে দেবতা দেখি তাকেই প্রণাম করি, ভক্তি করি। নিজের গুরু হয়তো এক দেবতা দেখিয়ে দিয়েছেন, এগুলো কি?"

মহারাজ—"বেশ তো সকলকে প্রণাম করা কিছু খারাপ নয়। যেমন এক পরিবারে স্ত্রীর শ্বশুর শাশুড়ি দেবর ভাসুর এই সকল থাকে। স্ত্রী সকলকেই ভক্তি করে সেবা করে। কিন্তু একমাত্র স্বামীর সঙ্গেই অন্যরকম ব্যবহার করতে পারে, বেশি কথা ও সঙ্গ লাভ করতে পারে।"

নায়েব—"গুরুদেব অনেক সময় মন্ত্র দিলেন। কি মানে কিছু জানি না, বুঝি না, এ মন্ত্র জপ করলে কি কোন কাজ হয়?"

মহারাজ—"কেন হবে না? ইষ্ট-নিষ্ঠা থাকলে সব হয়! ইষ্টের উপর বিশ্বাস থাকলে না হয় এমন কাজ নেই। একবার রাঁচিতে প্লে (নাটক) হয়েছিল। এক গুরু শিষ্য বাড়ি গিয়েছেন তার আবার টাকা-পয়সার উপর লোভ ছিল। সে

শিষ্যের ছোট ছেলেটির গলা টিপে মেরে তার গলার হার ও হাতের বালা নিয়ে পালাচ্ছে দেখে শিষ্যের স্ত্রী স্বামীকে তৎক্ষণাৎ খবর পাঠালো। শিষ্য এসে অবস্থা দেখে তাড়াতাড়ি দৌড়ে গিয়ে গুরুদেবকে ধরলে, বললে—'গুরুদেব যাবেন যান, কোন আপত্তি নেই কিন্তু যাবার সময় একটু পদধূলি দিয়ে যান!' এই বলে অনেক অনুরোধ করে তাকে বাড়িতে এনে গুরুর পদধূলি ছেলের মাথায় ও গায়ে দিয়ে বললে—'উঠো খোকা!' ছেলে তখনই উঠে দাঁড়ালো। জিজ্ঞাসা করায় বললে খুব ঘুমিয়েছিলাম। গুরু ভাবলে বেশ তো এক শক্তি হয়েছে। আর এক জায়গায়ও এমনি এক ব্যাপার করে পুলিশে বন্দি হয়েছে। তখন বললে—আচ্ছা আমি বাঁচিয়ে দিচ্ছি। নিজের পদধূলি সেই ছেলেটিকে দিল কিন্তু বাঁচলো না। তখন পূর্ব শিষ্যের কথা বলে তাকে ডাকিয়ে এনে সব বৃত্তান্ত খুলে বলাতে তখন আবার সেই শিষ্য গুরুর পদধূলি মরা ছেলেকে মাখিয়ে যাই বললে 'উঠো' অমনি এ-ছেলেও উঠে পড়লো। শিষ্যের অটল বিশ্বাস ও ইষ্টনিষ্ঠা আছে বলে সব হলো, কিন্তু গুরুর হলো না।

এক শিষ্য 'জয় গুরুদেব' বলে জলের ওপর দিয়ে চলে যেতে পারতো। তাই দেখে গুরুর মনে হলো বটে! ও যখন আমার নাম করে জলের ওপর চলে যায় তখন আমি পারবো না কেন? তখন সে 'জয় আমি' বলে যেই জলে চলতে গেল অমনি ডুবে গেল। লঙ্কায় সাগর পেরুতে গিয়ে রামনাম বলে হনুমান লাফিয়ে পেরুলো, কিন্তু রামকে সেতু বাঁধতে হলো।"

১৪-১২-২৪ খ্রিঃ, সোনারগাঁ মঠ, রবিবার

আজ বৈকালের ক্লাসে প্রায় ত্রিশ জন উপস্থিত। অনেকক্ষণ ভজন কীর্তনাদির পর প্রশ্নোত্তর।

স্থানীয় হাইস্কুলের শিক্ষক গোষ্ঠ বিহারী দাস প্রশ্ন করলেন—"শান্তি কি করে পাওয়া যায়?"

খোকা মহারাজ—"প্রত্যেকের মধ্যেই বিবেক বা সদসৎ বিচার বুদ্ধি আছে। যদি সৎকে ধরা যায়—অসৎ পরিত্যাগ করা যায় তবেই শান্তি পাওয়া যায়।"

প্রশ্ন—“আমরা বিবেক মেনে চলতে পারি না কেন?”

উত্তর—“সৎ ও অসৎ বুদ্ধি দুয়েতে লড়াই চলতে থাকে। যখন অসৎ বুদ্ধি প্রবল হয় তখনই লোকে অন্যায় করে। সৎ-বুদ্ধি যে আছে তার প্রমাণ হচ্ছে—খারাপ কাজগুলো লোকে গোপনে করে কারণ ‘ভাল নয়’ জ্ঞান রয়েছে।”

প্রশ্ন—“কিসে বিবেক হয়?”

উত্তর—“সদ্‌গ্রন্থ পাঠ—সৎচর্চা ও সৎসঙ্গ করলেই বিবেকের উদয় হয়। এতে শিগ্‌গির হয়—এতেই ক্রমমুক্তি।”

প্রশ্ন—“তবে না করলেও কেন হয়?”

উত্তর—“হয় বৈকি? ‘অদ্যৈব শতাব্দান্তে বা’—আজই হউক বা লক্ষ জন্ম পরেই হউক। আর মহাপ্রলয় কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকলে তো তখন সকলেই মুক্ত হয়ে যেতে পারে।”

১৫ ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রিঃ, হামছাদী গ্রাম

আজ খোকা মহারাজ বীরেন সেনের বাড়িতে আহারান্তে সুধীর দত্তের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করেন। পরে কীর্তন হয়। প্রায় শতাধিক স্ত্রী-পুরুষ সমবেত। তাহারা খোকা মহারাজের উপদেশ শুনতে আগ্রহ প্রকাশ করায় ‘সংসারে কিরূপে থাকতে হয়’ সেই সম্বন্ধে কিছু বলেন—

“বড়লোকের বাড়ির দাসদাসী যেমন সেই বাড়ির সকলকে তার কেউ নয় জেনেও আপন আপন করে—অথচ আপন বলতে বোঝে নিজের বাড়ির ছেলে মেয়ে—সেইরূপ একমাত্র ভগবানকেই আপন জন জেনে অন্য সবকিছুই নিজের নয় মনে করতে হবে।

সংসারে খুঁটি ধরে থাকতে হয়—ভগবানরূপ খুঁটি। ছেলেরা যখন ঘোরে একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ঘোরে আর পড়ে যায় না।

ভগবানকে আশ্রয় করে যে যেখানে যেভাবে থাকুকগে—তার কিছুই হয় না—খুঁটিই তাকে রক্ষা করে।”

১৬ ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রিঃ, দত্তপাড়া

সোনার-গাঁ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যসেবার দুগ্ধের অভাব। সেই জন্য একটি গাভি দেখতে যাবার জন্য খোকা মহারাজ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। আমরা ছয় সাত জন মহারাজের সঙ্গে দত্তপাড়া যাই এবং অক্ষয় কুমারের বাড়িতে গ্রামের লোক বসিবার স্থান করায় সেখানে বসা হয়। গ্রামের স্ত্রী-পুরুষগণ এসে ভক্তিপূর্বক প্রণাম করে। ক্রমে ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা হতে থাকে। আজও সংসারে কিভাবে বড়লোকের বাড়ির দাসীর মতো থাকতে হয় সে বিষয়ে কথা হয়।

একজন প্রশ্ন করেন—"যদি ভগবানের পথে কোন বাধা উপস্থিত হয় তবে কি করা?"

উত্তর—"বাধা মানবে কেন? ধর্ম পথে চলতে গিয়ে কাউকে অমান্য করতে হলে ওতে দোষ হয় না। তবে ওসব কিরকম জানো? ছেলেপুলে রাগ করে খাবে না—অমনি মনে মনে ভাবে একবার সাধিলেই খাব!"

প্রশ্ন—"আমাদের মন ভগবানের দিকে দিতে পারি না কেন?"

উত্তর—"কি করে পারবে? ছেলেবেলা থেকেই মনটাকে পাঁচদিকে ছড়িয়ে রাখা হয়েছে, এখন মন গুটিয়ে নেওয়া শক্ত।"

প্রশ্ন—"পাঁচদিকে ছড়ায় কে?"

উত্তর—"বাসনা, ভিতরে অসংখ্য বাসনা নানা দিকে নিচ্ছে।"

প্রশ্ন—"কি করে মন গুছানো যায়? কি করে ভগবানকে ডাকতে হয়?"

উত্তর—"ভগবানকে আপনার পিতা-মাতার মতো জ্ঞান করে ডাকতে হয়।"

১৮ ডিসেম্বর ১৯২৪ খ্রিঃ, সোনার-গাঁ মঠ

আজ শ্রীশ্রীমার জন্মতিথি উপলক্ষে অন্নের ওপর শতাধিক লোক বসে প্রসাদ পেয়েছে। কালীকীর্তন অনেকক্ষণ হলো। পরে সকলের আগ্রহে খোকা মহারাজ শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু বললেন ঃ

"শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার সম্বন্ধে কিছু বলতে হলে তাঁদের কৃপা চাই। তাঁরা যাকে কৃপা করে যা বলান তাই বলবে। আমি আর কতটুকু জানি কতটুকুই বা বলবো। মাত্র দু-চারটা কথা কইবো।

"শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শুনেছি মার বয়স যখন দেড় কি দুই বৎসর তাঁকে শিহড় নামক গ্রামের মন্দিরে তাঁর এক খুড়ো নিয়ে যান। সেই মন্দিরের মধ্যে 'কোনটি তোর বর?' জিজ্ঞাসা করায় তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন, ঠাকুরও সেদিন সেখানে গিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের যখন চব্বিশ বৎসর বয়স তখন তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুর ধর্মের ভাবে তন্ময় থাকতেন—কাপড় ঠিক থাকতো না; লোকে পাগল মনে করতো। বিয়ের পর প্রথম যখন শ্বশুরবাড়ি যান—তখনো এরূপ উন্মাদ অবস্থায় থাকতেন। শ্বশুরবাড়ির কাছে গিয়ে না কি বাহিরে বসেছিলেন। 'পাগল দেখবি?' বলে মার এক গ্রাম-সম্পর্কের দাদামহাশয় মাকে বাহিরে নিয়ে আসেন। তখন মা লজ্জিতা হয়ে বলেন, 'এ যে আমার স্বামী।' তখন তাঁকে বাড়িতে আনা হয় এবং একটি ঘরে বসতে দেওয়া হয়। রাত্রিতে আহারের পর মাকে তথায় পাঠানো হলে মা ঘরে প্রবেশ করে দেখেন খাটে কেউ নেই, কেবল একটা জ্যোতি দাউ দাউ করে জ্বলছে। মা জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে রাত্রি অবসানে শ্রীশ্রীঠাকুর সেই আগুন থেকে বেরিয়ে 'তুমি এই রূপে আবির্ভাব হয়েছ—বেশ' বলে মাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করলেন।

"সাধনাবস্থায় প্রথম প্রথম ঠাকুর হাতে মাখন মিছরি নিয়ে মা-কালীর মুখের কাছে ধরতেন। বলতেন, 'মা এ হাতে খা, একবার খা না।' তখন মা বলেন, 'আমি তোর ভেতর দিয়েই খাচ্ছি, আবার ভিন্ন করে কি খাব?' এই বলে খেলেন এবং ঠাকুরের সহিত মিশে গিয়ে বললেন, 'এই দেখ, তুই আর আমি এক হয়েছি।'

"শ্রীশ্রীমার জীবন তপস্যাময়। দক্ষিণেশ্বরে থাকতে তিনি কি কঠোর তপস্যা করতেন। জপ-ধ্যান ছাড়া থাকতেন না। মা-র বয়স যখন আঠারো, ঠাকুর মাকে ষোড়শী পূজা করেন।

"ভক্তদের মধ্যে গোল উপস্থিত হলে মা বলতেন, 'বাবা, তোমরা কাঙালিনীর ছেলে—তোমরা কেন ঝগড়া করবে? ভগবানকে ভাল করে ডাকো, তিনি তোমাদের সকল রকম শান্তি দিবেন।'

"শ্রীশ্রীঠাকুর যাদের কৃপা করতেন, কতরকম পরীক্ষা করে নিতেন। কিন্তু মা-র কাছে কোন বিচার ছিল না, অহেতুকী কৃপা। যে যেত সেই তাঁর কৃপা পেত।

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ গেলে মা সধবার বেশ ছাড়ছিলেন। তখন ঠাকুর এসে হাত ধরে বললেন—'তুমি মনে করছো আমি নেই, তা নয়। আমি চিরকাল আছি, কেবল অবস্থান্তর হয়েছে। এসব ছাড়তে হবে না।' মা তদবধি সরুপেড়ে কাপড় পরতেন ও বালা হাতে রাখতেন।

"মার ছেলেপিলের দিকে খুব টান দেখা যেতো। ভাইঝি, ভাইপোর ঐ টান ছিল বলেই তাঁর শরীর কিছুদিন থেকে গেল, নইলে অন্তর্মুখী থাকলে কখনই এতদিন থাকতো না।"

সেদিনকার অন্যান্য কথার ভিতর ছিল—"কেঁদে কেঁদে ডাকলেই সব হয়, ওর জন্য নাক টেপা ও আসন দরকার হয় না।

"গরদ তসর যেমন শুদ্ধ বস্ত্র, গেরুয়াও শুদ্ধ বস্ত্র। এর অপর নাম ভগবান বস্ত্র। এ গৃহীরা পরতে পারে না, পরলে অকল্যাণ হয়।"

১৯-১২-২৪ খ্রিঃ, সুরথ নাথ ব্রহ্মচারীর গৃহ, অপরাহ্ণ সাড়ে চারটা

এই গৃহে ৪ পৌষ উৎসব উপলক্ষে খোকা মহারাজ কতিপয় ভক্ত সমভিব্যাহারে যান। ঘরে শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীজীর ছবি ছিল। প্রশ্নোত্তরে খোকা মহারাজ বলেন—"হাঁ, গোস্বামীজীকে অনেকবার দেখেছি। ঠাকুরের কথায় তিনি কেঁদে ফেলতেন; বলতেন, 'তাঁর কাছে যা শুনেছি তা আর কখনো শুনবো নাকো; যা দেখেছি আর দেখবো নাকো। তাঁর কথা কাকে বলবো, কে নিতে পারবে? মনে মনে রাখাই ভাল। লোকে আপনাদের—শ্রীশ্রীঠাকুরের শিষ্যদের—দেখে যদি কিছু শেখে। ওসব কিছু বলার নয়। ভিতরে ভিতরে অনুভব করে শান্তি লাভ করার।"

২৪-১২-২৪ খ্রিঃ, কামার-গাঁ, শ্রীযুত রাইমোহন দেওয়ানজীর ভবন

রাইমোহন দেওয়ানজী ও তাঁর স্ত্রীর দীক্ষা হলো। দশ বারোটি ভক্ত নিমন্ত্রিত হয়েছিল। বেশ মায়ের নাম কীর্তন হলো। বিকেলে প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। মেয়েরাও প্রায় ঐ সংখ্যায় হইবেন। কয়েকটি প্রশ্নোত্তর হলো। জনৈক ভদ্রলোক (চন্দ্রকুমার দত্ত) প্রশ্ন করেন—"সবই যদি ভগবান করে থাকেন তবে জীবকে এত কষ্ট ভোগান কেন?"

উত্তর—"জীবের ভোগ হয় মায়ার দরুন। মন্দ না থাকলে কি ভাল জ্ঞান কারু হতে পারে বা ভাল কি কেউ চাইতো? ভোগ হয়, কষ্ট দেন জীবের মঙ্গলের জন্য, তাঁকে ডাকার জন্য। কারো অসুখ হলে কত হরির লুট, কত পুজো ভোগ মানত করে। কিন্তু ভগবানকে পাবার জন্য কে মানত করে বলুন দিকি। তবুও অসুখ ইত্যাদি দিয়ে ভগবানই তাঁর জীবগণকে ডাকিয়ে নেন।"

একটি ছেলে—"মনে মনে ভোগ বাসনা থাকলে তা কি চাপা দেওয়া ভাল, না ভোগ করে নেওয়া ভাল?"

উত্তর—"চাপা দেওয়াই ভাল।"

প্রশ্ন—"অনেকে বলে ভোগের বাসনা থাকতে ত্যাগ করলে না কি আবার আসতে হয়।"

উত্তর—"ভগবানই কতবার আসছেন। দশ অবতারই হয়ে গেল। তা তুমি আর আমি। ভোগে ভোগবাসনা বেড়েই যায়।"

(৩২)

আছেন তিনি আমার অন্তরে বাহিরে

দীনা

লিখতে গেলে আজ আঠারো বছরের (১৩২২-১৩৩৯ সন) ঘটনা অনেক হয়—মোটামুটি লিখছি। অনেক চেষ্টা করে আমার ক্ষুদ্র ডায়েরি থেকে—যেটুকু লিখেছিলাম বার মাস তারিখ সন পেলাম—আর যতটুকু স্মরণে আসছে লিখছি।

আমাদের সকলকে শোকে নিমগ্ন করে স্বামী সুবোধানন্দজী ষোলই অগ্রহায়ণ, ১৩৩৯ সন—ইংরেজি ২ ডিসেম্বর ১৯৩২ খ্রিঃ শুক্রবার, ৬৬ বৎসর বয়সে বেলুড় মঠে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীমায়ের কোলে চলে গেলেন।

আমার মতো অনাথিনীর শোক-দুঃখ পীড়িত জীবনে একমাত্র অবলম্বন তাঁর অসীম স্নেহ ও করুণা। তাঁর শেষ দর্শন না পাওয়ার যে মর্মভেদী দুঃখ তা যেন তাঁরই অর্চনায়—তাঁরই চর্চায় মুছে যায়।

তিনি এ জগতে নেই। আছেন তিনি আমার অন্তরে বাহিরে। আমার ইহকালে পরপারে সেই প্রশান্ত দিব্যজ্যোতি মৃদুমন্দ হাস্যছটা বিকাশিয়া ডাকছেন—"মায়ী আয় আয়—আমা ছাড়া তোরা নেই—তোদের আমি—আমি তোদের।"

আমি তখন বনগাঁয়ে ছিলাম। ১৩২২ সালের ভাদ্র কিংবা শ্রাবণ, স্মরণ নেই। সেই প্রথম খোকা মহারাজ আমাদের গৃহে পদার্পণ করেন। তাঁর দর্শনের আগে আমার স্বামী শ্রীশ্রীঠাকুরের বিষয় চর্চা কোন কোন মহারাজগণের দর্শন—বেলুড় মঠে যাওয়া আসা আরম্ভ করেছেন। আমি তখন শুনতাম মাত্র, তখন আমার ওদিকে তত আগ্রহ ছিল না। আমার বয়স তখন আঠারো কি

উনিশ হবে। কিন্তু আমার স্বামী, যতদিন তাঁকে দেখেছি, তাঁর ধর্ম চর্চা ও পরসেবা আর সৎসঙ্গ, সৎবন্ধুবর্গ বিনা দেখিনি। তাঁর মহৎ অন্তরের গুণে আমার মতো অধমা শ্রীশ্রীমা ও শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় ঠাকুরের প্রিয় সন্তান সর্বজন বিদিত খোকা মহারাজের দয়াল চরণে আশ্রয় পেয়ে জীবনে মরণে ধন্য হয়েছি।

আমার মনের একান্ত ইচ্ছা হলো খোকা মহারাজের কাছে দীক্ষা গ্রহণ। পূর্বপরিচিত স্বামী অমৃতানন্দ মহারাজের কাছে সব গল্প শুনতাম। তাঁরই আগ্রহে ক্রমে ক্রমে আমাদের মনে দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ, শ্রীশ্রীমার মন্দিরভবন উদ্বোধন এসব দেখবার সাধ হয়।

আমি কয়দিন খোকা মহারাজকে বলে-বলে মন্ত্রের দিন কবে হবে জানতে চাইলে, "আমি কি কিছু জানি, আমি যে খোকা। তোমরা রাখাল মহারাজের কিংবা মায়ের কাছে কিংবা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে নিও, তাঁদের আধ্যাত্মিক ভাব খুব উচ্চ।"

আমি বললাম, "বাবা, আমি মূর্খ, কিছু জানি না মুখ দিয়ে সংস্কৃত উচ্চারণ হবে না; ভয় হবে তাঁদের দেখলে। আমার আপনাকে নিজের বাবা বলে মন নিয়েছে, কই ভয়তো হয় না! আমি শুনবো না, আপনাকে দিতেই হবে।"

তখন হাস্যময় বাক্যে বললেন, "আচ্ছা আসছে দিন হবে।" বললাম, "বাবা, কি কি চাই।"

তিনি বললেন, "দুখানি আসন, গঙ্গাবারি, তৎপাত্র, একটি হরিতকী ব্যস।"

তিনি মহামন্ত্র আমার কর্ণে দিলেন। তিনি কল্পতরু। এ সংসার পঙ্কিল দেহমন পুণ্য করে আমায় নবজীবন দান করলেন। সন ১৩২২ সালের ১১ ভাদ্র সোমবার অমাবস্যা, এই দিবসে দীক্ষা হয়।

তাঁকে দেখতাম প্রত্যেক বিষয়—যখন যে জিনিসটি আবশ্যক সেটি নিজেই ঠিকঠাক সেরে কারো অপেক্ষায় ফেলে রাখতেন না। "যাকে যা করবো বলবো,

দেখাশুনা যার সহিত একটা কথা দিব, সেই মতো ঠিক করবো। যা সত্য প্রকাশ করে দিব।"

যাকে তিনি উপযুক্ত বুঝতেন তার কাছে ঠাকুরের কথা বলতেন নচেৎ—"আমি কি জানি, কতটুকু বলবো, যার জানবার ইচ্ছা সে ঠাকুরের বই পড়ুক সব জানবে ইত্যাদি বলতেন।"

শুধু যে মহারাজ আমায় স্নেহ দয়া করেছিলেন তা নয়। আমার ঘরে দুটি ননদ, জা—যাঁরা ছিলেন তাঁদেরও অসীম কৃপা করেছেন। অবশ্য তাঁরাও ঠাকুরের ভক্ত। নিত্য ফটো পূজা করেন। তাঁরা পূর্বে নিজের গুরুর কাছে দীক্ষা লন, মহারাজের কাছে সব উপদেশ পান। আমার স্বামীর সাধ অপূর্ণ রইল। তাঁর ইচ্ছা ছিল রাখাল মহারাজের কাছে দীক্ষা লন; কথাবার্তা হতে হতে সুবিধা সুযোগের আগেই স্বামী চলে গেলেন। তবে দীক্ষা না হওয়াতে যে ঠাকুরের সম্বন্ধে জানা বা মঠে ভক্ত সাধুদের বা গৃহী ভক্ত সকলের বা শ্রীশ্রীমার কৃপা পাননি তা নয়। তিনি অতি অল্প দিনে যা উপলব্ধি করে গেছেন—শুধু তার মহৎ জীবন বলেই।

১৩২২ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীশ্রীমার চরণ দর্শনে বনগাঁ হতে বাগবাজার যাই। আহা, মায়ের কী করুণা, কী মধুর বাক্য! বনগাঁ হতে খাবার সব লয়ে যাই। মা কতই আনন্দে ঠাকুরের ভোগ দিয়ে নিজে খেলেন ও শরৎ মহারাজকে খাওয়ালেন। মায়ের দর্শন করতে গিয়ে সারদানন্দ মহারাজের সহিত দর্শন হয়। ঠাকুরের পুস্তক অনেক কেনা হয়। মা আমায় বললেন, "মা তুই ভাবছিস কেন? হবে-না হবে-না করিসনি—কখনো পাপী বলিস নিরে—ও বড় খারাপ কথা। যে পাপী পাপী বলে সে তাই হয়ে যায়। ঠাকুর বলতেন আরশোলায় কাঁচপোকা ধরে বহুক্ষণ থাকে, ফলে তার রং সেই পায়।" মার কাছে কত ঠাকুরের কথা শুনলাম। গোলাপ-মা ও যোগীন-মার কাছেও কতই শুনলাম। মা বললেন—"কেন খোকা মন্ত্র দেয় না। যে কয়দিন ঠাকুরের ছেলেরা আছে, যে পায় লুটে নিক।"

মাকে বললাম—"মা শুধু গুরু-ইষ্ট করবো, আর কোন ঠাকুরের পূজা

আহ্নিকের সময় করবো না।" মা বললেন, "কেন করবিনি? যেমন স্বামী সকলের বড়; শ্বশুরবাটিতে স্বামীকে তুষ্ট করতে গেলে তাঁর মা বাপ ভাই বোন সকলকে তুষ্ট করতে হয়। সে জানে স্বামী আগে, এরা তাঁর নিজ জন। এদের না করলে তাঁকে তুষ্ট করা হবে না। তেমনি যার যে ইষ্ট। যেমন স্বামী বড় বলে তাঁর মা বাবা ভাই বোনও বড়, তেমনি অন্য অন্য ঠাকুর দেবতাগণকেও তুষ্ট করতে হয়। ভাবছিস কেন মা, হবে সব হয়ে যাবে। ঠাকুর বলতেন, 'যে হেথায় আসবে জানবি তারা নিজ জন'।"

এভাবে কয়েক বৎসর মধ্যে মায়ের তিন বার দর্শন। শেষ দর্শন ১৩২৭ সালে ২ শ্রাবণ দেহরক্ষার দু-একদিন আগেই হয়।

খোকা মহারাজের সহিত দক্ষিণেশ্বর যাই। তাঁর (শঙ্কর ঘোষ লেন) নিজ বাটিতে মায়ের সহিত, ভ্রাতৃবধূগণ ও ভাইঝিদের সহিত দেখা করাতে লয়ে যান—তখন আমরা বনগাঁয়ে থাকি। তাঁরই কৃপায় সকলের কাছে স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি।

কখনো যদি মহারাজকে টাকার কথা বলেছি, "বাবা, আপনার যা আবশ্যক হয় জানাবেন;" কিংবা দিতে গেছি, তিনি স্বইচ্ছায় লননি। হাতে করে বলতেন, "মায়ী ওসব কি হবে। ঠাকুরের নামে সব হয়ে যাচ্ছে। ওসব বড় বন্ধন—যদি ইচ্ছা হতো আজ টাকার গদিতে বসতাম।"

তাঁর কৃপায় ব্রহ্মানন্দ মহারাজের দর্শন। তাঁকে বেলুড় মঠে গিয়ে দর্শন স্পর্শন কথা। কি মধুর কথা তিনি বললেন প্রণাম করতেই, "থাক থাক মায়ী, তোমরা তো আমাদের নিজ অন্তরঙ্গ—যাও ঠাকুর প্রণাম করে এসো।" তাঁর দর্শন তিনবার হয়।

তারপর প্রেমানন্দ মহারাজের দর্শন। আহা! কি স্নিগ্ধ সৌম্য প্রেমময় হাস্য। প্রণাম করতেই বলে উঠলেন, "শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদপদ্মে মতি লাভ হউক, আনন্দ লাভ হউক।"

তারপর হরি মহারাজের দর্শন—একইভাব, একই বাক্য। তাঁর দর্শন কাশীতে হয়।

শ্রীমহাপুরুষের দর্শন—স্বামীর দেহত্যাগের পরে মহাপুরুষ মহারাজকে বেলুড় মঠে দেখি। তিনি এমনি মধুর গান শোনালেন এখনো কানে বাজে—"মন চল নিজ নিকেতনে।"

কাশী গিয়ে ১৯২০ সালে লাটু মহারাজের দর্শন। স্বামীর সহিত লাটু মহারাজের পরিচয় ছিল—আমি তখন দর্শন পাইনি। বিধবা হয়ে তাঁর পরিচয়ে দাঁড়াতেই তিনি বিছানায় রোগশয্যায় শুয়ে কী গুরুগম্ভীর তেজপূর্ণ বাক্য বললেন, "তুই খোকার মেয়ে! বেশ বেশ বড় আনন্দের কথা—তাহলে তুই তো আমাদের ঘরের লোক। দুঃখ কষ্ট কিসের জন্য? দেহের সহিত সম্বন্ধ ক্ষণিকের, বুঝলি? তবে দুঃখ আমারও হলো শুনে অমন মহৎ লোকটা চলে গেল, থাকলে জগতের একটা কিছু করে যেতো রে। যাক, ঠাকুর তাকে টেনেছেন তাই সে গেছে।"

খোকা মহারাজের কৃপায় কত গৃহী ভক্ত কত সাধুগণ বনগাঁয়ে গিয়ে আনন্দ দিয়েছেন। কত সংকীর্তন, গান বাজনা, ঠাকুরের বিষয় চর্চা হতো। লোকে পূর্ণ হয়ে বিভোর হয়ে শুনতো। আমি বলতাম—"আচ্ছা বাবা, যারা আসে সবতো তাঁর ভক্ত।" তার উত্তরে মহারাজ বলতেন—"দেখ, ঠাকুর বলতেন মাছি দু-প্রকার—মৌমাছি আর সাধারণ মাছি। মৌমাছি মধু ছাড়া অন্য দ্রব্য খায় না। আর সাধারণ মাছি যদি দোকানে পানতুয়ার গামলা দেখে তাতে বসে, কিছুক্ষণ বাদে উড়ে পচা ঘা যদি পায় তাতেও বসে। তেমনি যারা প্রকৃত ভক্ত যেখানে সাধুসঙ্গ সৎ কথা হয়, যায়, শোনে, বাটি গিয়ে সে বিষয় আলোচনা করে; কোনটি সৎ কোনটি অসৎ নিজের বিবেক দ্বারা বিচার করে সৎটি লয়, অসৎটি ত্যাগ করে। বাকি সব শুধু লোকের ভিড় বা শুনলে সাধু এসেছে, দেখতে এল। বাটি গিয়ে আবার সব ভুলে গেল আর ঝগড়া গালমন্দ টাকাকড়ি লয়েই মত্ত হলো। তবে মধ্যে মধ্যে সাধুসঙ্গ করা ভাল গো।"

তাঁর উপদেশ মতো আমি ধ্যান-জপ করে আনন্দ পেতাম না। কারণ ইষ্ট দর্শনে মনে হতো কই যেমন মহারাজকে পেয়ে যে আনন্দ হয় এতে তো হয় না। মনে বড় দুঃখ হতো। তাঁর কাছে কতবার কত দিন বলেছি, "বাবা আমি

ঠিক ঠিক পারি না। তাই তাঁর দয়া হচ্ছে না। শুধু সংসারের কাম-কাঞ্চনে মায়ামোহে মন নিচু থাকে।" মহারাজ শুনে তখনি বলেছেন, "ওরে ঠাকুর বলতেন এগিয়ে যা এগিয়ে যা। যত এগুবি ততই দেখবি কয়লার খনি, পরে রূপার খনি, পরে সোনা হীরার খনি। পিছনে চাসনি, একডুবে পেলি না বলে রত্নাকরকে রত্নহীন ভাববিনি। যে শ্বেতহস্তী দিবানিশি জলের ঊর্ধ্বে চেয়ে আছে স্বাতি নক্ষত্রের জল তার মাথায় পড়ে। কত হাতি আছে সকলের মাথায় কি পড়ে? একটার উপর পড়ে—তারই মাথায় গজমুক্তার দানা হয়। তোমাদের প্রতি শ্রীশ্রীমায়ের এত দয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের এত স্নেহ আশীর্বাদ! বিশ্বাস করো মায়ী সব হয়ে যাবে।"

বলতেন—"বিশ্বাসে মিলায় কাছে তর্কে বহু দূর। তাঁর স্মরণ মননে ধ্যানে জপে রত থাকো। দিন দিন একটা লক্ষ্য রাখ—আজ এক লক্ষ জপ না করলে জল খাওয়া হবে না। তাঁর নামে কাল পাশ কাটে আর ভববন্ধন অতি তুচ্ছ—এটা আর কাটবে না? জেনো যেমন সূর্যের আলোয় সূর্যের মূর্তি আমরা দেখতে পাই তেমনি তাঁর কৃপায় তাঁর নামেই তাঁর ওপর বিশ্বাস ভক্তিতেই তাঁকে পাব। মন তো দুষ্ট ঘোড়া। যে চালায় সে যদি ভাল চালাতে জানে—কোন ভয় থাকে না। ভিন্ন পথে গেলেও আবার তাকে ফেরায়। এ দেহখানি রথ, মন হচ্ছে সারথি, ইন্দ্রিয় হচ্ছে ঘোড়া—বিবেক বুদ্ধির দ্বারা তাদের ফেরাতে হবে। দুষ্টু ঘোড়া কোচম্যানেরা ঠিক রাখে। মানুষের কোচম্যান বিবেক বুদ্ধি যাহা সকল মানুষের ভিতর আছে—বিচারশক্তি, ভালমন্দ বুঝতে সকলেই পারে। যেটি সৎ সেটি গ্রহণ যেটি অসৎ সেটি পরিত্যাগ করতে অভ্যাস করবে। যেখানে কুসঙ্গ, কু-আলোচনা, পরচর্চা দেখবে, সেখানে থাকবে না। যদি তাতে মনে কোন পাপ হয় তখনি ঘরে এসে গঙ্গাজল খাবে। তিনবার স্পর্শ করলেই সব শুদ্ধ।"

আমার প্রেমময় দয়াল গুরুদেবের ভক্তি বিশ্বাস প্রগাঢ় ছিল গঙ্গামায়ীর উপর। বলতেন, "দেখ মায়ী, কোন স্থানে গঙ্গা নেই হয়ত জলও পাচ্ছ না, তখন মাথায় ব্রহ্মতালুতে হাতটা বুলিয়ে নেবে মনে করবে সব শুদ্ধ হলো।"

কতদিন তাঁকে কত ছেলে মানুষের মতো জ্বালাতন করেছি—কিছু পাচ্ছি না, হচ্ছে না মহারাজ, আমি গায়ত্রী জানি না, আহ্নিক জানি না, স্তব জানি না। লোকে কত ন্যাস করে, গায়ত্রী জপ, ত্রিসন্ধ্যা করে আমায় সব বলুন। আহা সে কী বালকের ন্যায় সরল কথায় সরল প্রাণে বলতেন, "মায়ী, আমি ওসব কিছুই জানি না, আমি যে খোকা! তবে আমি যা পেয়েছি, জেনেছি, তাই তোমায় দিয়েছি। শুধু ধ্যান-জপ মনঃসংযম করে যাও। ওসব করে কি হবে ওসব বাহিরের। তবে প্রথম প্রথম সব করতে হয় সেটা অভ্যাসের জন্য মাত্র। যেমন সকাল সন্ধ্যা কোশাকুশি লয়ে ধ্যানে বসতে হয়, কারণ সেটা ঠিক সময়ে করতে হয়। সন্ধ্যা সময়টা যখন দেখবে লোমকূপ দেখা যায় না তখনি ধ্যানে বসবে। সময় না পাও রাত্রে বিছানায় বসে করবে। তাঁর নাম ভুলো না।"

তিনি পত্রে আমায় তাঁর বিষয় সব লিখেছিলেন, "মায়ী, তুমি যা লিখেছ ঠাকুর তোমার প্রতি সদয় আছেন জেনো। কৃষ্ণ উদ্ধবকে শ্রীবৃন্দাবনে পাঠাইয়াছিলেন গোপীদের খবর লইবার জন্য। ভক্তি ভালবাসায় ঠাকুর বাঁধা পড়েন জেনে রেখো।"

১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে বেলুড় হতে বনগাঁয়ে একখানি পত্রে লেখেন, "মায়ী, মন অত চঞ্চল কর কেন, ঠাকুরের প্রতি ওই ভাব কর যেন শীঘ্র তাঁর দর্শন হয়। শুধু তোমার মন চঞ্চল নয়, বালক কাল হতে সকলেরই। কিন্তু জেনো, মায়ী, সব কষ্ট সেরে যাবে। ভগবানের দিকে যেতে হবে। সব দুঃখ-কষ্টের পিছনে সেই ভগবান দাঁড়িয়ে আছেন, এটা ঠিক জানবে।"

মহারাজের নিজমুখে বনগাঁয়ে শুনেছি তিনি বাল্যকাল হতে তাঁর ঠাকুরমার নিকট কত ঠাকুর দেবতার ও মহাভারত রামায়ণের গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। ঘুমের সময় ঠাকুরমা ওসব না বললে কিছুতেই ঘুমাতেন না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শনের পর মহারাজ তাঁর ভ্রূ-যুগলের মধ্যস্থলে আলো দেখতেন। এ বিষয়ে ঠাকুরকে তিনি জানান। ঠাকুর বলেন, "তুচ্ছ আলোয় ভুলিসনি। অমন কত আসবে যাবে। কারো কাছে প্রকাশ করিসনি। ঠাকুর-দেবতা সম্বন্ধে যা দেখবি মনে মনে রাখবি। নরেন [বিবেকানন্দ] কত

দেখতো আমি ভাবতাম ও যদি ঐ লয়ে থাকে সব ভুলে যাবে; ভয় হতো। ও দিকে মন দিসনি।”

তাঁর কাছে কত চেষ্টা করে কত দিন ধরে বলে বলে একটি দুটি তাঁর কথা বলেছেন। আবার হেসে এ কথায় সে কথায় সব ভুলিয়ে দিতেন। বলতেন, “ভয়ে ভক্তি হয় না, মায়ী। সরল ভালবাসা ভক্তি প্রেমে ঠাকুর বাঁধা পড়েন। ঠাকুরকে ভালবাসতে হলে যেমন সতীর পতিতে টান, মায়ের সন্তানে টান, কৃপণের ধনের উপর টান তেমনি তাঁর প্রতি করতে হবে।” আরও বলতেন, “রাগ অভিমান মানুষের উপর করতে নেই। তাঁকে পাচ্ছি না বলে যত পার কাঁদ, রাগ অভিমান কর। একটুতে ভুলে যেও না, যতক্ষণ না সম্পূর্ণরূপে তুমি তাঁকে পাও। তাঁর নামে মেতে থাকো। ঠাকুরকে স্মরণ করে যে যত কাঁদতে পারবে তার উপায় তিনি করে দেবেন।”

মহারাজ বলেন, “মধ্যবয়সে মনে হলো কোথাও বেরিয়ে পড়ি। ঠাকুরের দেহরক্ষার পর হাঁটা পথে কতদূর, কত দেশে যে ঘুরেছি। কত আশ্চর্য আশ্চর্য জিনিস দেখেছি, মায়ী তা তখন তুচ্ছ বোধ হতো। চোখে পড়লে হন হন করে চলে যেতাম পাছে-লোভ হয়।

“দেখ মায়ী, যে তাঁর নাম লয়ে, তাঁর প্রতি ষোল আনা ভক্তি রেখে পথে বাহির হয় তার ভার তিনিই বহন করেন—এ বিশ্বাস হারাবে না।”

তাঁর নিজ মুখের কথা ঃ “লোকে একরকম সাধন-ভজন জপ-ধ্যান পূজা করে; যখন তাঁর দয়ায় স্নেহ, দয়া ও কৃপা পায়, তখন আর সাধন-ভজনের দরকার হয় না। যেমন গ্রীষ্মকালে লোকে পাখার বাতাস খায়, যখন প্রাকৃতিক হাওয়া বয়, তখন পাখা ফেলে দেয়।”

তিনি বলতেন, “মায়ী, তুমি ভাবছো সংসারে থেকে কি করে তাকে পাব? সংসারে থেকে ছেলেমেয়ে লয়ে অনেক লোক তার কৃপা স্নেহ দয়া পেয়েছে দৃষ্টান্ত আমি অনেক দিতে পারি। তুমি হতাশ হও কেন তা আমি বুঝতে পারি না।”

আমি তাঁর নিজ মুখে শুনেছি, "রাঁচিতে কেউ কেউ বা ঢাকা দেশে স্বপনে ঠাকুরকে দেখে বাগবাজার হতে ফটোগ্রাফ, ঠাকুরের পুস্তক লয়ে পড়েছে এবং ঠাকুরের ধ্যানে কাটাতো। পরে আমায় পেয়ে এত ভিড় হতো যে ঠাকুরের কথা হতে হতে মাথায় রক্ত গরম হয়ে যেত। এভাবে কয়দিন কাটাতে হয়। শেষে সে পাড়া ছাড়তে হলো। তখন ঢাকার স্ত্রী পুরুষ অনেকে মন্ত্র চায়। আমি বলে দিলাম যে তোমরা সব উদ্বোধনে গিয়ে মায়ের কাছে বা রাখাল মহারাজের কাছে মন্ত্র নাও গিয়ে। আমি কি জানি? তারা থাকতে তাদের আদেশ বিনা দিতে পারবো না। তখন তারা সব পত্র লেখালেখি করে মত চায়। মা, রাখাল মহারাজ, শিবানন্দ মহারাজ আমায় জানান, যে কয়দিন ঠাকুরের শিষ্যগণ আছে, যে যেখানে যাবে যদি তারা দীক্ষা চায়, দিবে। তারপর হতে আমি একটি দুটি করে মন্ত্র দিই।"

মহারাজের জীবনের আর একটি কথা মনে পড়লো। দেখেছি কত গান-বাজনা কোলাহলের মধ্যে তিনি বসে আছেন। একই ধ্যানে যেন কি একটা দেখছেন। যখন তিনি শুতেন ডান হাতের ওপর মাথা দিয়ে। বলতেন, "মায়ী যখন বনে জঙ্গলে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াতাম তখন বালিশ কোথায় পাব—হাতটা লম্বা করে মাথায় দিতাম সেই অভ্যাস রয়ে গেছে।"

কার্তিক মাসে বেলুড় মঠে যাই মহারাজের খুব অসুখ শুনে। উপরে হলঘরে দেখলাম রোগে অত কষ্টেও সে হাসি মলিন হয়নি। কী স্নেহ দয়া ভালবাসা!

অত অসুখ তার মধ্যে সেবককে বলছেন, "যাও ভাণ্ডারে খবর দাও সাত আট জন মায়ীদের প্রসাদ দিতে হবে। মায়ীদের ঠাকুরের মিষ্টান্ন প্রসাদ এনে দাও।"

পূজনীয় মহারাজের আহার ছিল নরম দ্রব্য। বলতেন, "আমি খোকা, দাঁত নেই! এসব মুখে দিলেই হলো, চিবুতে হয় না।"

মহারাজ বলতেন—"একটি কথায় বিশ্বাস রেখে চল—ধ্যান ও জপে সব হবে। নানা গ্রন্থ নানা লোকের কাছে নানা মত নিলে, মনতো একটা, সব গুলিয়ে যায় জানবে, নানা মুনির নানা মত। ছেলে মেয়ে তার মা বাপের

কাছে যখন যায় তারা কি স্তব করতে করতে যায়? 'মা কোলে যাব খিদে পেয়েছে' এই বলে কান্না ধরে। মা তাদের শত কাজ ফেলে ছুটে এসে কোলে নেয়।"

১২ সেপ্টেম্বর ১৯১৬ মঙ্গলবার বেলুড় থেকে মহারাজ লিখেছিলেন— "মা আমার, তুমি মনের আবেগে কত কি লিখেছ—এতো লিখবার দরকার ছিল না। মা তুমি আমার কন্যা, আমার আনন্দময়ী আদরিণী মা, তাই তোমায় আমি স্নেহ আদর করি, ভালবাসি। আমি তোমার কোন দোষ লইনি ও লইব না ঠিক জেনো।

"ঠাকুর যখন তাঁর ছেলেমেয়েদের হৃদয় মন্দিরে আসেন, আসবার আগে ভিতরে ভক্তি বিশ্বাস ভালবাসা এই সমস্ত দিয়ে দেন। কোন রাজা যদি প্রজার বাটিতে আসে, সে আসবার আগে প্রজার বাটিতে বসবার আসন ও আসবাবপত্র পাঠিয়ে দেয়। হৃদয়ে ভক্তি বিশ্বাস ভালবাসা তিনিই পাঠান, আসবেন সেইজন্য।

"দিনরাত সৎ চিন্তা সৎ কথা এই সমস্ত লইয়া থাকিবে। তবে সংসারের কাজকর্ম সেরে যখন থাকবে তখন [ঠাকুরকে] ভুলবে না। ভাল পুস্তক পড়বে যাতে ভগবানকে স্মরণ হয়।

"ঠাকুরের নাম যখন যে অবস্থায় নাও না কেন কাজ হবেই, যেমন চাষারা বীজ বপন করে সোজা হোক উল্টা হোক—বীজের অঙ্কুর হয়।

"ঠাকুরের দিকে মন কিরকম রাখতে হবে তুলসীদাস বলতেন, যেমন গরুর নূতন বাছুরের দিকে মন থাকে, ঘাস খায় মনটা বাছুরের উপর থাকে। সেই রূপ সংসারের সব কাজ কর মন ঐরূপ চাই। আমিও ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি তোমার শুভ ইচ্ছা পূর্ণ করুন।"